ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজত

মাওলানা মুহাম্মদ হারুন

ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজত

[কুষ্টিয়ার হালসায় বাহাস অনুষ্ঠানে আলোচিত ধর্মীয় পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ সহ বৃটিশ শাসন পূর্বাপর উপমহাদেশ তথা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ের তথ্যবহুল একটি সত্য ইতিহাস গ্রন্থ]

উক্ত বাহাসে এক পক্ষের প্রধান মুরুব্বী ছিলেন—
আল্লামা আহমদ শফী সাহেব
মহাপরিচালক, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

অপর পক্ষের প্রধান মুরুব্বী ছিলেন—
মাওলানা বাহাদুর শাহ ইবনে মাওলানা আলী আকবর শাহ
হাজিগঞ্জ, কুমিল্লা।

সংকলনে ঃ
মাওলানা মোহাম্মদ হারুন
সাবেক শায়খুল হাদীস ও মোফাচ্ছেরে কুরআন
জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া।

রহিমিয়া লাইব্রেরী
ঢাকা

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, বুখারী-মুসলিমসহ
সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস শরীফের ভাষ্যকার, জামিয়া রাহমানিয়া
আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদ্রাসার মহামান্য শাইখ
শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের

বাণী

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ–

বগুড়া জামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আমার সুপরিচিত আলেম মাওলানা হারুন সাহেব লিখিত 'ঈমান ও মুসলিম জাতির হিফাজত' নামক বইটি দেখার সুযোগ হয়েছে। মাশায়াল্লা বাতিল মতবাদী বেদআতপন্থীদের মুকাবিলায় বইটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। সাথে সাথে দেওবন্দীয়াতের উপর বইটি তথ্যবহুল। আমাদের দেওবন্দী হালকার প্রত্যেক আলেম ও তলাবাদের জন্য বইটি পড়া অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। আর বইটি কবুল হওয়ার ও লিখকের দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করি।

আমীন।
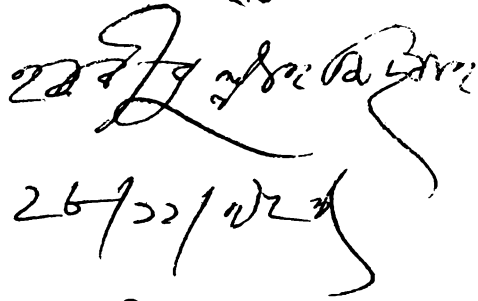
আজিজুল হক
১৩/১০/৯৪

আজিজুল হক
১৬/১০/৯৪ইং

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত মুফাচ্ছেরে কোরআন

আল্লামা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ সাহেব (মুঃ)এর

মূল্যবান বাণী

স্নেহের ভাই মাওলানা হারুন সাহেব লিখিত 'মুসলিম জাতির হেফাজত' বইটির সূচী দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি, এমন একটি বই এহেন পরিস্থিতিতে নবীনদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়া ভবিষ্যৎ বংশধরকে সঠিক ইতিহাস ও সঠিক ইসলামের দিক নির্দেশনার পাথেয় হবে বলে আশা রাখি। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা খেদমতটি কবুল করে নিন।

ইতি—

হাবীবুল্লাহ মিছবাহ

২৮/১১/৯২ ইং

প্রখ্যাত সুসাহিত্যিক বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা ও মাসিক মদিনার সম্পাদক

মাওলানা মহিউদ্দিন খানের

মূল্যবান অভিমত

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় দু'শো বছর কাল আমাদিগকে শোষণ করে বৈষয়িক দিক দিয়েই কেবল কাঙ্গালে পরিণত করেছে তাই নয়, আমাদের ঈমানের পরম সম্পদও হরণ করার শয়তানী কারসাজি চালিয়ে গেছে অব্যাহত গতিতে। এ দেশের অসহায় মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে একজন জলজ্যান্ত নবী পর্যন্ত সৃষ্টি করে ফেলেছিল পূর্ব পাঞ্জাব এলাকা থেকে। মুসলিম জনগণ সে ভণ্ডনবীর জারিজুরি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করার পর ওরা জনগণের শ্রদ্ধাভাজন আলেম সমাজেরই লেবাছ ছুরতে অন্য আর একটি দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করে। ওদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল প্রথমতঃ দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী সংগ্রামী আলেম সমাজকে জনসাধারণের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অপবাদ দিয়ে বেড়ানো এবং তাঁদের সংগ্রাম সাধনার পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রটি বহুলাংশে সফল হয় এবং আলেমের ছুরতধারী একদল মুনাফেকের পাপমুখ ও বিষাক্ত কলমে উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রায় সকল আলেমই কম বেশী জর্জরিত হয়েছেন। বালাকোটের শহীদ শাহ ইসমাঈল, কুতুবে আলম রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, যুগের মুজাদ্দেদ মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছের ন্যায় ব্যক্তিত্বও এসব মুনাফেক চরিত্রের বিষাক্ত জিহ্বার হামলা থেকে রেহাই পাননি। অবশ্য এটা তাঁদের হক্কানীয়াতেরও একটা দলিল। কারণ, দ্বীনের প্রকৃত খাদেমরা শয়তানী ঈর্ষার শিকার হবেন না, এমনটা আশা করা যায় না।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও ওদের রেখে যাওয়া জঞ্জাল এখনও পরিস্কার হয়নি বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় আরও প্রবলতর হয়েছে। কাদিয়ানীরা এদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের ঈমান কুরে কুরে খাচ্ছে। ওদেরই সহযোগী শক্তি এক শ্রেণীর লেবাছ সর্বস্ব

আলেমছুরতের ধর্ম ব্যবসায়ীর হক্কানী আলেম বিশেষতঃ উপমহাদেশে এলমেদ্বীন ও তাকওয়া অনুশীলনের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ ও দেওবন্দ থেকে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলেমদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অপপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শুধু অপবাদ ছড়ানোটা বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল না। উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু দলিলবিহীন কুফরী শেরেকী ধ্যান ধারণাকে আমাদের ঈমান আকীদার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানোর জঘণ্য অপপ্রয়াস। সুখের বিষয় উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বগুড়া জামিল মাদ্রাসার উস্তাদ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হারুন 'ঈমান ও মুসলিম জাতির হেফাজত' নামক একটি পুস্তিকা লেখে মতলবী গোমরাহদের দ্বারা ছড়ানো বিভ্রান্তির অপনোদন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

আমি লেখকের এ প্রয়াসকে মোবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক বাতিলের বিরুদ্ধে তার কলমকে আরও শক্তিশালী করুন।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এ যুগটি কলমের যুগ। কিন্তু কলমের ময়দানে এদেশের হক্কানী আলেমগণের উপস্থিতি শোচনীয়ভাবে কম। বর্তমান পুস্তিকার লেখক মাওলানা হারুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যরাও এ ময়দানের জেহাদে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি। আল্লাহ্ পাক তাওফীক দান করুন।

যাঁদের সামর্থ আছে, তাঁদের প্রতি আরজ কলমের জেহাদে সর্বতোভাবে সহায়তা করুন। এ যুগের সেরা দ্বীনি প্রয়োজনটুকু অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন।

বিনীত

মহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদিনা

রবিউস সানী

১৪১২ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

=== 000 ===

ভূমিকা

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং মোতাবেক ২৩শে মাঘ ১৩৯৭ বাংলা রোজ বুধবার, কুষ্টিয়া জেলার হালসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে এক বিরাট ঐতিহাসিক বাহাছের ব্যবস্থা করা হয়। বাহাছের ৫টি বিষয় সম্পর্কে শরয়ী ব্যাখ্যা পাওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় দু'টি পক্ষ দেশের প্রখ্যাত ওলামা, মাশায়েখের শুভাগমন ঘটান।

বাহাছের ৫টি বিষয় হলো—

১. আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী মানুষ, না মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন?

২. আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলমে গায়েব জানতেন কি না?

৩. আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির–নাজির কি না?

৪. মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)এর প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলের তাবলীগ জায়েয কিনা? এবং কেউ এই তাবলীগ করলে কাফের হয়ে যাবে কিনা?

৫. দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী (রহঃ), মাওলানা খলিল আহমদ আমবেটবী (রহঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ), মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী (রহঃ) প্রমুখগণ কাফের ছিলেন, না খ্যাতনামা বুযুর্গ ছিলেন?

এই ৫টি বিষয়ের উপর বাহাছ অনুষ্ঠানের জন্য ৭টি শর্তারোপ করা হয়। শর্তগুলো হলো—

ক. বাহাছ কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কেয়াছের উপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি হবে।

খ. উভয় পক্ষ হতে দশ হাজার করে টাকা কমিটির নিকট জমা রাখতে হবে।

গ. বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিজয়ী পক্ষকে কমিটির নিকট জমাকৃত বিশ হাজার টাকাই প্রদান করতে হবে।

ঘ. বাহাছ অনুষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. কমিটির সদস্যগণ বিচারকমণ্ডলী নিয়োগ করবেন।

চ. কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই পরাজিত বলে গণ্য হবেন।

ছ. এই বাহাছ হালসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে প্রথম (বাতিল) পক্ষে স্বাক্ষর করেন সর্ব জনাব (১) আবদুল গণি, পিতা–আজগার মলিন, পোঃ হালসা। (২) মন্‌তাজ আলী, পিতা–খেড়ু মণ্ডল (৩) মোঃ মোতালেব হোসেন, পিতা–হাজী আবদুর রহমান, সাং কুন্টের চর, পোঃ হালসা।

এই বাহাছে এদের আকীদা হলো ঃ আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী মানুষ, তিনি ইলমে গায়েব জানতেন, তিনি হাজির নাজির। মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলের তাবলীগ জায়েজ নয়। কেউ এ তাবলীগ করলে কাফের হয়ে যাবে এবং মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী (রহঃ), মাওলানা খলিল আহমদ (রহঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) প্রমুখগণ কাফের ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ....)

তাদের এই ভ্রান্ত মতবাদ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার পরিপন্থী বাতেল চিন্তাধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে বেশ কয়েকজন আলেম ছুরুতধারীকে উপস্থিত করেন। তাঁরা হলেন—

১. মাওলানা আইয়ুব আলী আজমী, মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

২. মাওলানা আবদুর রহমান কাদেরী, চট্টগ্রাম।

৩. মাওলানা শাহ আলম জেহাদী, সিলেট।

৪. সৈয়দ বাহাদুর শাহ, হাজিগঞ্জ, পুত্র সৈয়দ আবেদ শাহ।

পক্ষান্তরে

দ্বিতীয় (হক) পক্ষে স্বাক্ষর করেন সর্ব জনাব (১) মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব, পিতা–মোঃ আমানুল্লাহ, সাং ভেদামারী, পোঃ হালসা। (২) মোঃ এনায়েত বারী, পিতা–মোঃ শাহাদত আলী, সাং মাজু, পোঃ গোস্তমী

দুর্গাপুর, উপজেলা–আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। (৩) মোহাম্মদ আলী, পিতা–হানিফ আলী, সাং ভেদামারী, পোঃ হালসা, উপজেলা–মিরপুর, জিলা–কুষ্টিয়া।

উল্লেখিত বাহাছে এঁদের আকীদা হলো—আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ। তিনি গায়েব জানতেন না। তিনি হাজির–নাজির নহেন। মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলের তাবলীগ জায়েজ এবং কেউ এই তাবলীগ করলে কাফের হবেন না এবং কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী (রহঃ), মাওলানা খলিল আহমদ (রহঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) প্রমুখগণ কেউই কাফের নন বরং তাঁরা ছিলেন দ্বীন ইসলামের নিঃস্বার্থ খাদেম এবং সর্বজনবিদিত যুগবরেণ্য আলেম।

তাঁদের এই সঠিক ও সুন্নাত ওয়াল জামাত স্বীকৃত আকীদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাতেল চিন্তাধারাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত দেশবরেণ্য ওলামা–মাশায়েখগণকে হাজির করেন তাঁরা হলেন—

১. প্রখ্যাত মুহাদ্দেস, মুনাজেরে আজম, হযরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেব (মুদ্দাঃ), মোহতামিম, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ও খলিফায়ে মাদানী (রহঃ)।

২. মাওলানা মুফতী এজহারুল ইসলাম সাহেব (দামাঃ), মোহতামিম, লাল খান মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৩. মাওলানা হাফেজ জোনায়েদ সাহেব, মুহাদ্দেস ও ইসলামী গবেষক, বাবুনগর মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৪. মাওলানা মোঃ তাহের উদ্দিন সাহেব, মুহাদ্দেস, দারুল উলূম খুলনা।

৫. মাওলানা মোঃ ইবরাহীম সাহেব, দেওবন্দী, কুষ্টিয়া।

৬. মাওলানা মোঃ ফিরোজ সাহেব, মোহতামিম, রানাগাড়ী মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া।

৭. আমি অধম (মাওলানা মোঃ হারুন, মুহাদ্দেস, জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া) এবং আরো অনেক ওলামায়ে কেরাম।

অতঃপর কমিটি বিচারকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করেন। উভয় পক্ষের আলেম নিয়ে এই বিচারকমণ্ডলী গঠন করা হয়। এঁরা হলেন—

১. মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা।

২. মাওলানা মুফতি নূরুল আমীন সাহেব, খুলনা দারুল উলূম মাদ্রাসা।

৩. তৃতীয় ব্যক্তির নাম আমার স্মরণে নাই।

আলমডাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হয়। এখানে সুহৃদয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। আর তা হলো সভা ভণ্ডুলের অপচেষ্টা। বাহাছের শর্তানুযায়ী সকাল ১০টায় বাহাছ আরম্ভ হওয়ার কথা। সে মতে আমরা নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই স্থানীয় রেলওয়ে মসজিদ থেকে স্বদলবলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। আমাদের (২য় পক্ষের) দেশ খ্যাত অনেক আলেম ও উদ্ধৃতি (হাওলা) স্বরূপ প্রচুর কিতাবাদী দর্শনে জনগণ সঠিক বুঝতে পারল যে, বাহাছের ফলাফল কি হবে।

এদিকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের সভাস্থল ত্যাগ করতে বলা হয়। এতে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাহাছটি ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্র চলছে। ইতিমধ্যে জনসাধারণের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, ২য় (হক) পক্ষের প্রচুর কিতাবাদী ও ওলামা মাশায়েখ এর সমাবেশ দেখে ১ম (বাতেল) পক্ষের লোকেরা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে এটা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, বাহাছ চলাকালে দু'পক্ষে ভীষণ গণ্ডগোল হতে পারে। কাজেই সভা বন্ধ রাখার পাঁয়তারা চলছে।

এমতাবস্থায় ২য় পক্ষের ও স্থানীয় জনসাধারণের চাপের মুখে স্থানীয় প্রশাসন শেষ পর্যন্ত বাহাছ অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। অবশেষে বিকেল ৩টায় বাহাছ শুরু হয় এবং তা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে। এর মধ্যে মাত্র প্রথম দু'টি বিষয় সম্পর্কে বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ৩টি বিষয়ের আলোচনা ছাড়াই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং উহার বিষয় পরবর্তীতে লিখিতভাবে জনগণকে অবহিত করা হবে বলেও জানিয়ে দেয়া হয়। উপস্থিত জনসাধারণ ও ২য় (হক) পক্ষের ওলামাগণ বাকী ৩টি

বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রশাসনকে চাপ দেয়। এক পর্যায়ে জনসাধারণ হৈ চৈ শুরু করে। প্রয়োজনে নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বলা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই বাহাছটির এখানেই সমাপ্তি ঘটানো হয়। অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় করে বিভিন্ন স্থান হতে বিশিষ্ট ওলামা, মাশায়েখগণকে একত্রিত করার পরও আলোচ্য ৫টি বিষয় অসমাপ্ত থাকায় সমবেত নিরপেক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও ২য় পক্ষের ওলামাগণ অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁরা বিষন্ন ও বেদনাহত হৃদয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। বাহাছে বহু আলেম উপস্থিত থাকলেও মোনাজের ও বক্তা নির্বাচিত হলেন—

১. মাওলানা মোঃ জোনায়েদ সাহেব ২. মাওলানা মোঃ তাহের উদ্দিন সাহেব এবং ৩. আমি (মাওলানা হারুন)। যদিও কর্তৃপক্ষ এ অধমকে বিচারক নিযুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু হাটহাজারীর মুহতামিম সাহেব হুজুর তা মানলেন না। তিনি বরং আমাকে প্রধান বক্তা হিসাবে সাব্যস্ত করলেন।

আর ১ম পক্ষের মোনাজের ও বক্তা হিসেবে নির্বাচিত হলেন সর্বজনাব (১) মাওলানা আইয়ুব আলী আজমী (২) মাওলানা আবদুর রহমান কাদেরী এবং (৩) মাওলানা শাহ আলম জেহাদী। হাটহাজারীর মুহতামিম সাহেব ও মুফতি এজহারুল ইসলাম সাহেব প্রমুখ বুযর্গগণ মুরুব্বী ও মঈন হিসাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাহাছ শুরু হলে আমি এবং মাওলানা জোনায়েদ সাহেবই আলোচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করি। অন্য বক্তা মাওলানা তাহের উদ্দিন সাহেবকে কোন কথা বলার প্রয়োজন হয় নাই।

তবে হাটহাজারীর মুহতামিম হুজুর ও মুফতি সাহেব কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে একাধিক পয়েন্টে বলিষ্ঠ ও সাবলীল ভাষায় শরীয়ত সম্মত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বক্তাগণের চেহারায় ছিলো মলিনতার ছাপ, কথা বলার সময় তাদের ভিতরে ছিলো কম্পন, আওয়াজ ছিলো ক্ষীণ, উপস্থাপনা ও দলিল ছিলো অত্যন্ত দুর্বল।

যে দু'টি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়েছে উহার ফলাফল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেননি। এ কথা সত্য যে, ২য় পক্ষের সাবলীল

উপস্থাপন অকাট্য ও বলিষ্ঠ যুক্তি শরীয়তসম্মত দলিলের উদ্ধৃতি সব মিলিয়ে এ বিষয়ে ইসলামী আকীদার সঠিক দিকই ফুটে উঠেছিলো। ফলে শিক্ষিত, জ্ঞানী, সচেতন ও ধর্মপ্রাণ উপস্থিত মুসলমানগণের মুখে মুখে ২য় পক্ষের বিজয় ঘোষিত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান ধর্মানুভূতিতে ধর্মের প্রতি কোন আঘাত যেমন বরদাশত করতে পারেন না, তেমনি ধর্মের ধারক–বাহক বুযুর্গদের অবমাননাও বরদাশত করতে পারেন না। আর তাই বাকী ৩টি বিষয়সহ ৫টি বিষয়েই বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে অন্য তারিখে প্রচুর দর্শক শ্রোতা কর্তৃক বামুনগাড়ী ও আলমডাঙ্গায় দু'টি ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হয়। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মেলনগুলোতে কমিটির অনুরোধে সাড়া দেই এবং দু'টি সম্মেলনে অকাট্য দলিলাদী দ্বারা প্রমাণ করি যে—

১. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের নয় বরং মাটির মানুষ।

২. তিনি গায়েব জানতেন না, গায়েব জানা আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য।

৩. তিনি হাজির–নাজির নন, উহাও আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য।

৪. ছয় উছুলের তাবলীগ এক দ্বীনি বিরাট খেদমত। এর বিরোধিতা উদ্দেশ্যমূলক, অজ্ঞতা বা ভুল বুঝাবুঝির ফলেই হয়ে থাকে।

৫. উল্লেখিত ৫ জন প্রখ্যাত আলেম কাফের ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাক–ভারত উপমহাদেশ যখন বৃটিশ বেনিয়াদের শাসনে, ঠিক তখন হতেই তারা খৃষ্টান ধর্ম প্রসারের লক্ষ্যে এদেশের মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের নিমিত্তে তারা এদেশের কিছু সংখ্যককে যারা ভ্রান্ত, কোরআন, হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী সেবাদাস ও এজেন্ট হিসেবে পেয়েছিলো, এদের মধ্যে—

(১) ভ্রান্ত নেচারিজম (Naturism) বা প্রকৃতিবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা, মুজেজা কারামতের অবিশ্বাসী, ইসলামী মতবাদ ও বৈজ্ঞানিক মতবাদে বৈশাদৃশ্যে বৈজ্ঞানিক মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামী মতবাদের হাস্যকর অপব্যাখ্যাকারী স্যার সৈয়দ আহমদ (আলীগড়ী)।

(২) নিজেকে নবী, ঈসা, মাহদী, মুজাদ্দিদ ইত্যাদি হওয়ার মিথ্যা দাবীদার পাঞ্জাবের বাসিন্দা, নরকের কীট, কুখ্যাত মির্জা গোলাম আহমদ এবং বহু শির্‌ক, বেদ্‌য়াত, কুসংস্কার, কুপ্রথা ইত্যাদির আবিস্কারক, কবর পূজা, পীর পূজা ইত্যাদির মহানায়ক মৌলভী আহমদ রেজা খান বেরেলভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে ৫টি বিষয়ে বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত মতবাদগুলোর ভ্রান্তদিকের ভারতীয় নেতা হলেন আহমদ রেজা খান বেরেলভী। হক্কানী ওলামা ও সুন্নি মুসলমানগণের নিকট এরা রেজভী, বেরেলভী, কবর পূজারী, হালুয়া রুটি খোর বেদয়াতী ইত্যাদি নামে সুপরিচিত। অবশ্য তারা নিজেদেরকে সুন্নি, আশেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি নামে ভূষিত করে থাকে। এদের ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়েই ১ম পক্ষ সাময়িকভাবে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখিত বাহাছটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান ও আকীদার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় শুধুমাত্র হালসাবাসীই নয় বরং সমগ্র বাংলাদেশের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের সঠিক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আকীদার হেফাজত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। আর তাই হালসায় আলোচিত দু'টি বিষয়ের সঙ্গে দেওবন্দীয়তের আলোচনা সহ বাকী ৩টি বিষয়েও অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যেই আমার এ ক্ষুদ্র শ্রম সাধনা।

আমি হালসায় অনুষ্ঠিত বাহাছটি হুবহু লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু যেহেতু উহা টেপ রেকর্ডার হতে নয়, বরং আমার নিজ স্মরণশক্তি ও চিন্তাশক্তির দ্বারাই লেখায় ব্রতী হয়েছি তাই কিছু কমবেশী হতে পারে। তবে মূল বিষয় অপরিবর্তিত রাখায় আদৌ কার্পণ্য করি নাই। সেই সাথে বাহাছের আলোচনায় যে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে তা অত্র পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি মাত্র। কোন্ অংশটি বাহাছের আর কোন্ অংশটি আমার নিজের থেকে ব্যাখ্যা স্বরূপ সংযোজিত তা পাঠকমহল একটু চিন্তা করলেই বুঝতে সক্ষম হবেন।

আমি আশা রাখি যে, সত্যানুরাগী পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ আমার এই ক্ষুদ্র বইখানি গভীরভাবে পাঠ করতঃ ঈমান ও আকীদা দুরস্ত করতে

সচেষ্ট হবেন। প্রণিধানযোগ্য যে, একটি বিষয় সবিস্তারিত আলোচনা না করলে এহেন গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্রম সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আর তা হলো কাছেমুল উলুম জামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য মুহতামিম, আমার একান্ত হিতাকাংখী জনাব হযরত মাওলানা মোঃ ইউসুফ নিজামী (মুদ্দাঃ) এবং অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা হাফেজ মোঃ ইয়াকুব (মুদ্দাঃ) সাহেবদ্বয়ের বদান্যতা ও আন্তরিক সহযোগিতা। তাঁদের নির্দেশেই বহু জরুরী কাজ ফেলে এবং তাঁদের মাধ্যমে বহু অমূল্য ও দুস্প্রাপ্য কিতাবসহ অত্র জামিল মাদ্রাসার ছাত্র মোঃ ওহিদুজ্জামানকে সংগে নিয়ে আমি উক্ত বাহাছে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

আর এ পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাঁরা যে কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের দুজাহানের কামিয়াবীর জন্য আমি রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি। এই পুস্তিকার ভাষা ও সাহিত্যগত সংশোধনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ মোজাহার সাহেব, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই কোন স্বহৃদয় পাঠক এ পুস্তিকার কোন তথ্যগত ও মুদ্রণগত ভুল অবগত হয়ে আমাকে জানালে আমি কৃতজ্ঞ হবো।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট এই মুনাজাত, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র শ্রম সাধনাটুকু কবুল করেন এবং ইহাকে আমার নাজাতের উছিলা করে দেন। আমীন॥

আহকার—

মোহাম্মদ হারুন
খাদেমে হাদীস ও তাফসীর
জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া।

প্রথম খণ্ড

বাহাছ্ শুরু ঃ
রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির না নূরের তৈরী?

বাহাছের প্রথম বিষয় ছিলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী ছিলেন, না নূরের তৈরী? এ বিষয়ে প্রথম পক্ষের আকীদা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সৃষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নূরের তৈরী মানুষ।

বিঃ দ্রঃ– ১ম পক্ষের এ দল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামে মাত্র মানুষ বলে অর্থাৎ তিনি শুধু মানবাকৃতি ধারণকারী। বাস্তবে তিনি মানুষ নন। আল্লাহ পাকই তাঁর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) এ দলের লিখিত কিতাবগুলো ও তাদের বক্তৃতাতে তা প্রকাশ পায়। তারা বলে যে আহাদ (আল্লাহ) ও আহমদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাঝে শুধু একটি মীমেরই পার্থক্য আর কোন পার্থক্য নেই। (ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকিম ১ম খণ্ড) তাঁরা এটা প্রমাণের জন্য ৩টি দলিল পেশ করেন। তা হলো—

১. পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ১৪ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে—"নিশ্চয়ই এসেছে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে একটি নূর ও একটি সুস্পষ্ট কিতাব।"—আল কোরআন

২. মাদারিজুন নবুওয়্যাত কিতাবে হযরত জাবের (রাঃ) হতে এ দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে জাবের! আল্লাহ পাক সমস্ত বস্তু হতে সর্বপ্রথম তাঁর নূর দিয়ে (নূরের ফয়েজ দিয়ে) তোমার নবীর নূরকেই সৃষ্টি করেছেন।—আল হাদীস

৩. খাছায়েছ ও মাওয়াহেব কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত যাকওয়ান ছাহাবী (রাঃ) বলেন যে, চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছায়া দেখা যেত না। তাঁরা জালালাইন সহ কয়েকটি তফসীরের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত নূরের ব্যাখ্যা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত নূর বলতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে।) কাজেই তিনি পূর্ণাঙ্গ নূরের তৈরী, মাটির তৈরী নন। আর হযরত জাবের (রাঃ)এর বর্ণিত হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায় যে, মাটির তৈরী হযরত আদম (আঃ)এর জন্মের পূর্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সৃষ্টি করে রাখা হয় এবং এই নূরই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল দেহ। ৩য় হাদীসের মাধ্যমে আরো পরিস্কার হয়ে যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নূরের তৈরী বলেই তাঁর ছায়া জমিনে পড়ত না। যদি তিনি মাটিরই তৈরী হতেন তাহলে সূর্যের আলোতে তাঁর ছায়া জমিতে পড়ত।

দ্বিতীয় পক্ষের আকীদা ও বিস্তারিত আলোচনা ঃ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মানব জাতির অন্তর্ভুক্তই নন বরং তিনি শ্রেষ্ঠতম মানব এবং মানব জাতির গৌরব। তিনি মানব বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র জাতি নন। তিনি আল্লাহ নন বা আল্লাহর আকারও নন। তিনি আল্লাহর জাত বা অস্তিত্বের কোন অংশও নন। বরং তিনি আল্লাহর অংশ বা আকার এ বিশ্বাস কুফুরী–শেরেকী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ আকীদা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের তাছলীছ বা ত্রিত্ববাদের মত ভ্রান্ত আকীদা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সতর্কবাণীতে বলেন, হে আমার উম্মতগণ! তোমরা আমার প্রশংসায় এমন অতিরঞ্জিত করো না যেরূপ করা হয়েছিলো হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে। তোমরা আমাকে আল্লাহর রাসূল বা বান্দা বলবে। —বুখারী, খণ্ড–২, পৃষ্ঠা–১০০৯

মানব জাতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এরা পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করে, মাতৃদুগ্ধ পান করে, ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হতে থাকে। পানাহার, নিদ্রা, প্রস্রাব, পায়খানার মত স্বাভাবিক

ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি এরা জৈবিক ইত্যাদি চাহিদায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এতে সন্তান-সন্ততিরও প্রজন্ম হয়ে থাকে। এরা সুখে যেমন হাসে, দুঃখে তেমন কাঁদে। রোগ-শোক, দুঃখ যেমন এদের কাতর করে তেমনি যাদু ও বিষের ক্রিয়া এদের চরম কষ্ট দেয়। এমনকি মৃত্যুর দুয়ারে পর্যন্ত ঠেলে দেয়। আর এ সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য কেবল মাটির তৈরী মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য।

এখন এমন কেউ কি আছেন? যিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, মানবীয় এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি থেকেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত ছিলেন? কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ, তিনি তো মাটির তৈরী মানুষই ছিলেন। নূরের তৈরী নন। হিজরতের দিনে এবং বিদায়হজ্জের দিনেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপরে চাদর ধরে তাঁকে ছায়া দান করার ঘটনা এবং রাতের আঁধারে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে তাঁর পাশে না পেয়ে হাত দিয়ে তালাশ করে পাওয়ার ঘটনা ছহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে। তিনি যে নূরের মানুষ ছিলেন না এতেও প্রমাণিত হয়। তবে নবুওয়্যাতের পূর্বে অনেক সময় তিনি খোলা আকাশের নীচে চলাকালীন সময়ে কোন ফেরেশতা বা রহমতের মেঘমালা তাঁর মাথার উপর সামীয়ানার মত হয়ে থাকতো। ফলে জমীনে তাঁর ছায়া পড়তো না। তাঁর ছায়া না থাকা মেঘ বা ফেরেস্তার কারণেই হয়েছিলো নূরের তৈরী হওয়ার ফলে নয়। আর তাও ছিলো অস্থায়ী। সোজা কথা হলো যে, নূরের তৈরী হলো ফেরেশতা জাতি, আগুনের তৈরী হলো জিন জাতি, আর মাটির তৈরী মানুষ জাতি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী যদি এ কথা মেনে নেওয়া হয় তাহলে তিনি হয়ে যান ফেরেশতা জাতির অন্তর্ভুক্ত। অথচ কোরআন ও হাদীসে তাঁকে মানুষই বলা হয়েছে। সুতরাং তিনি মাটিরই তৈরী, নূরের তৈরী নন। তবে একথাও সত্য যে, মাটির তৈরী হলেও তিনি মর্যাদায় ফেরেশতা জাতির চেয়েও অনেক অনেক উর্ধ্বে। যেমন ঃ কষ্টিপাথর। এটি পাথর হলেও সাধারণ পাথরের তুলনায় উহার মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। তদ্রূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিতে মানুষ এবং মাটির তৈরী হলেও তিনি সর্বদিক হতে

শ্রেষ্ঠতম মানুষ, শ্রেষ্ঠতম নবী, শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর তুলনা হয় না। মানব স্বভাব বহির্ভূত যে সমস্ত কথা ও কাজ তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে তা ছিলো তাঁর নবুওয়্যাতের প্রমাণস্বরূপ মু'জেজা ও কারামত যা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাকই প্রকাশ করেছেন। মু'জেজা ও কারামত নবী ও ওলীদের স্বাভাবিক কাজ নয়।

দ্বিতীয় পক্ষের দাবী ও দলিল সর্বপ্রথম আমি (লেখক) নিজে পেশ করি। আমি বলি যে, আল্লাহ পাক তাঁর অসংখ্য মাখলুকাত হতে শুধু মানব জাতিকেই নির্বাচন করেছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, তাঁর আমানত সমর্পণ করার জন্য। মানব জাতিকে তিনি নিজ (কুদরতি) হাত দিয়ে অতীব সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর অন্যান্য জাতিকে তিনি 'কুন' (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এ মানব জাতিকেই ফেরেশতা জাতি দ্বারা সেজদা করিয়ে অসীম সম্মানের অধিকারী করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানব জাতিকেই আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব ঘোষণা দিয়েছেন। এসব গুণের একচ্ছত্র অধিকারী মানব জাতি মাটিরই তৈরী, নূরের নয়।

এ বিষয়ে আমাদের প্রমাণাদি নিম্নে দেওয়া হলো—

১. সূরা মু'মিনুনের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্যসার) হতে সৃষ্টি করেছি।"—কোরআন

আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি মানুষ বলা না হয়, তাহলে তিনি সৃষ্টির সেরা জাতির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে নিম্ন জাতির ও মানবাধীনস্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা, মানব ছাড়া সব জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবেরই অধীনস্ত। কাজেই তাঁকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকার করা হয়, তাহলে তাঁকে মাটির তৈরী মানুষ হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

২. তিনি রসূল ছিলেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রসিদ্ধ কিতাব 'শরহে আকায়েদে' রাসূলের ব্যাখ্যা বিশেষ ইনসান বা বিশেষ মানুষ বলেই করা হয়েছে।

৩. ১৬ পারা, ১১০নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ "(হে নবী) আপনি বলুন যে, আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ। আমার নিকট

কেবল এই ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ হচ্ছেন একই মা'বুদ।"

এ আয়াতে 'তোমাদের মত' শব্দ দিয়ে মাটির তৈরীর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর ওহীপ্রাপ্ত হওয়া তাঁর মর্যাদা ও পদ।

৪. এবং সূরা আ'রাফ–৬৯, হুদ–২৭, মু'মিনুন–৩৩, শুয়ারা–১৫৪নং আয়াতসমূহ দ্বারা আমি প্রমাণ করেছি যে, অতীত থেকেই ইসলামের শত্রু তথা সত্য ধর্ম বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহর প্রেরীত নবী–রসূলগণকে মানুষ স্বীকার করতো না। তারা নবী বা রসূলের নাম শুনলেই তাদেরকে মানব বহির্ভূত স্বতন্ত্র কোন জাতি বুঝতো। তখন নবী–রসূলগণ দলিল দ্বারা বুঝিয়ে দিতেন যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য মানুষ জাতীয় নবীরই প্রয়োজন, অন্য কোন জাতি হতে নয়।

৫. মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন।

৬. বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৯ পারা ৩৩২ পৃঃ বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আমি একজন মানুষ।"

'আমি একজন মানুষ'—রসুলুল্লাহ (সঃ)এর এ কথাটি যেমন সঠিক তেমনি 'আমি মানুষকে ত্বীন বা মাটি হতে তৈরী করেছি'—আল্লাহ পাকের এ বাণীটিও নিঃসন্দেহে সত্য। আর এ রায়টি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে নয়।

প্রথম পক্ষের প্রথম দলিলে বর্ণিত নূরের ব্যাখ্যা যে দু'টি তা আমি নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেছি ঃ

১. নূরের তফসীর যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা করা হয়েছে। তেমনি কিতাব বা কোরআন দ্বারাও করা হয়েছে। কোরআনে উল্লেখিত উক্ত নূর এবং কিতাব শব্দের একই ব্যাখ্যা।—কুতুবে তফসীর। আরবী পরিভাষায় একে আতফে তাফসিরী বলে। ইযা জায়াল ইহতিমালু বাতালাল ইসতিদলালু। সার অর্থ—দুই অর্থ বহনকারী এ নূর শব্দটি আদৌ তারা দলিল হিসাবে পেশ করতে পারেন না। এই দু'টি অর্থের মধ্যে সুবিধা মত এক অর্থ উল্লেখ করে দলীল পেশ করা জ্ঞানীসুলভ পরিচয় নয়।

আর যদি নূরের ব্যাখ্যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারাও করা হয় তবুও কোন অসুবিধা নেই। তখন নূরের অর্থ হবে আধ্যাত্মিক আলো, অর্থাৎ পথপ্রদর্শক। বাহ্যিক জ্যোতি বা আলো অর্থে ব্যবহৃত নয়। যেমন বলা হয়, কোরআনের আলো, জ্ঞানের আলো ইত্যাদি। কোরআন বা জ্ঞানের বাহ্যিক কোন আলো নেই বা হয় না। এগুলো আধ্যাত্মিক অদৃশ্য আলো। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রান্ত লোকদেরকে গুমরাহীর অন্ধকার হতে হিদায়েতের অদৃশ্য আলোর দিকে আহবান করতেন, সেহেতু তাঁকে কোরআন পাকে নূর আখ্যা দেয়া হয়েছে। নূরের এই দ্বিতীয় তাফসীর সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবেই উল্লেখ আছে। স্বয়ং প্রথম পক্ষের দলীয় নেতা মৌঃ নঈমুদ্দিনের তাফসীরে নঈমীতেও এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি উল্লেখ আছে। তাফসীরে নঈমী সূরা মায়েদা, ১৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এছাড়াও মাদারিজুন নবুওয়্যাত কিতাবের ১ম খণ্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠাতেও এ ব্যাখ্যাই উল্লেখ আছে। আর এ মাদারিজ কিতাবটি প্রথম পক্ষের নিকটও নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষের মাওলানা জুনাইদ সাহেব প্রথম পক্ষকে তাঁদের দ্বিতীয় দলিলের সনদ বা সূত্র পেশ করতে বলেন। আর তাঁদের তৃতীয় দলিলটি সম্বন্ধে তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিলো না মর্মের হাদীসটি ভিত্তিহীন এবং এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী (রাভী) আবদুর রহমান, ধর্ম বিশ্বাসে শিয়া এবং জাল হাদীস বর্ণনাকারী। ভ্রান্ত শিয়া রাভীর হাদীস সুন্নীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর দ্বিতীয় বর্ণনাকারী আবদুল মালিক একজন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মাওলানা জুনাইদ সাহেব মিজান, তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব ইত্যাদি রেজাল শাস্ত্রের কিতাব থেকে এ সমস্ত উদ্ধৃতি পেশ করেন।

প্রথম পক্ষের একজন বক্তা বলেন, ‘কোরআনে বর্ণিত মাটির তৈরী মানুষের ব্যাখ্যা হলো হযরত আদম (আঃ), হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন। হযরত আদম (আঃ)ই কেবল মাটির তৈরী। আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত, তাঁর সমস্ত সন্তানাদি বীর্য থেকেই তৈরী, মাটি থেকে নয়। এর পর প্রথম পক্ষ তাঁদের উল্লেখিত হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীসের

সনদ বা সূত্র পেশ করতে পারেনি। এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া না থাকা সম্পর্কে তাঁদের তৃতীয় দলিল দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হলো, অথচ তা প্রতিরোধ করার মত কোন দলিল তাঁরা আর দেখাতে পারেনি।

এরপর দ্বিতীয় পক্ষের মুফতি এজহার সাহেব বলেন যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অলৌকিক নূরের তৈরী নন। তিনিও অন্যান্য আদম সন্তানের মতই প্রাকৃতিক নিয়মেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা মাতা ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ঔরসে মাটিরই ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। নূরের নয়। এ সময় তিনি বজ্রকন্ঠে বলেন, এ প্রথম পক্ষ সত্যকে গোপন করতে চায়। রাতকে দিন করতে চায়। এভাবে তিনি রাগান্বিত স্বরে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে থাকলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে শান্তভাবে কথা বলার অনুরোধ জানান।

এরপর আমি (লেখক) বললাম, ভাইসব! আমি বলেছিলাম যে, সমস্ত মানব জাতিই মাটির তৈরী। আর প্রথম পক্ষের এক বক্তা তা ভুল প্রমাণ করার জন্য অপচেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, কেবলমাত্র হযরত আদম (আঃ)ই মাটির তৈরী। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত সমস্ত মানুষই বীর্যের তৈরী। আমি এর উত্তরে বলতে চাই—বীর্য খাদ্য থেকে আর খাদ্য মাটি হতেই সৃষ্টি। শুধু প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষের পার্থক্য। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানব জাতিরই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তখন তিনিও উক্ত নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না এবং হযরত ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গটি খুব সূক্ষ্ম ও জটিল, যা দীর্ঘ আলোচনা ছাড়া বুঝানো যাবে না।

হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীসটির সনদ সম্পর্কে প্রথম পক্ষের এক বক্তা বলেন যে, উক্ত হাদীসটির সনদ হযরত জাবের (রাঃ)। সনদ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাপূর্ণ জবাবে উপস্থিত ওলামাগণ হাসিতে ফেটে পড়েন। যদিও তাঁরা হাদীসটির সনদ পেশ করতে পারেননি তবুও আমি হাদীসটি অস্বীকার করিনি। তাঁরা হাদীসটির মধ্যে বর্ণিত নূরের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে মাত্র। হাদীসটিতে বর্ণিত নূর শব্দটির সঠিক অর্থ হলো—রূহ বা আত্মা। মাদারেজুন নবুওয়্যাত উর্দু অনুবাদ ১ম খণ্ড

২২১, ৪৬৪ পৃঃ। মুহাদ্দিস আবদুল হক দেহলবী (রহঃ)এর লেখা এ কিতাবটি প্রথম পক্ষের লোকসহ সকল সুন্নীদের নিকটই গ্রহণযোগ্য। ফারসী ভাষায় লিখিত এ কিতাবখানার উর্দু তরজমাও করেছেন প্রথম পক্ষের জনৈক আলেম মাওলানা নাঈমী সাহেব। (এছাড়াও আল্লামা থানভী (রহঃ) নশরুততীব কিতাবে উক্ত নূরের ব্যাখ্যা রূহ অর্থ করেছেন।)

মোটকথা, সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূরের ফয়েজ দিয়ে নূরের অংশ দিয়ে নয় রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর বা রূহকেই সৃষ্টি করেছেন। এবং ঐ নূরকেই ঊর্ধ্ব জগতে সমস্ত ফেরেশতাদের সম্মুখে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এ নূর বা রূহের ফয়েজ দিয়েই অবশিষ্ট সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করা হয়। এ নূর বা রূহই মানব পিতা হযরত আদম (আঃ)সহ সমস্ত সৃষ্টির মূল। আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সমস্ত মানব জাতির দেহের মূল হযরত আদম (আঃ)এর দেহ। তাই সমস্ত মানবের দেহ হযরত আদম (আঃ)এর দেহের নমুনায় হয়েছে এবং পরকালেও হবে। আর সমস্ত দেহই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাটিরই তৈরী। এর ব্যতিক্রম বিশ্বাস করা সীমালংঘন ছাড়া কিছুই নয়। আর সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন না এবং কারো সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুব অপছন্দ করতেন।

এভাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নূরের তৈরী ছিলেন না বরং মাটির তৈরী ছিলেন তা দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়। আর তিনি মাটির তৈরী প্রমাণিত বলেই তাঁর সম্মান অধিক সাব্যস্ত হয়। (বিখ্যাত ফতুয়াগ্রন্থ আলমগীরীতে আছে, যে ব্যক্তি বলে আমি জানি না যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ না জ্বীন, সে মুসলমান নয়।—ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম

বোখারী শরীফ কিতাবুচ্ছাওম অধ্যায়ে ছাওমে বেছাল (রাত দিন না খেয়ে রোযা রাখা) সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 'লাছতু মিছলুকুম' আমি তোমাদের মত নই থেকেও ১ম পক্ষের দলীয় লোকেরা বলতে চায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নয়, নূরেরই তৈরী বা তিনি মানুষইনয়। বরং

মানুষের রূপে আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)

এর জবাবে ২য় পক্ষের লোকজন এই জবাব দিয়ে থাকেন যে, উক্ত হাদীসের অর্থ আমি তোমাদের মত—নই গুণে ও মর্যাদায়। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড ১–৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদীসের অর্থ এই—হে ছাহাবীগণ তোমরা দিনে রোযা রাখিও রাত্রে নয়। এতে তোমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তবে আমার ব্যাপার আলাদা আমি রাত দিন কিছু না খেয়ে রোযা রাখলেও আমার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তখন আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে খাদ্য ও পানি খেতে দেয়া হয়। তোমাদেরকে তা দেয়া হয় না। এ কথাটিকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মত নই। ভ্রান্তবাদীরা এ কথাকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে গেছে।

প্রত্যেক নামাজের তাশাহহুদে আমরা পড়ে থাকি আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। অথচ ভ্রান্তবাদীরা তাঁকে আল্লাহর বান্দার পরিবর্তে তাঁর অংশ বলে বিশ্বাস করে যা শেরেকী মতবাদ। মুদ্দাকথা রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নূরের তৈরী নন। অন্য কথায়, রাসুল, জাতি নূরের তৈরী নন তিনি ছিফাতী নূরের দ্বারা সৃষ্টি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলাও ভুল হবে না যে, রাসুল নূরেরও সৃষ্টি, মাটির দ্বারাও সৃষ্টি। তবে ঐ নূর আল্লাহর নূরের অংশ নয় বরং উহা আল্লাহর সৃষ্ট নূর। যার প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো জ্ঞান ও হিদায়াত বা রূহ।

বিঃ দ্রঃ–তৌহিদী আকীদায় কুঠারাঘাত অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী লালন ও বাউল ফকির দর্শনেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী বা তিনি আল্লাহর অংশ ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদার আভাস পাওয়া যায়। ঈমানের হেফাযতে এ সমস্ত গীতি ও দর্শন থেকে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গায়েব জানতেন?

বাহাছের দ্বিতীয় বিষয় ছিল, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন কি না? এ বিষয়ে প্রথম পক্ষের দাবী হলো,

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন। এমন কি, যে পরিমাণ ইলম ও জ্ঞান পৃথিবী সৃষ্টি হতে মানব–দানবের বেহেশত–দোযখে প্রবেশ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের আছে সে পরিমাণ জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও আছে ও ছিল। (নাউযুবিল্লাহ)। তবে আল্লাহ পাকের ইলম হলো 'জাতী' বা নিজস্ব আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম আতায়ী বা আল্লাহ প্রদত্ত। এদের আরো বিশ্বাস, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জ্ঞান বা ইলম তিন ভাগে বিভক্ত। (১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের গর্ভেই ঐ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, (২) মে'রাজের পর হয়েছেন, (৩) ওফাতের কিছুক্ষণ পূর্বে হয়েছেন। এই তৃতীয় মতটি তাদের বড় নেতা ও মুজাদ্দেদ আহমদ রেজা খানের।—বাওয়ারেকুল গাইব

এ বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের আকীদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না। গায়েব জানা আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য। যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে গায়েব জানার বিশ্বাস করবে—তাদের ঈমান থাকবে না। কারণ, শরীয়তের পরিভাষায় 'গায়েব' বলা হয় ঐ সমস্ত জ্ঞানকে যা পঞ্চেন্দ্রীয়, বিবেক এবং অন্য কোন দলিলের সাহায্য ছাড়া আপনা আপনিই হাছিল হয়। অন্য কথায়, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি যা জানা যায় তাকেই গায়েব বলে।

সৃষ্টির সমস্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই আছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু জেনেছেন তা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে শুনে বা ফেরেশতার মাধ্যমে। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম যদিও সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে তুলনাহীনভাবে অধিক তবুও তা গায়েব জানার অর্থের অন্তর্ভুক্ত হয় না বা তিনি গায়েব জানেন একথা বলা যায় না। যেমন আমরা রেডিও, বেতার বা অন্য কোন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্বের অন্য প্রান্তের কোন খবর জেনে তা অন্য ব্যক্তিকে জানালাম। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা গায়েব জানি। অনুরূপভাবে জিবরাঈল (আঃ) বা ঐশীবাণীর মাধ্যমে পাওয়া খবর যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগাম বলেছেন বা ভবিষ্যত বাণী করেছেন এবং যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে তা গায়েব জানা

নয়। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি একেই গায়েব জানা বলে মনে করে, তবে বলতেই হবে যে, সে ব্যক্তি 'গায়েব' শব্দের অর্থই জানে না।

আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে কিছু জানানোর পূর্বে যে, তিনি পঞ্চেন্দ্রীয়ের বাহিরে কিছুই জানতেন না তার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তা হলে—

১. তায়েফের অধিবাসীদের লেলিয়ে দেয়া কিশোর গুণ্ডাদের প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতেন না।

২. ঐতিহাসিক ওহুদ প্রান্তরে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হতো না।

৩. জনৈকা ইহুদী মহিলা তাঁকে বিষ মিশ্রিত গোস্ত খাওয়াতে পারতো না।

৪. কতিপয় লোক হযরত আয়েশা (রাঃ)কে অপবাদ দেওয়ায় ওহী আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি (হুজুর সাঃ) মনোকষ্টের মধ্যে কিংবা একমাস কাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কালাতিপাত করতেন না।

৫. আয়েশা (রাঃ)এর অপবাদ সম্পর্কে আগেই অবগত হতেন এবং তাঁকে একাকী পথিমধ্যে ফেলে রেখে আসতেন না।

৬. মসজিদে নববীর এক খাদেমের মৃত্যু সংবাদ জেনে প্রথম জানাযাতেই অংশগ্রহণ করতেন—দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে হতো না।

৭. হেরাগুহায় নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর নবীন পাদ্রী ওরাকার নিকট প্রশ্ন করে জানার প্রয়োজন হতো না যে, তাঁকে দেশ হতে বের করে দেয়া হবে।

৮. ধূর্ত মিথ্যাবাদী, মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মিথ্যা কথায় নির্ভর করে অল্পবয়সী ছাহাবী হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ)কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিতেন না। এবং সূরা মুনাফিকুন অবতরণের মাধ্যমে তাঁকে সত্যবাদী প্রমাণের প্রয়োজনও হতো না।

৯. তাবুক যুদ্ধে কতিপয় মুনাফিক মিথ্যা ওজর দেখিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি পেত না। আর এ অনুমতি প্রদানের কারণে আল্লাহ পাক কর্তৃক

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কৈফিয়ত তলবেরও প্রয়োজন হতো না।

১০. বহু সময় হুজুর (সঃ) কাফেরদের কথায় বিশ্বাস করে বহু ছাহাবীকে শিক্ষক ও প্রতিনিধি করে তাদের দেশে পাঠিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেন না। বি'রে মায়ুনা, সরিয়ায়ে আছেম (রাঃ)এর মত ছোট ছোট যুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দেরকে নির্মমভাবে শহীদ হতে হতো না।

১১. কেয়ামতের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মুর্তাদকে তাঁর সাহাবী মনে করে হাউজে কাউছারের পানি পান করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না ইত্যাদি।

এখানে মাত্র ১১টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যা বোখারী শরীফসহ সমস্ত হাদীস, তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশংকায় এখানে সব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো না।

আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না এ সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এখানে কয়েকটি মাত্র আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ সূরা মায়েদা–১১৬, আনআম–৫৬, আ'রাফ ১৮৭–১৮৮, তওবা–৯৪, ১০৫, ইউনুস–২০, হুদ–৩১, রায়াদ–৯, মুমিনুন–৯২, নমল–৬৫, সিজদাহ–১৭, সাবা–৩, ফাতির–৩৮, জুমার–৪৬, হুজুরাত–১৮, হাসর–২২, জুময়া–৮, তাগাবুন–১৮, তোয়াহা–১৫, আহযাব–৫, মুলক–২৬, ইউনুস–৪৯, ইসরা–৫১, আম্বিয়া–১০৮, জ্বিন–২৫, নহল–৭৭ ইত্যাদি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম যে আল্লাহ পাকের ইলমের সমান নয় এবং পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের ইলম যে তাঁর ছিল না তার কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো।

১. আরবী ভাষায় শের (কবিতা) আবৃত্তি তথা লেখার (তৈরী করার) জ্ঞান আল্লাহ পাক তাঁকে দেননি। কেননা, তিনি যদি কবি হতেন তবে কোরআন অবতরণের পর কাফেরদের এ কথা বলার সুযোগ হতো যে

এটা (কোরআন) তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি কাব্য। তিনি একজন মহাকবি। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, "আমি তাকে কাব্য রচনার জ্ঞান দান করি নাই। এবং উহা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নহে।"—সূরা ইয়াসিন-৬৯

২. কেয়ামত কবে হবে এ জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল না। আল্লাহ বলেন, "মানুষেরা আপনাকে কেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এর ইলম আল্লাহ পাকের নিকটই সীমিত।"—সূরা আহযাব-৬৩

৩. "মাফাতিহুল গাইব বা অদৃশ্য বিষয়ের চাবিকাঠিসমূহ আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। তিনি ব্যতীত এগুলোর খবর কেহই জানে না।"

—সূরা আনআম-৫৯

এ আয়াতের ব্যাখ্যা অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ ৫টি বিষয় দ্বারা করেছেন—(ক) সমস্ত ভবিষ্যত সম্বন্ধে (খ) জরায়ুতে ছেলে না মেয়ে আছে (গ) বৃষ্টি কবে হবে (ঘ) কোন্ জীবের মৃত্যু কবে হবে এবং (ঙ) কেয়ামত কবে হবে। এ পাঁচটি বিষয় আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ সঠিক বলতে পারে না।

৪. ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ পাক বলেন—"আপনার রবের লস্কর (কি পরিমাণ) আমি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"—মুদ্দাচ্ছের-৩০

এখানে লস্কর অর্থ ফেরেশতাকুল বুঝানো হয়েছে।

৫. আল্লাহ পাক তাঁর খাছ বান্দাদের জন্য এমন কিছু নিয়ামত গোপন করে রেখেছেন যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ পাক বলেন—"অতএব কারো জানা নেই যে, এরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ আছে।"

—সূরা সিজদা-১৭

৬. আসমান জমিনের সমস্ত গোপনীয় বস্তুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর আছে। অন্য কারো নেই। আল্লাহ পাক বলেন, "আর আসমান ও জমিনের যত গায়েবের বিষয় আছে উহার ইলম আল্লাহরই রয়েছে।"—সূরা হুদ-১২৩

৭. আল্লাহ পাক বলেন—"তোমাদের নিকট কি তাদের খবর পৌছে নাই যারা তোমাদের পূর্বে ছিল। নূহের জাতি এবং আদ ও ছামুদ এবং

যারা তাদের পরে এসেছে, তাদের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।"

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম এবং উদনানের মাঝে ত্রিশ পূর্ব পুরুষ এমন ছিল যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই বলতে পারে না।

৮. অধিকাংশ মুফাচ্ছেরগণের মতে মানব রূহের হাকিকত সম্পর্কে জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়নি। "(আল্লাহ পাক বলেন) আপনাকে এরা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি বলুন, রূহ আমার রবের আদেশেই সৃষ্ট।" —বনি ইসরাইল-৮৫

৯. মদিনার মুনাফেক নেতাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু জানাননি। আল্লাহ পাক বলেন, "এবং মদিনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় মোনাফেক এমন আছে যারা নেফাকের চরমে পৌছেছে।"—তওবা-১০১

১০. অনেক নবীর নাম ও জীবনী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়নি। এবিষয়ে আল্লাহপাক বলেন,"আর আমি আপনার পূর্বেও বহু রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের মধ্যে কতক এরূপ যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং তাঁদের মধ্যে কতক এমন যাঁদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করা হয়নি।—মু'মিন-৭৮

একদা এক মেয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বললেন, আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন যিনি আগামী দিনের খবর জানেন। এ কথা শুনা মাত্রই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবাদ করে বললেন, তুমি একথা প্রত্যাহার করো এবং যা বলছিলে তাই বলো।—বুখারী

বাহাস শুরু ঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন এবং সমস্ত সৃষ্টির বিস্তারিত জ্ঞান তাঁর ছিল, এ দাবীর সমর্থনে প্রথম পক্ষ (বাতিল) কয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করেন। নিম্নে তা বর্ণিত হলো ঃ

১. "(আল্লাহ পাক বলেন) তিনিই (আল্লাহ পাক) গায়েব বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। অতএব তিনি তাঁর গায়েবী বিষয় সম্বন্ধে কাকেও অবহিত করেন না। কিন্তু হাঁ, নিজের মনোনীত কোন রসূলকে, তখন এরূপে

জানান যে, ঐ রসূলের সম্মুখে ও পেছনের দিকে নেগাহবান ফেরেশতাদেরকে পাঠান, যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঐ ফেরেশতাগণ স্বীয় রবের বার্তা পৌঁছিয়েছেন।" —জ্বীন ২৭–২৮

২. "(আল্লাহ পাক বলেন), আর তিনি (রাসূল সঃ)) (ওহীর দ্বারা জ্ঞাত) গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে কৃপণও নহেন।"—তকভীর–২৪

৩. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার দিকে দুনিয়াকে উঠায়ে ধরেছেন। তখন আমি উহার দিকে এবং উহাতে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব কিছুর দিকে লক্ষ্য করি।"—মওয়াহেব

৪. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদিন আমি আল্লাহ পাককে উত্তম ছবিতে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নে আল্লাহ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! বললাম, জ্বী হাজির আছি। বললেন, আসমানের ফেরেশতা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? বললাম, আমি তা জানি না। এ কথা আল্লাহ পাক তিনবার বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর দেখি, তিনি আমার দু' কাঁধের মাঝে তাঁর (কুদরতী) হাত রাখলেন। এমনকি আমি আমার দু' স্তনের মাঝে তাঁর অঙ্গুলীর শীতলতা অনুভব করি। অতঃপর আমি প্রত্যেক বস্তু দেখে ফেলি এবং জেনে ফেলি।—মেশকাত

৫. পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতেহ–৮ এবং সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাহেদ বা সাক্ষী বলেছেন। আর সাক্ষী দেওয়ার জন্য সম্পর্কীত ঘটনা জানা অপরিহার্য। এতে বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের ভালমন্দ সব খবর জানতেন। অন্যথায় তিনি কিভাবে সবার সাক্ষী হবেন?

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্তে আমি (লেখক) বলি—

১. প্রথম আয়াতে উল্লেখিত 'ইস্তিছনা'কে প্রসিদ্ধ কিতাব তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে 'মুনকাতে' বলা হয়েছে 'মুত্তাছিল' নয়। যার সার অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে তাঁর গায়েবী ভাণ্ডার থেকে সব কিছুই জানাননি বরং এমন কিছু জানিয়েছেন যা নবুওয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত।

প্রণিধানযোগ্য যে, গায়েবী ভাণ্ডার থেকে সব কিছু না জানলে এবং জানাটা কারো মাধ্যমে হলে উভয়টাকেই গায়েব জানা বলা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত তাফসীরের কিতাবে ইহাও পরিস্কার আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর গায়েব থেকে নির্বাচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব ইলমই দান করেন না বরং কিছু দান করেন যা দ্বীন তথা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। এবং এ তাফসীর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াপ্রাপ্ত ইসলামী জগতের সবচেয়ে বড় মুফাচ্ছিরে কোরআন রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর তাফসীর ও ব্যাখ্যা তাফসীরকারকদের নিকট সবচেয়ে বলিষ্ঠ হিসাবেই গণ্য।

২. আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করা হয় তিনি তা গোপন রাখেন না। প্রকাশ করে দেন।—কানযুল উম্মাল ইত্যাদি।

৩. তৃতীয় হাদীসটি দুর্বল। যা কোরআনী অকাট্য প্রমাণের মুকাবিলায় অগ্রহণযোগ্য।

৪. চতুর্থ হাদীসটিও দুর্বল।—বায়হাকী। এবং হাদীসে উল্লেখিত 'কুল' (সমস্ত) শব্দটির অর্থ ঐ স্থানের ঐ সমস্ত জ্ঞান, যা নিয়ে ফেরেশতাগণ বিতর্ক করছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির 'কুল' নয়। আরবী পরিভাষায় এ 'কুল'কে 'কুলে এজাফী' বলা হয়। আবার হাদীসটিতে উল্লেখিত তাজাল্লি শব্দের অর্থ উপরি উপরি দেখা। এর জন্য বিস্তারিত জানা জরুরী নয়। আবার 'তাজাল্লী' অর্থ পুরাপুরি মেনে নেয়া হলেও সে জানা স্থায়ী হওয়া জরুরী নয়।—আল বয়ানুল ফাছেল

এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। যথাক্রমে–

১. খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদের অবস্থান জানার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুজাইফা (রাঃ)কে পাঠান।

২. আরো কতিপয় লোককে তিনি কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন স্থানে জাছুছ হিসাবে পাঠান।

৩. হুদায়বিয়ার প্রান্তে হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যার মিথ্যা গুজবকে বিশ্বাস করে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

৪. ওহী আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আছহাবে কাহাফ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারেননি।

৫. বনী মুস্তালিক গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য তিনি ওয়ালীদ ইবনে ওকবাকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌছে অযথা ভীত হয়ে ফিরে এসে উল্টো রিপোর্ট দেন যে, তারা তো যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেই উপরন্তু আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তাদের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন।

—তাফসীরে সূরা হুজুরাত–৬

এ সমস্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, তিনি স্বপ্নে প্রত্যেক বস্তু দেখলেও সে দেখা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ঐ বিশেষ সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ। তিনি যদি ইলমে গায়েব জানতেনই তা হলে উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো অবশ্যই তাঁর না জানার কারণ ছিলো না।

৫. পঞ্চম দলীলের জবাব এটাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতের আমলনামা তাঁর রওজা মুবারকে দেখানো হয়। এ কারণেই তিনি তাঁর উম্মতের ভাল–মন্দ কাজের সাক্ষী দিতে পারবেন। আমলনামা দেখার মাধ্যমে ভাল–মন্দ ঘটনা জানার পর সাক্ষী হওয়াকে গায়েব জেনেই সাক্ষী হওয়া বুঝায় না। গায়েব বলা হয় মাধ্যম ছাড়া কোন কিছু জানাকে।

এরপর মাওলানা মুফতি এজহার সাহেব সূরা আ'রাফের ১৮৮নং আয়াতখানা পাঠ করেন। (আল্লাহ পাকের ভাষায় রসুল (সঃ) বলেন) "যদি আমি গায়েব জানতাম তবে আমি কল্যাণ হতেই অধিকাংশ গ্রহণ করতাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।"

—আল কোরআন

অথচ তিনি অনেক সময় অভাবগ্রস্ত হয়েছেন। তায়েফ, বদর, ওহুদ ইত্যাদি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যদি তিনি গায়েব জানতেন, তাহলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন না, ইহুদীরা তাঁকে যাদু করতে ও বিষপান করাতে পারতো না। এভাবে তিনি কতিপয় ঘটনা দ্বারা পরিস্কারভাবে তুলে ধরেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর উপর আল্লাহর সমান অবগত ছিলেন না।

প্রথম পক্ষের মধ্য হতে পুনরায় সূরা জ্বীন এর ২৬ নং আয়াতখানা উল্লেখ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এ আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় আল্লাহ তাঁর নবীকে গায়েবের খবর অবগত করাতেন। আর গায়েবের খবর দেওয়া ব্যক্তিকে গায়েব জাননেওয়ালা বলা যায়। অন্যদিকে যে সমস্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না উল্লেখ আছে, উহার অর্থ 'গায়েবে জাতি' (সরাসরি) জানেন না। আর আমরা যখন বলি নবী গায়েব জানেন, তার অর্থ 'গায়েবে আতায়ী'। (মাধ্যমে) অর্থাৎ আল্লাহ পাক জানানোর পর জানেন।

এরপর প্রথম (বাতিল) পক্ষ হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সংঘটিত কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেন এবং তারা এটাও উল্লেখ করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানিনা বলে যে বদান্যতা দেখায়েছেন তা তাওয়াযুয়ান বা নিজেকে ছোট মনে করেই বলেছেন।

এবারে দ্বিতীয় পক্ষ হতে হাটহাজারীর মুহতামিম ছাহেব বলেন, এখানে সূক্ষ্মভাবে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। একটা হলো গায়েব জানা। আর অন্যটি হলো গায়েবের খবর জানা। মাধ্যম ছাড়া কিছু জানার যোগ্যতাকে গায়েব জানা বলে। এটা আল্লাহর জন্যই খাছ (Resurved)। গায়েবের এ যোগ্যতাটি বা চাবিটি তিনি কাউকে দান করেননি। তবে ওহী, এলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ পাক কিছু কিছু গায়েবী খবর তাঁর গায়েবী ভাণ্ডার হতে নবী–ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। এভাবে প্রকাশিত গায়েবী খবরকে গায়েব জানা বলা যায় না। বরং 'গায়েবের খবর জানা' বলা হয়। কোরআন পাকে একে 'ইনবা' ও 'ইত্তেলা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন এমন একটি শব্দ কোরআন, হাদীস এবং চার মাযহাবের কোন কিতাবেই উল্লেখ নেই। এখানে তিনি সুন্দর একটি রসাত্মক গল্পের অবতারণা করেন। তিনি বলেন—

মনে করুন একটি পাতিলের মধ্যে কিছু মাছ, গোস্ত বা শুটকি আছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে ঢাকা থাকার কারণে ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। খাদ্য গায়েব থাকার দরুন ইঁদুর বা বিড়াল তা দেখতে পায় না। কিন্তু খাদ্যের ঘ্রাণের মাধ্যমেই ইঁদুর বা বিড়াল তা বুঝতে পারে। আর তাই খাদ্য

না দেখেও ইঁদুর বা বিড়াল পাতিলের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করে বা খুলে ফেলে তা খাওয়ার জন্য। এখন গোপন ও দূরের কোন খবর মাধ্যম দিয়ে জানাকে যদি গায়েব জানা বলা হয়, তাহলে ঘ্রাণের মাধ্যমে ইঁদুর বা বিড়াল বন্ধ পাতিলের খাবারের খবর জানতে পারলো—এটাকেও গায়েব জেনেছে বলতেই হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

এ সময় শ্রোতামণ্ডলী হেসে ফেটে পড়েন। এরপর তিনি বোখারী শরীফের ৩০ পারা, তৌহিদের বয়ান ১০৯৮ পৃঃ হতে একটি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন—সে কপট মিথ্যাবাদী। তিনি তার এ বক্তব্যটি অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে পেশ করেন।

২য় পক্ষে এবারে মাওলানা জুনাইদ ছাহেব বলেন, গায়েব মাত্র এক প্রকার। আর তা হলো 'গায়েবে জাতি'। 'গায়েবে আতায়ী' বলতে এর কোন শাখা নেই। তিনি সুন্নী আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব 'নেবরাছ' থেকে গায়েব শব্দের একটি অর্থই দেখিয়ে দেন এবং আতায়ী জ্ঞানকে গায়েব বলার উপর চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি ফতুয়ায়ে কাজিখানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন, এ কথা বিশ্বাস করা কুফুরী। তিনি আরও জানান, হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাব কাজিখানের ৩য় খণ্ডের ৬২৮ পৃষ্ঠায় 'ইরতিদাদের' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, যদি কোন ব্যক্তি বিনা সাক্ষীতে কোন মেয়েকে বিবাহ করলো এবং বললো, আমি আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বিবাহ করলাম, মুফতিয়ানে কেরামগণ বলেন, এটা কুফুরী কালাম হবে। কারণ, সে বিশ্বাস করলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। অথচ যে গায়েব তিনি জীবদ্দশায় জানতেন না, ওফাতের পর কি করে তা জানবেন? এ ফতুয়া থেকে দু'টি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। এক, গায়েব একপ্রকার। আতায়ী বলে কোন গায়েব নেই। দুই, যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গায়েব জানেন আকীদা রাখবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

এরপর প্রথম পক্ষের এক ব্যক্তি বললেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর

হাদীসটি মওকূফ, মারফু নয়। অর্থাৎ তিনি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না জেনে ঐ কথাটি মনগড়া বলেছেন। বাস্তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন এবং কাজিখানের ফতুয়াটি নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, ফতুয়ার উসূলের কিতাবে উল্লেখ আছে, কাজিখানের যে জায়গায় 'কালু' শব্দ আছে—মুফতিয়ানে কেরামগণ বলেন, সে ফতুয়াটি মু'তাবার নয়। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন না এটা বুঝতে গিয়ে ইঁদুর বিড়ালের দৃষ্টান্ত টেনে হাটহাজারীর হুজুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করেছেন। এটা দেওবন্দীদের পুরাতন অভ্যাস। অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ হতে গায়েবে আতায়ীর উপর যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছিল তার এবং অন্যান্য দলিলের জবাব প্রথম পক্ষ হতে দেওয়া হলো না।

এবারে হাটহাজারীর হুজুর বললেন, সাহাবা (রাঃ)দের মওকুফ হাদীসও মরফু হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। একথা উসুলের কিতাবে উল্লেখ আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না একথা হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না জেনে কখনই বলতে পারেন না। বরং হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ কথা মনগড়া বলেছেন যারা বলেন, তাঁরা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতমা মহিলা মুহাদ্দিস, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর যোগ্যতমা তনয়া, সমগ্র মুসলিম জাতির শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন ও তাঁর মানহানী করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (এসময় উপস্থিত অনেকের মুখেই নাউযুবিল্লাহ পড়তে শুনা যায়)। তিনি আরো বলেন, বিপক্ষগণের বা শ্রোতাদের কেহ যদি স্থূল মেধা বা মোটা জ্ঞানের অধিকারী হন, যারা সূক্ষ্ম কথা বুঝে না বা কম বুঝে তাদেরকে আলোচ্য বিষয় ভালভাবে বুঝানোর জন্য শুধু ইঁদুর বিড়াল কেন, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস দিয়েও দৃষ্টান্ত দেয়া সাহিত্য জগতে দোষণীয় নয়। স্বয়ং আল্লাহ পাকও কোরআন মজিদে মাছি, মাকড়শার মত অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রাণী দিয়ে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। প্রথম পক্ষ আমার দৃষ্টান্তের উপর যেমন আপত্তি করেছেন, আল্লাহ

পাকের দৃষ্টান্তের উপরও আরবের কাফিরেরা আপত্তি করেছিল।

এরপর আমি (লেখক) বললাম, প্রথম পক্ষ কর্তৃক কাজি খানের ফতুয়াকে 'কালু' শব্দের কারণে অগ্রহণযোগ্য বলা ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, কাজি খান ছাড়াও গ্রহণযোগ্য প্রায় সকল ফতুয়ার কিতাবেই উক্ত কুফুরী ফতোয়ার কথা উল্লেখ আছে। যেমন ফতুয়ায়ে শামী, আলমগিরি ২য় খণ্ড ২৯৪ পৃঃ, মুছামারা, বাহারুর রায়েক ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে, 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন' বিশ্বাসকারীদের ব্যাপারে পরিস্কার কুফুরী ফতোয়াটি নেবরাছ কিতাব খুলে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়। আমি আরো বলি, গায়েব জানি না বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ সত্য। নিজেকে ছোট মনে করে তিনি কখনও অবাস্তব ও মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। এরপরেও যদি হুজুর (সঃ) কর্তৃক 'আমি গায়েব জানি না' কথাটি সঠিক নয় বলা হয় তাহলে তাঁর অনেক কথাই সঠিক নয় বরং মিথ্যা বলেছেন স্বীকার করতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ) এবং তিনি মিথ্যা কথাও বলতেন, মেনে নিতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ) এখানে মা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একখানা আছর বা বাণী প্রণিধানযোগ্য যে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একথা বিশ্বাস করে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানা কিছু কথা গোপন করেছেন, তা হলে সে ব্যক্তি মিথ্যুক।—বুখারী ২য়খণ্ড, ১৮ পারায় সূরা মায়েদার তাফসিরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তাঁর এ বর্ণনার সমর্থনে আমরা কোরআন পাক হতে সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াতখানা পেশ করতে পারি। এরশাদ হচ্ছে, "হে নবী পৌছে দিন সবকিছু যা আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ হতে নাজিল করা হয়েছে। আর যদি তা না করা হয় তাহলে (যেন) আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌছাননি।" এরপরই বাহাছের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, শ্রেষ্ঠতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে গায়েব জানেন না সেখানে কোন ওলী, ফকীরের গায়েব জানার প্রশ্নই উঠে না। এখান থেকে পরবর্তী লেখাগুলোর কোন অংশ কুষ্টিয়ার বাহাছ অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়নি।

তৃতীয় বিষয় ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হাজির নাজির?

১ম পক্ষের আকীদা ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির সর্বস্থানে সর্বসময় হাজির (বিরাজমান) ও নাজির (সব কিছু দেখেন) বা (সর্বদ্রষ্টা) হাজির নাজিরের উল্লেখিত এ সংজ্ঞাটিই প্রসিদ্ধ।

২য় পক্ষ—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পরও নির্দিষ্ট স্থানেই ছিলেন ও আছেন। মাঝে মধ্যে বিশেষ কোন কারণে তাঁর আকৃতি একই সময় বহুস্থানে আল্লাহর কুদরতে বা অলৌকিকভাবে দেখা যাওয়া বা তাঁর রূহ মুবারকের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সম্ভব। তবে এটা তাঁর স্থায়ী স্বভাব নয়। ফেরেশতা, ওহী, ইলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বহু সময় অনেক দূরের জিনিসও দেখেছেন ও জেনেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকেও তা জানিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে মু'জেযা, কারামত, খরক্বে আদত, আদাতুল্লাহিল খাছছাহ, কুদরত (অলৌকিক) ইত্যাদি বলা হয়। এ অলৌকিক গুণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবের কোন দখল নেই। বরং আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত নবীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। কোরআন হাদীসে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ অস্থায়ী অলৌকিক ক্ষমতার কথা বহুস্থানেই উল্লেখ আছে।

মোদ্দাকথা, ১ম পক্ষের আকীদা অনুসারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে সর্বস্থানে স্থায়ী হাজির নাজির বলা হয়েছে, ২য় পক্ষের নিকট তিনি ঐভাবে হাজির নাজির নন, বরং উহা বিশ্বাস করা শেরেকী মতবাদ। কেননা, হাজির, নাজির আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। ১ম পক্ষের উক্ত মতবাদের কোন ছহী ও অকাট্য দলিল নেই। কোরআন হাদীস ও সমস্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতে সর্বস্থানে স্থায়ীভাবে একমাত্র আল্লাহই হাজির নাজির।

প্রকৃতপক্ষে এ ৩ নম্বর মতবাদ পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় মতবাদেরই পরিপোষক। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গায়েব জানা এবং আল্লাহর সমতুল্য জ্ঞান সাব্যস্ত হলে তিনি সব

জায়গায় হাজির নাজির এ মতবাদও সাব্যস্ত হয়। দ্বিতীয় মতবাদ সম্বন্ধে কিছু পূর্বেই সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি গায়েব জানেন না। অতএব, তিনি হাজির নাজিরও নন। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষ নিম্নরূপ দলিলাদি পেশ করেন ঃ

প্রথম পক্ষের দলিল—

১. আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন—"নিশ্চয় আমি আপনাকে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাহেদ, (সাক্ষ্য প্রদানকারী) মুবাশ্বির, (সুসংবাদদাতা) এবং নাজির (ভয় প্রদর্শনকারী) রূপে প্রেরণ করেছি।"
—সূরা ফাতাহ, আয়াত ৮

এভাবে সূরা আহযাব ৪৫ নং আয়াতেও রাসূল (সঃ)কে শাহেদ বলা হয়েছে। শাহেদ অর্থ সাক্ষী। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আপনি আপনার উম্মতদের ভালমন্দ আমলের সাক্ষী দেবেন। সাক্ষ্য ঐ ব্যক্তিই দিতে পারে যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সব সময় সর্বস্থানে হাজির-নাজির নাই হন তাহলে বিভিন্ন যুগে সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি উম্মতের ভালমন্দ আমলের সাক্ষ্য কিভাবে দিবেন? সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াত এবং অনুরূপ আরও অনেক আয়াতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাহীদ বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন—"আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্যমপন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতি পক্ষে সাক্ষী হও। আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী।"—আল-কোরআন

দুনিয়ার সমস্ত উম্মতের মাঝে হাজির না থাকলে তিনি তাদের ব্যাপারে নিজ উম্মতের সাফাই সাক্ষ্য কিভাবে দিবেন?

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখি যেরূপ তোমাদেরকে দেখি আমার সম্মুখ থেকে।"—বোখারী

এতেও বুঝা যায় যে, তিনি সর্বস্থানে হাজির-নাজির।

৩. বোখারী শরীফের ১ম খণ্ডের ৩য় পারাতে উল্লেখ আছে যে, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা আমাকে যেখান থেকেই প্রশ্ন কর না কেন আমি জবাব দিব।"

এতেও বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির-নাজির এবং তিনি সব জানেন। নতুবা তিনি কিভাবে সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিলেন।

৪. হস্তি বাহিনীর নায়ক আবরাহার ঘটনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তায়ালা হস্তি বাহিনীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?"—সূরা ফীল

হস্তি বাহিনীর ঘটনা হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ঘটেছে। অথচ তাঁকে বলা হচ্ছে আপনি কি দেখেননি? এতে বুঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভ থেকেই হাজির-নাজির, যা রেজভী এক সম্প্রদায়ের আকিদাও বটে।

৫. প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কবরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে দেখায়ে মুনকির-নকীর বলেন, 'ইনি কে, বল?'—বোখারী শরীফ

এতেও বুঝা যায় যে, তিনি সব জায়গায় হাজির-নাজির।

৬. প্রত্যেক নামাযে মুসল্লীকে প্রত্যেক তাশাহহুদেই বলতে হয়, 'আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যু হান্নাবীইয়ু'। অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম। তিনি যদি হাজির-নাজির না হন তাহলে সর্বস্থানে নামাযের তাশাহহুদে তাঁকে সম্বোধন করে সালাম পেশ করার অর্থ কি?

দ্বিতীয় পক্ষের দলিল—

১. তিনি যদি সর্বসময় সর্বস্থানে হাজির-নাজির হতেন তাহলে ইহুদী, কাফের ও মুনাফিক কর্তৃক কোন সময় ধোকা খেতেন না এবং নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতেন না, অথচ তিনি শত্রু কর্তৃক বহু ধোকা খেয়েছেন এবং বহু বিপদগ্রস্ত হয়েছেন যার কিছু বর্ণনা অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ স্থানটুকু আবার একটু পড়ে নিলে এ তৃতীয় বিষয়টির ফয়সালাও সহজে হয়ে যাবে।

২. কিছু মুরতাদকে তিনি তাঁর সাহাবী মনে করে হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হবে আপনি জানেন না আপনার (ওফাতের) পর এরা কি নব আবিষ্কার করেছে। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আমি বলবো 'ছুহকান, ছুহকান লিমান গইয়ারা বাদ'। অর্থাৎ অভিশাপ বা ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার পর আমার দ্বীনের পরিবর্তন করেছে। ওফাতের আগে ও পরে যদি তিনি হাজির–নাজির হতেন তাহলে এদের দ্বারা দ্বীনের পরিবর্তনের কথা তাঁর না জানার কোন কারণই হয় না।

—মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ৪৮৮ পৃঃ বুখারী, মুসলিম হতে

৩. তিনি যদি সর্বক্ষণ সর্বস্থানে হাজির–নাজির হতেন তাহলে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উপর অপবাদের ঘটনা ওহীর পূর্বেই জানতে পারতেন, কিন্তু জানতে পারেননি, বরং এক মাস পর ওহী নাজিলের মাধ্যমেই তা জানতে পারেন।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—"এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি একজন বশর (মানুষ)। আমার নিকট বিচার প্রার্থী (ফয়সালার জন্য) আসে সুতরাং আমি কোন ব্যক্তির জন্য (তার জাহেরী দলিলের উপর নির্ভর করে) কোন মুসলমানের প্রকৃত হকের ফয়ছালা দিয়ে ফেলি (আর বিচার প্রার্থী জেনে শুনে আমার ফয়ছালার পর তা ভোগ করে) নিশ্চয়ই সে যেন আগুনের একটা খণ্ড ভোগ করলো।"—বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৯ পারা ৩৩২ পৃঃ

এই হাদীস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ। অন্য জাতি নন। (খ) তিনি গায়েব জানেন না। (গ) তিনি হাজির–নাজির নন। যদি তিনি সর্বস্থানে হাজির–নাজির হতেন তাহলে কোন সময় তিনি জাহেরী দলিলের উপর নির্ভর করে ঘটনার বিপরীতে রায় দিতেন না এবং ঘটনার বিপরীত এ রায় গ্রহণ করতে নিষেধও করতেন না।

৫. মেশকাত শরীফ ১ম খণ্ড, দরুদের অধ্যায় ৮৬ পৃষ্ঠা, মুতার্জম মাদারেজুন নবুওয়্যাত ১ম খণ্ড ২৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, "আল্লাহ পাকের একদল ফেরেশতা এমন আছেন যাঁরা তামাম জমিনে ভ্রমণ করে আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছিয়ে দেন।"

—নাসায়ী, দারেমী

৬. উক্ত পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি

বড় হাদীসের অংশ বিশেষ—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়—তোমরা যেখান থেকেই পাঠ কর না কেন।"—নাসায়ী

৭. মেশকাত শরীফের ৮৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্বে আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তা শুনি আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" —শুয়াবুল ঈমান, লিল বাইহাকী ইত্যাদি।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ পরিস্কার বলে দিচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসময় সর্বস্থানে হাজির-নাজির নন। বরং তিনি তাঁর রওজা মোবারকেই থাকেন এবং সারা বিশ্বে পঠিত দরূদ ও সালাম ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর নিকট রওজা মোবারকেই পেশ করা হয়। যদি তিনি আল্লাহর ন্যায় তাঁর উম্মতের ঘরে ঘরে সময় সময় উপস্থিতই হতেন তাহলে তিনি একথা বলতেন না যে, যদি কেউ আমার কবরের পার্শ্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করে তবে তা আমি নিজ কানে শুনি, আর কেউ যদি কবর হতে দূরে থেকে দরূদ ও সালাম পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

৮. মেশকাত ১ম খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠায় এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশ—একবার মদীনা শরীফের ৬ বা ৫টি কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কবরগুলোতে শায়িত ব্যক্তিদেরকে কেউ চিন? এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমি চিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কবে মারা গেছে? জবাব দেওয়া হল, শেরেকীর জামানায়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ উম্মতের পরীক্ষা হয়।—মুসলিম শরীফ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সব সময় সব জায়গায় হাজির-নাজির হতেন তাহলে উক্ত কাফের ব্যক্তিদেরকে চিনতেন অথচ তিনি চিনলেন না।

৯. অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যেখানেই যেতেন সেখানে তাঁর মোবারক

শরীর হতে মেশক আম্বরের চেয়েও বেশী অতুলনীয় সুঘ্রাণ বের হয়ে আশপাশ মোহিত করে ফেলতো। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ও সর্বস্থানে সর্বসময় হাজির নাজির ছিলেন না এবং ওফাতের পরেও না। কেননা, যদি জীবদ্দশায় পৃথিবীর সর্বস্থানেই তাঁর তিনি হাজির–নাজির হতেন তাহলে পৃথিবীব্যাপী তাঁর সুঘ্রাণ পাওয়ার প্রমাণ স্বরূপ কোন সহীহ হাদীস তো দূরের কথা একটি জাল হাদীসও নেই। আর যদি তিনি তাঁর ওফাত শরীফের পর সারা বিশ্বেই হাজির–নাজির হতেন তাহলে সারা বিশ্বেই সব সময় তাঁর সুঘ্রাণে মোহিত থাকত এবং মিলাদ মাহফিল ইত্যাদিতে তাঁর সুঘ্রাণ থাকাকালীন গোলাপ আতরের কৃত্রিম খুশবুর প্রয়োজন হত না।

১০. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাত শরীফের বার দিন পূর্বে বাদ নামাযে জোহর মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সর্বশেষ ভাষণটির শেষে এরশাদ করেন—"জেনে রেখো, আমি তোমাদের পূর্বেই যাচ্ছি, তোমরাও আমার সাথে এসে একত্রিত হবে। হাউজে কাউসারের নিকট সাক্ষাতের ওয়াদা রইল।"

—সীরাতে মোস্তফা ২য় খণ্ড ৩৫১ পৃঃ

তিনি যদি সর্বসময় সর্বস্থানেই হাজির–নাজির হন তাহলে 'তোমাদের সাথে হাউজে কাউসারের নিকট দেখা হবে' এ কথা বলার অর্থ কি?

১১. এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (রোজ কেয়ামতে) সমস্ত উম্মতের মাঝে আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনবেন? জবাবে তিনি বলেন, অজুর কারণে সেদিন তাদের হাত, মুখ, পা উজ্জ্বল হবে অন্য উম্মতের তা হবে না। আর আমি তাদের চিনবো এ ভাবেও যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে আর আমি তাদের এভাবেও চিনবো যে তাদের সামনে তাদের সন্তানাদি দৌড়াদৌড়ি করবে।—মেশকাত ১ম খণ্ড ৪০ মসনদে আহমদ হতে

এ হাদীসও পরিস্কার বলে দিচ্ছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির–নাজির নন। যদি তিনি হাজির ও নাজির হতেন তাহলে সমস্ত উম্মতকে অযু ইত্যাদির আলামত ছাড়াই চিনতেন। উল্লেখিত দলিল ছাড়াও আরও বহু প্রমাণযোগ্য হাদীস আছে যা দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাজির–নাজির নন। এটা কেবল আল্লাহ্ পাকেরই বৈশিষ্ট্য বা গুণ। কোন নবীর প্রতি এ আকীদা রাখা শিরক ও ভ্রষ্টতা। ওহি সমর্থিত ঈমানদার, প্রথম সারির মুসলমান, আল্লাহ্, রসূল (সঃ) ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ, বিতর্কিত ধর্মীয় সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানে হকের মাপকাঠি, সাহাবায়ে কেরামগণও (রাঃ) যে রাসূল (সঃ)কে হাজির–নাজির বিশ্বাস করতেন না তার কিছু নমুনা—

১২. ৪র্থ হিজরী ছফর মাসে আজাল ও কাররাহ্ কবীলা কর্তৃক ধোকা খেয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দশজন সাহাবীকে হযরত আছিম বিন ছাবিতের নেতৃত্বে শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁরা রজি' নামক স্থানে পৌঁছলে ঐ দুই কবিলার লোকেরা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বাণী লেহইয়ানকে তাঁদের প্রতি হামলা করার ইঙ্গিত দিলে তারা দুই শত লোক নিয়ে তাঁদের প্রতি আক্রমণ চালায়। হযরত আছিম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তখন একটা টিলার উপর আশ্রয় নেন এবং কাফেরদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে অসম্মতি জানান। টিলার উপর থাকাকালীন তিনি বলেছিলেন—"আয় আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিন।"

—সীরাতে মুস্তফা ২য় খণ্ড ৫ম পৃঃ, বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য

যদি সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির–নাজির জানতেন তাহলে হযরত আছিম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের অবস্থা জানানোর জন্যে আল্লাহ্র নিকট আরজি পেশ করতেন না। কাজেই বুঝা গেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির–নাজির নন এবং আল্লাহ্ পাক না জানালে তিনি নিজে নিজে দূরের খবর জানতেন না ও দেখতেন না।

১৩. সারিয়ায়ে কুররা বা বীরে মযুনার ঘটনায় ৬৭ জন সাহাবী নির্মমভাবে শহীদ হয়ে গেলে ঐ ঘটনায় জীবিত থাকা সাহাবী হযরত আমর বিন উমাইয়া জমরী (রাঃ) তাঁর অপর এক সঙ্গী হযরত মুনজির বিন মুহাম্মদ (রাঃ)কে বললেন, "চল মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ (মর্মান্তিক) খবর পৌঁছিয়ে দেই।"

—সীরাতে মুস্তফা, ২য় খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা

সাহাবায়ে কেরাম যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্ব

স্থানে হাজির-নাজির মনে করতেন তাহলে হযরত আমর (রাঃ) মদীনায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর পৌছানোর কথা বলতেন না। এভাবে অসংখ্য দলিল আছে যা লিখতে গেলে একটি বড় কিতাব হয়ে যাবে। লক্ষাধিক সাহাবী হতে কেউই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির-নাজির মনে করতেন না। তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, চার ইমাম এবং সর্ব যুগের সুন্নী মুসলমান কেউ এ আকীদা পোষণ করতেন না।

১৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সর্ব সময় সর্ব জায়গায় হাজির নাজির হতেন তাহলে বিশ্বের চতুর্দিক থেকে পতঙ্গের মত তাঁর প্রেমিকগণ তাঁর রওজাতে দরূদ, সালাম ও জিয়ারতের জন্য ভীড় জমানোর এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বহন করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। বরং প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে অবস্থান করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিয়ারত ও কথাবার্তা বলে তৃপ্তিলাভ করতেন।

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির-নাজির' এর স্বপক্ষে পেশকৃত ১ম পক্ষের দলিলগুলোর জবাব ও ব্যাখ্যা ঃ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে কোরআন মজিদে বর্ণিত শাহেদ (সাক্ষী) শব্দের অনেক তফসীর বর্ণিত আছে—

(ক) তিনি যা মুখে বলেন, উহার উপর অন্তর ও আমল দিয়ে তিনি সাক্ষী।—ফাওয়ায়েদে ওসমানী। অর্থাৎ, তিনি যা মুখে বলেন, উহার উপর তাঁর আমল ও বিশ্বাস আছে।

(খ) তিনি কালিমায়ে তৌহীদের সাক্ষী।—রুহুল মায়ানী ২২তম খণ্ড ৪৫ পৃঃ

(গ) হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—শাহেদ শব্দের অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মত অন্যান্য নবীগণ সম্বন্ধে (আল্লাহর থেকে জেনে) এ সাক্ষ্য দেবেন যে তাঁরা তাঁদের দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন।-রুহুল মায়ানী ২৬ পারা ৯৫ পৃঃ

(ঘ) উম্মতের ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষী দেওয়া—যাঁরা তাওর জীবদ্দশায় ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে সাক্ষী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু

যারা তাঁর যুগের উম্মত নন তাদের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী হওয়ার কারণ এ নয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসর্ব সময় সর্ব জায়গায় হাজির–নাজির বা উপস্থিত। বরং প্রতিদিন সকাল–বিকাল অথবা সপ্তাহের একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রওজায় কুদরতিভাবে তাঁর উম্মতের আমলসমূহ দেখানো হয়, যদ্দরুন তিনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত সম্বন্ধে সাক্ষী দিতে সক্ষম হবেন। তাঁর রওজা মোবারকে শুধু তাঁর উম্মতের আমলই দেখানো হয় উম্মতের ছবিসমূহ দেখানো হয় না। তাই তিনি হাউজে কাউসারের নিকট একদল মুর্তাদ ও বেদআতীকে না চেনার দরুন প্রথমত পানি পান করানোর ইচ্ছা পোষণ করবেন ইত্যাদি। বিশ্বস্ত কোন তাফসীরের কিতাবেই একথা নেই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে সর্বস্থানে হাজির–নাজির সেহেতু তিনি তাঁর উম্মতের সর্বপ্রকার ভালমন্দ আমলের সাক্ষ্য দিতে পারবেন রোজ কেয়ামতে। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লাম হাজির–নাজির এউক্তিটিকে তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। —তাফসীরে রুহুল মায়ানী ২২ পারা ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। শাহেদ শব্দের এ ৪র্থ তাফসীর হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়ীব (রহঃ)এর হাদীস হতে মরফু সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়, ফলে এ তাফসীরও বলিষ্ঠ নয়।

(ঙ) 'শাহেদ' শব্দের অর্থ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মতের জন্য সাক্ষী দিবেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হচ্ছে—

হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনি আমার পয়গাম নিজ উম্মতকে পৌছিয়ে দিয়েছেন কি? বলবেন, হাঁ! দিয়েছি। এরপর তাঁর উম্মতগণ আল্লাহর সম্মুখে পেশ হবে এবং তারা নূহ (আঃ)এর উক্ত দাবী অস্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)কে তাঁর দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী তলব করলে তিনি উম্মতে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করবেন। তখন উম্মতে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। এরপর নূহ (আঃ)এর উম্মতেরা উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলবে এ সূত্রে যে যারা আমাদের পরবর্তী যুগের তারা কিভাবে আমাদের যুগ সম্পর্কীত ঘটনার

সাক্ষ্য দিতে পারে? এরপর উম্মতে মুহাম্মদীকে এর উত্তর জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জবাব দেবেন যে, নিশ্চয়ই আমরা ঐ যুগে উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু আমরা ঐ খবর আমাদের নবীর নিকট শুনেছি এবং তাঁর বর্ণিত খবর সত্য হওয়ার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাঁর উম্মতের উক্ত কথার উপর সাক্ষ্য চাওয়া হলে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর উম্মতের উক্ত বক্তব্যের স্বীকৃতি নেবেন।আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবগতি আল্লাহ কর্তৃক জানানোর কারণে সম্ভব হবে।—মায়ারিফুল কোরআন ৭ম খণ্ড ১৭৬ পৃঃ

হযরত মুফতী শফি সাহেব (রহঃ) শাহেদ শব্দের এ ৫নং তাফসীরকেই বোখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদির হাওয়ালায় অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আর ৪র্থ নং তফসীরকে 'হতে পারে' শব্দ দিয়ে উল্লেখ করে তা দুর্বল হবার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। মোটকথা, শাহেদ শব্দের উল্লেখিত ৫টি তফসীরের কোন তফসীর থেকেই 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব স্থানে হাজির–নাজির' এ কথা বুঝা যায় না। তাঁর সমস্ত উম্মতের ভাল–মন্দ আমলের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁকে প্রত্যেক উম্মতের মাঝে উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। এভাবে রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য কেরামান কাতেবীন ও প্রত্যেকের স্ব স্ব অঙ্গ ইত্যাদি নিযুক্ত। ৫ম তাফসীর মতে তাঁর ঐ সাক্ষ্য দেওয়া দেখার উপর নির্ভর করে হবে না। বরং আল্লাহ্ কর্তৃক জানানোর উপর নির্ভর করেই হবে। অর্থাৎ তিনি তাঁর রওজা মোবারকেই স্বশরীরে থাকেন। তাঁর সব উম্মতের সাথে সাথে থাকেন না, আর ঐ রওজাতেই তাঁর সমস্ত উম্মতের আমলনামা তাঁকে দেখানো হয়। তিনি রওজায় বসেই আমলনামা দেখে তাদের প্রত্যেকের ভালমন্দ সমস্ত আমল সম্বন্ধে অবগত হয়ে যান। এ অবগতির ভিত্তিতেই তিনি কেয়ামতের দিবসে সমস্ত উম্মতের ভালমন্দ আমলের উপর সাক্ষী হতে সক্ষম। এ শাহেদ বা সাক্ষী শব্দ থেকে রাসূলের (সঃ) জন্য হাজির নাজির হওয়ার আকীদা বের করা জঘন্যতম অপচেষ্টা ও ধৃষ্টতা এবং কোরআনের চরম অপব্যাখ্যায় শামিল। কোন কিছুর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তা চাক্ষুস দর্শন জরুরী নয়। বরং বিশ্বস্তভাবে কারও মাধ্যমে জেনে এবং অবগত হয়েও যে সাক্ষ্য

দেওয়া যায় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

(ক) প্রত্যেক মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে আল্লাহর তৌহিদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে বলে থাকেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। অথচ এ যুগের কোন মোয়াজ্জিন আল্লাহর তৌহিদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্বন্ধে চাক্ষুস দেখে ও শুনে অবগত নহেন শুধু অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে শুনে ও জেনেই সাক্ষ্য দেন।

(খ) সমস্ত মুসলমানই কালিমায়ে শাহাদত পড়ে ও বিশ্বাস করে অর্থাৎ একথা বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই আর আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অথচ এ যুগের কোন মুসলমান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলী এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়া স্বচক্ষে দেখেনি, শুধু অকাট্য দলিলের উপর নির্ভর করেই সাক্ষ্য দেয়।

(গ) এভাবে উম্মতে মুহাম্মদীগণ রোজ কেয়ামতে হযরত নূহ (আঃ) সহ প্রত্যেক নবীর পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনেই সাক্ষ্য দেবেন, চোখে দেখে নয়।

২। ১ম পক্ষের দ্বিতীয় দলিলের জবাব ঃ

জবাবের পূর্বে সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতটির সংক্ষিপ্ত তফসীর জেনে নিলে জবাব বুঝা সহজ হবে। উক্ত আয়াতের সারমর্ম এই—"হাসরের মাঠে যখন সমস্ত নবীগণের উম্মতেরা তাঁদের নবীগণ কর্তৃক হেদায়েতের দাওয়াত পৌছানোর সত্যতা অস্বীকার করবে তখন উম্মতে মুহাম্মদীগণ তাদের বিরুদ্ধে নবীগণের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এরপর নবীগণের কাফের উম্মতেরা এ বলে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলবে যে, যারা আমাদের যুগে জন্মও লাভ করেনি, তারা কিভাবে আমাদের যুগে সংঘটিত ঘটনার সাক্ষী হবে। তখন উম্মতে

মুহাম্মদী উত্তরে বলবে যে, আমরা যদিও তাদের যুগে উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু তাদের অবস্থাদির ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কোরআন ও তাঁর প্রেরিত সত্য নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যমে এমনভাবে অবগত আছি যা আমাদের চাক্ষুষ দেখার চেয়েও অধিক বিশ্বাস্য। তাই আমরা আমাদের সাক্ষ্যে সত্যবাদী। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হবেন এবং তাঁর উম্মতগণের পক্ষে স্বীকৃতি দিয়ে বলবেন যে নিশ্চয়ই এরা যা বলেছে সব ঠিক। আল্লাহর কোরআন ও আমার শিক্ষার আলোকে তারা তাদের ঐ খবর সম্বন্ধে অবগত হয়েছে।—আশরাফী মায়ারিফুল কুরআন ২য় খণ্ড ১৩ পৃঃ)

উক্ত আয়াতের তফসীরে উম্মত এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়কেই শাহীদ বা সাক্ষী বলা হয়েছে। অথচ কেহই সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী নন। উম্মতে মুহাম্মদীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে সাক্ষ্য দেবেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ থেকে জেনে সাক্ষ্য দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সর্ব স্থানে সর্ব সময় হাজির নাজির হয়ে উক্ত সাক্ষ্য দেবেন না, বরং কোরআন নাজিলের দ্বারা আল্লাহর জানানোর মাধ্যমেই দিবেন, মেছরী সাফার তাফসীরে রুহুল মায়ানী ২২ নং খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠায় তা এভাবে উল্লেখ আছে—অর্থাৎ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাক্ষ্য কোরআন মজীদ থেকে জেনেই দিবেন।"

৩। ১ম পক্ষের (বেদয়াতী) ৩য় দলিলের জবাব ঃ

হুজুর (সঃ) কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে দেখার এ অবস্থা ছিল নামাজের সময় পর্যন্ত সীমিত। জাহেরী হাদীস থেকে ইহাই বুঝা যায়। —ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৬১ পৃঃ

আর যদি এ অবস্থা নামাজের বাহিরেও ছিল মেনে নেওয়া হয় যা কোন কোন বর্ণনা হতে বুঝাও যায়, তাহলে বলতে হবে যে এ অবস্থা ছিল সীমিত স্থানের জন্য। কেননা, তিনি যদি পৃথিবীর সর্বস্থানেই দেখতেন তাহলে বিভিন্ন সময় শত্রু কর্তৃক নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হতেন না। আবার অনেকে দেখার অর্থ 'ওহীর মাধ্যমে জানা ও' নিয়েছেন। এটা ছাড়াও এ হাদীসের আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে। বিভিন্ন

ব্যাখ্যা বহনকারী এ হাদীসটি কিছুতেই ১ম পক্ষের দাবীর স্বপক্ষে দলিল হতে পারে না। কেননা আকীদা সাব্যস্তের জন্য অকাট্য মজবুত দলিল থাকা অপরিহার্য। —কুতুবে আকায়েদ

৪। ১ম পক্ষের ৪র্থ দলিলের জবাব ঃ

(ক) কোন কোন ব্যাখ্যাকারক বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ কথা ওহীর উপর নির্ভর করেই হয়েছে। কেননা, গায়েবী প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়া আল্লাহ পাক না জানালে সম্ভব নয়।

(খ) কাজী আয়াজ (রহঃ) বলেন, জাহেরী হাদিসে এটাই বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা রাগ করে বলেছেন।
—বুখারী শরীফের হানাফী ব্যাখ্যাকারক আল্লামা আইনীর (রহঃ) উমদাতুলকারী ২য় খণ্ড ১১৪ পৃঃ

৫। সুরা ফীলের আলাম তারা (আপনি কি দেখেননি?) অর্থ আপনি কি শুনেননি বা অবগত হননি।? কিংবা আপনি কি হস্তীবাহিনীর কিছু আলামত দেখেননি?—জালালাইন শরীফের টিকা ৫০৫ পৃঃ ও অন্যান্য তাফসীরের কিতাব দ্রষ্টব্য

৬। ১ম পক্ষের ৬ষ্ঠ দলিলেরে জবাব ঃ

কবরের প্রশ্নের ব্যাপারে দুই প্রকার হাদীস আছে—

(ক) মুনকির নকীর বলবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

(খ) ঐ হাদীস যা ১ম পক্ষ উল্লেখ করেছে। প্রথম প্রকার হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত প্রশ্নের সময় প্রত্যেক উম্মতের কবরে উপস্থিত থাকবেন না। দ্বিতীয় প্রকার হাদীস থেকে যদিও জাহেরীভাবে প্রত্যেক কবরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিত হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু এই হাদীসের বাস্তব অর্থ কি তা নিয়ে হাদীস বিশারদগণ অনেক মতভেদ করেছেন যথা— (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওজাতেই থাকবেন তবে প্রশ্নের সময় তাঁর রওজা শরীফ ও মৃত ব্যক্তির কবরের মাঝে কুদরতীভাবে সুড়ঙ্গ করে দেওয়া হবে।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফটো মৃতদের কবরে পেশ করে ফটো মোবারকের দিকেই ইঙ্গিত করে উক্ত প্রশ্ন করা হবে।

(৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ইশারা করে উক্ত প্রশ্ন করা হবে। ইত্যাদি।

—আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম ২য় খণ্ড ৯পৃঃ

প্রথম পক্ষের বর্ণিত অর্থসহ বহু অর্থবিশিষ্ট ঐ হাদীসটি কিভাবে তাদের দলিল হতে পারে? অলৌকিকভাবে প্রত্যেক কবরে উক্ত প্রশ্নের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি যদিও মেনে নেওয়া হয় তবুও এটা থেকে তিনি যে প্রত্যেক জায়গাতেই সর্বক্ষণ হাজির নাজির থাকেন তা কিভাবে বুঝা যায়? মুসলমান দলিল ছাড়া কোন কিছু মান্য করার জন্য বাধ্য (মুকাল্লাফ) নয়।

৭। রেজভীদের ৭নং দলিলের জবাব ঃ

(ক) সবে মে'রাজে 'আলাইকা' (আপনার উপর) শব্দ দিয়ে অর্থাৎ সম্বোধনের শব্দ দিয়ে আল্লাহপাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম প্রদান করেছেন, সেহেতু আল্লাহপাকের ব্যবহৃত (মোবারক) শব্দটিই নামাজের মধ্যে রাখা হয়েছে। যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় সমস্ত ছাহাবীর সম্মুখে ছিলেন না এবং ওফাতের পরে তো কোন মুসলমানের নামাজেই তিনি উপস্থিত নন। অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'আসসালামু আলইকা' (আপনার উপর সালাম) সম্বোধনের বাক্য ব্যবহার করা একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই খাছ। এটা আর কারো জন্য চলবে না।

(খ) ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, এই সালাম পাঠ করার সময় হুজুর (দঃ)কে তোমাদের অন্তরের জন্য হাজির করবে এবং সাথে সাথে এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, ফেরেস্তারা এই সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌছায়ে থাকেন। এ দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন আমরা অনুপস্থিত প্রাপকের নিকট পত্র লিখার সময় সম্বোধনের বাক্য ব্যবহার করে থাকি এই বিশ্বাসে যে, এই পত্রটি ঐ অনুপস্থিত প্রাপকের নিকট পৌছবেই।

(গ) বোখারী, কিতাবুল ইস্তিযানে, কেরমানী, শরহে বোখারী, ছহীহ আবু আওয়ানা, মসনদে আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি কিতাবে বিশুদ্ধ সূত্রে

উল্লেখ আছে, 'আতা' বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের (দঃ) জীবদ্দশায় **'আচ্ছালামু আলাইকা' বলতেন। যখন তিনি ওফাত গ্রহণ করলেন তখন (থেকে) তাঁরা (সব সাহাবী নয়) আচ্ছালামু আলাইকার স্থলে আচ্ছালামু আলান নবী বলা শুরু করলেন। (উল্লেখ্য যে, একদল সাহাবী আলান নবী পড়েছেন। অন্যদল আলাইকা শব্দই চালু রেখেছিলেন এবং এ আলাইকা পড়াটাই উত্তম) ইত্যাদি।**—মাদারিজুন নবুওয়াত ১ম খণ্ড ২৫১ পৃঃ, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৪৫৮ পৃঃ, তানযীমুল আসতাত ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ ইত্যাদি

মুদ্দাকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় সর্বস্থানে হাজির নাজির নন। তা সত্বেও নামাজের তাশহুদে 'আচ্ছালামু আলাইকা' সম্বোধনের **শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম, আচ্ছালামু আলান নাবী** পড়া উত্তম নয়। আর ইহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক নামাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে সালাম দেওয়ার অর্থ হল আল্লাহর ব্যবহৃত বরকতপূর্ণ শব্দটির স্মৃতি বাকী রাখা। এ অর্থ নয় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মত সর্ব সময় সর্বস্থানে হাজির নাজির। হাজির–নাজির হওয়ার কারণেই তাঁকে সম্বোধন করে সালাম দেওয়া হয় এ ব্যাখ্যা কোন সাহাবী বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসরণীয় কোন আলেম হতে উল্লেখ নেই। এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা একমাত্র বেদয়াতী রেজবী গ্রুপের মস্তিষ্ক প্রসূত।—মোঃ হারুন

৬ উছুলের তাবলীগ কি নাজায়েজ ও কুফুরী এবং মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) কি কাফের?

বাহাছের ৪র্থ বিষয়বস্তু ছিল ৬ উছুলের তাবলীগ জায়েজ না, নাজায়েজ?

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে ১ম পক্ষের দাবী মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৬ উছুলের তাবলীগ জায়েজ নয় এবং কেউ এ তাবলীগ করলে কাফের হয়ে যাবে।

২য় পক্ষের দাবী এ তাবলীগ ভাল কাজ এবং কেউ তা করলে কাফের হবে না।

১ম পক্ষের অভিযোগ ঃ

১. ইসলাম ধর্মের ৫টি উছুল বা ভিত্তি—কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। আর তাবলীগ জামাতের হলো ৬ উছুল—কালিমা, নামাজ, ইলম ও যিকর, একরামুল মুসলিমীন, তাছহীহে নিয়্যাৎ ও দাওয়াত। এ জামাত, ইসলামের মূলনীতিই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

২. ইসলামের চার দলীল—কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। আর তাবলীগ জামাতের এক দলীল। তা ইলহাম বা স্বপ্ন। অর্থাৎ এর নিয়মগুলো স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।

৩. তাবলীগের ৬ উছুলে ইসলামের তিনটি উছুল—রোজা, যাকাত ও হজ্জকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪. ৬ উছুলের এ তাবলীগ যদি ফরজ হয় তবে তাবলীগ আবিষ্কারের আগের মুসলমানগণ কি তাবলীগ না করার জন্যে কাফের বা ফাসেক ছিলেন? এ জামাতের বয়স তো মাত্র ৭০ বা ৭৫ বৎসর।

৫. 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিননাছ'—আল এমরান ১১০

অর্থাৎ তোমরা উত্তম উম্মত মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাঁর ৫০ নং মালফুজাতে লিখেন যে, এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার অন্তরে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ ইলহাম হলো হে উম্মতে মুহাম্মদী তোমাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মতই মানুষের উপকারের জন্য বের করা হয়েছে। উক্ত তাফসীরে 'মেসলে আম্বিয়া' অর্থাৎ নবীগণের মতই শব্দ উল্লেখ আছে। এ তাফসীরের অন্তরালে তিনি ও তাঁর জামাতকে নবীগণের সমতুল্য মনে করে খতমে নবুওয়্যাতের ইনকার করা হয়েছে। মুদ্দা কথা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) খতমে নবুওয়্যাতের মুনকির এবং উক্ত কথার মাধ্যমে তিনি নবী দাবী করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

৬. বহু কুফুরী, ফাসেকী আকিদায় বিশ্বাসী আবদুল ওহহাব নজদী ও তৎপুত্র মোহাম্মদ নজদীকে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)এর পীর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) তাঁর ফতুয়ায়ে রশীদিয়াতে সমর্থন করেছেন। অথচ মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাঁর পীর সাহেবকে ত্যাগ করেননি। কাফেরকে সমর্থনকারী হিসাবে তিনিও কাফের হয়ে গেছেন। ইহা ছাড়াও

ছোট খাট আরো বহু অভিযোগ এই জামাতের বিরুদ্ধে ভুল বুঝাবুঝি বা ষড়যন্ত্রমূলক আনা হয়েছে।

১ম অভিযোগের জবাব ঃ

(ক) তাবলীগ জামাত ইসলামের ৫টি বেনা বা ভিত্তিকে মুখে ও কাজে কিছুতেই অস্বীকার করে না বরং এর যে কোন একটির অস্বীকৃতিকে কুফরী মনে করে—বাংলা মালফুযাত, মাওলানা ছাখাওয়াত উল্লাহ অনূদিত ১৩৬ পৃঃ। তদুপরি তাদের ৬ উছুল ইসলামের ৫ উছুলের পরিপন্থীও নয়। যেভাবে মাদ্রাসা, মক্তব, হেফজখানা ও ইসলামী সংস্থাগুলোর কিছু নিয়ম কানুন ও শর্ত থাকে এবং ঐ নিয়ম কানুনগুলো ইসলামী আকায়েদ ও নিয়মাবলীর সাথে সংহতি নির্ধারণ করা হয়। তাবলীগেও ঠিক তেমনিভাবে ৬টি উছুল নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহা ইসলাম ধর্মের কোন উছুল নয়। এরা বলে থাকেন যে, এই ৬টি নিয়মের বা নম্বরের গুণের উপর আমল করে চলতে পারলে পুরা ইসলামের উপর আমল করা সহজ হয়। এ কথা তারা বলেন না যে, এই ৬ উছুলই একমাত্র ইসলাম। নাউযুবিল্লাহ....

(খ) ৬ উছুল শব্দটি এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বা কোন মারকাজি আমীর থেকে উচ্চারিত নয়। ইহা আমাদের বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভাষায় সম্পূর্ণ বানানো কথা। পরবর্তীতে এ শব্দটিই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। তাবলীগের সজাগ ব্যক্তিবর্গ বা আমীরগণ এ শব্দটি ব্যবহারই করেন না। তাঁরা ছয় উছুলের স্থলে ছয়টি গুণ বা কথা বা নং বলে থাকেন। আরবদেশে ৬টি ছিফাত ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে শইয ফওইনটস বলা হয়। দুঃখের বিষয় কিছু লোক এ ৬টি গুণকে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিরূপে অপব্যাখ্যা দিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে ধোকা দিতেছে। নাউযুবিল্লাহ।

২নং অভিযোগের জবাব ঃ

৬নং বা গুণ—পূর্ণ ইসলাম নয় বরং ইসলামের সহায়ক বা প্রচার কৌশল মাত্র যা পূর্বেও বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্ম চার দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আর আলোচ্য তাবলীগ জামাত যা পূর্ণ ইসলামের সহায়ক, স্বপ্নের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়াতে কোনই অসুবিধা নেই। সত্য স্বপ্ন

নবুওয়্যাতের অংশ। যদ্দ্বারা ইসলামের উপকারী বহু গোপন তথ্যের উদঘাটন সম্ভব। হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ আছে।

৩নং অভিযোগের জবাব ঃ

ঐ ৬টি নং বা গুণ সমষ্টিগতভাবে ইসলামের সহায়ক। ইহা পূর্ণ ইসলাম নয় যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ অভিযোগটিও ঠিক নয়।

৪নং অভিযোগের জবাব ঃ

তাবলীগ করা প্রত্যেক উম্মতের যোগ্যতা মত সর্ব যুগেই শর্ত সাপেক্ষে কর্তব্য। তবে প্রচলিত নিয়মে প্রচলিত তাবলীগ জরুরী নয়। এ নিয়ম ছাড়া অন্য নিয়মে তাবলীগ করলেও দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং এ অভিযোগটিও অবান্তর।

৫নং অভিযোগের জবাব ঃ

নবীগণের মত শব্দ বলাতে 'তিনি নবী হওয়ার দাবী করেছেন' অভিযোগ উঠানো এটা তাঁর প্রতি এক চরম ঘৃণ্যতম অপবাদ। কেননা নবীর মত বললেই নবী হয়ে যায় না। যেমন সিংহের মত বললেই সিংহ হয়ে যায় না। ধর্ম প্রচারক ও দ্বীনদার আলেম মাত্রই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। অতীত উম্মতগণের উপর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল না। কেবল উম্মতে মোহাম্মদীর উপরই দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব আল্লাহ কর্তৃক অর্পণ করা হয়। বিধায় ধর্মের শিক্ষা দীক্ষা বা প্রচারের দিকে লক্ষ্য করে কেউ যদি কোন হক্কানী আলেমকে নবীর মত বলে তাহলে ভুল হবে না। কেননা নবীর মত শব্দ বললে নবুওয়্যাতের সাথে অংশীদারিত্ব বুঝানো জরুরী নয়। নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হিসেবে নয় বরং দ্বীন প্রচারের বা দ্বীনের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীর আলেম সমাজ যে নবীর মত তা হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও প্রমাণিত। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের আলেম সমাজ বনি ইসরাইলের নবীগণের মত।—আল হাদীস

মুদ্দাকথা, কোন আলেমকে নবী বলা বেঈমানী। কিন্তু উল্লেখিত অর্থে

'নবীর মত' বলাতে দোষ নাই। বরং উহা হাদীস থেকেও সাব্যস্ত। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে তুলনা করে এভাবে বলা হলে যেমন কেউ বলল, 'ফজলু বাঘের মতো' এর অর্থ এই নয় যে, ফজলু সব দিক দিয়েই বাঘের মতো। বাঘের মত তার লেজ, দেহ ইত্যাদি আছে, বরং কোন বিশেষ অংশে বাঘের সাথে ফজলুর মিল হয়ে গেলেই ফজলু বাঘের মতো, এ কথাটি বলা শুদ্ধ হবে। মাওলানা ইলিয়াসের (রহঃ) উক্ত কথার উপরে অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়তো তার ভাষাগত জ্ঞানই নাই বা তিনি উক্ত বাক্যের বৈধতা জেনেও উদ্দেশ্যমূলক মজলুম মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)এর উপর উক্ত ভ্রান্তিকর অভিযোগটি আরোপ করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের হিদায়েত করুক।

৬নং অভিযোগের জবাব ঃ

আবদুল ওয়াহহাব নজদী ও তৎপুত্র মোহাম্মাদ নজদী সম্বন্ধে দুই প্রকার মন্তব্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

(ক) তিনি একজন খুনী, লা–মাজহাবী ও গোমরাহ ব্যক্তি ইত্যাদি। ইহা ছাইফুল জাব্বার, ফতুয়ায়ে শামী ও তাফসীরে ছাবী ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে।

(খ) তিনি একজন সুন্নী, সংস্কারক ও হাম্বলী মাজহাবভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন ইত্যাদি। তবে কড়া মেজাজী বা কট্টর ছিলেন। যা তাফসীরে রুহুল মায়ানী ইত্যাদিতেও উল্লেখ আছে। তার ব্যাপারে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ তাঁদের অনুসন্ধান অনুপাতেই মন্তব্য করেছেন। তাই তাঁর ব্যাপারে দুনিয়ার মানুষ আজ পর্যন্ত দু'টি বিপরীতমুখী মতামতে অটল রয়েছে। কেউ তাকে খারাপ বলেন, আর কেউ তাঁকে ভালো বলেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) তাঁর সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট শুনেই তাঁকে ভাল লোক ফতুয়া দিয়েছেন। আবার উক্ত দুই নজদী সম্বন্ধে আনীত কুফুরী অভিযোগটি অতিরঞ্জিত এবং শত্রু কর্তৃক প্রোপাগাণ্ডা হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ) উক্ত মন্তব্যের কারণে কাফের হয়ে যান তাহলে বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল মায়ানীর প্রণেতা মাওলানা আলুছী হানাফীও নজদীকে মুসলমান বলার কারণে কাফের হবেন। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আজ পর্যন্ত কোন রেজভীকে দেখা

গেলো না আল্লামা আলুছি (রহঃ)কে কাফের বলতে। বরং সারা বিশ্বের মুসলমানগণ তাঁকে গ্রহণযোগ্য মুফাচ্ছেরে কোরআন ও বিশ্বস্ত হানাফী মুফতি হিসাবে মেনে নিয়েছে। (ইত্যাদি)

পাঁচ জন বিশিষ্ট বুজুর্গ সম্পর্কে কাফের ফতোয়া

বাহাছের প্রথম বিষয় ছিল প্রথম পক্ষ কর্তৃক বেরেলভী ও রেজভীদের ভ্রান্ত এবং জঘন্যতম ফতোয়ায় বিশ্বাস করা। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ), হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আমবেটবী (রহঃ), মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা ইসমাঈল হোসেন দেহলভী (রহঃ) এ পাঁচজন বিখ্যাত বুজুর্গকে বেরেলভী ও রেজভী দল কর্তৃক কাফের ফতোয়া দেয়া হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) যে চাল চাতুরী ও অপব্যাখ্যার আশ্রয়ে যে সমস্ত দলিল দ্বারা তারা এ বিশিষ্ট বুজুর্গগণকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন, তা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হলো—

১. হযরত মাওলানা নানুতবী (রহঃ) তাঁর 'তাহযীরুননাছ' কিতাবের ২৫তম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, যদি মেনে নেয়া হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও কোন নবীর আগমন ঘটবে অথবা তাঁর যুগেই অন্য কোন নবীর আগমন হয়েছে, তাহলেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নবী হওয়াতে কোন অসুবিধা হবে না। আর তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেছেন—জ্ঞানীদের নিকট যুগ হিসেবে কোন নবী আগে বা পরে আসাতে কোন মর্যাদা নেই। মোদ্দাকথা, তিনি (মাওলানা নানুতবী) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুগ হিসেবে আখেরী নবী বিশ্বাস করেন না এবং তাঁর পরেও অন্য নবীর আগমন হতে পারে বলে বিশ্বাসী। (তবে তিনি যে শ্রেষ্ঠ নবী তা বিশ্বাস করেন) অথচ ফতুয়ায়ে তাতিম্মা, আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের ইত্যাদি ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী বিশ্বাস করবে না তারা মুসলমানই নয়।

২. মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)এর বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলে এবং পরিষ্কার বলে যে আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলেছেন এবং এ দোষ তার থেকে প্রকাশও হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ) তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কাফের তো দূরের কথা ফাছেকও বলো না।—উদ্ধৃতিবিহীন কথা।

৩. মাওলানা খলীল আহমদ আমবেটবী (রহঃ) তাঁর বারাহীনে কাতেয়া কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম (জ্ঞান) থেকেও ইবলীস শয়তানের ইলম বেশী। (নাউযুবিল্লাহ)

৪. মাওলানা থানভী (রহঃ) তাঁর 'হেফজুল ঈমান' কিতাবে লিখেন যে, গায়েবী কথার ইলম যে রকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আছে, সে রকম জ্ঞান সকল শিশু, সকল পাগল এমনকি সকল পশু এবং সকল চতুষ্পদ জন্তুরও আছে। অর্থাৎ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েবী ইলম উল্লেখিত ঐ বস্তুগুলোর গায়েবী ইলমের সমান। (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামের অকাট্য ও মৌলিক আকিদা খত্‌মে নবুওয়াতে অবিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শানে অবমাননাকর উক্তি করাতে উক্ত ৪ ব্যক্তি কাফের হয়ে গিয়েছেন এবং উক্ত ৪টি কারণে ৪ ব্যক্তিকে মক্কা মদীনার ওলামাগণও কাফের ফতুয়া দিয়েছেন—হুছামুল হারামাইন। (প্রণেতা আহমদ রেযা খান)।

৫. মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহঃ) (ক) তাঁর কিতাব 'তাকবিয়াতুল ঈমানে' লিখেন যে, হুজুর (সঃ)এর সম্মান নিজ বংশীয় ও আপন ভাইয়ের মতই। (নাউযুবিল্লাহ) (খ) এবং হুজুর (সঃ) চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট। (নাউযুবিল্লাহ) (গ) তিনি তার কিতাব 'ছিরাতে মুস্তাকিম'এ লিখেন যে, নামাজের মধ্যে হুজুর (সঃ)এর খেয়াল আসা গরু গাধার খেয়াল আসা হতেও খারাপ। ইত্যাদি। এ কুফুরী কালামের কারণে তিনিও কাফের ওয়াহাবী।

২য় পক্ষ ঃ

উল্লেখিত পাঁচ ব্যক্তি কাফের তো নয়ই বরং তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও

হানাফী সুন্নি মাযহাবের মহামনীষী ও বুজুর্গানে দ্বীন। এঁদের বিরুদ্ধে যেসব কুফুরী ধারার অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা ও বানোয়াট। ১ম পক্ষ অত্যন্ত হীনউদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কিতাবাদি থেকে বিশেষ বিশেষ অংশগুলো বাদ দিয়ে 'কুফুরী ধারার বাক্য' সাজিয়ে সাধারণ মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অখণ্ড ভারতের অসংখ্য মুসলমান এ গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সারাদেশে ফিৎনা, ফাসাদের আগুন লাগিয়ে মুসলিম জাতির শান্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে চলেছে।

১। মাওলানা কাসেম নানুতবীর উপর আরোপিত কুফুরী ফতোয়াটি মিথ্যা ঃ

হযরত নানুতবী (রহঃ)এর উপর আনিত অভিযোগটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ এই যে, হযরত মাওলানা নানুতবী (রহঃ) তাঁর উক্ত 'তাহযীরুন্নাছ' কিতাবের ১০ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। কোরআন, হাদীস, ইজমার দ্বারা তা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি তাঁকে সর্বশেষ নবী মনে করবে না সে কাফের।"

অনুরূপ বর্ণনা তাঁর কিতাব 'মুনাজিরায়ে আজীবাতে'ও উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর উক্ত 'তাহযীর' কিতাবে তিন প্রকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামূননবী প্রমাণ করেছেন—

(এক) 'রুতবাতান' মর্যাদা হিসাবে।

(দুই) 'জামানান' যুগ হিসাবে। অর্থাৎ তিনি সবার শেষে আবির্ভূত নবী।

(তিন) 'মাকানান' বা জায়গা হিসাবে। অর্থাৎ সাত তবক জমীনের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রথম তবক জমীনের নবীও তিনি।

তাঁর পূর্ণ কিতাবের মর্মার্থই এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত তিন প্রকারেই খাতামুন নবী। এবং এটা তাঁর আকীদাও। বরং যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মনে করবে না সে তাঁর নিকট কাফের। তবে তিনি বলেন যে, খাতামুন্নাবীর উল্লেখিত তিন প্রকারের প্রথম প্রকারটিই জ্ঞানী লোকদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। ২য় প্রকার খতমে জমানীতে বিজজাত (সরাসরি)

কোন সম্মান নেই। আর সাধারণ লোকজনের এই ধারণা যে, খাতম শব্দ ২য় অর্থেই ব্যবহৃত। তিনি বলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তিন প্রকারেই খাতামুন নবী প্রমাণিত হয়েছেন। তবে তিনি যদি ২য় প্রকার (এবং ৩য় প্রকারেও) খাতামুন নবী না হতেন তাহলেও ১ম প্রকার অর্থের দরুন তাঁর খতমে নবুওয়্যাতে কোন অসুবিধা হতো না।

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করেছেন যে, হযরত নানুতবী (রহঃ) তিন প্রকারেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন নবী প্রমাণ করেছেন। এবং যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মনে করবে না তাকে কাফের ফতুয়া দিয়েছেন এবং ঐ তাযযীর কিতাবখানাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। আর ১ম পক্ষের নেতা আহমদ রেজা খান হযরত নানুতবী (রহঃ)এর কিতাবের ৩য় পৃষ্ঠার কিছু ও ২৫ পৃষ্ঠার কিছু নিয়ে মাঝখান থেকে সব ব্যক্য বাদ দিয়ে তার মতলব মত কুফুরী বাক্য সাজিয়ে হযরত নানুতবী (রহঃ)এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন এবং হযরত নানুতবী (রহঃ)এর বাক্য 'ওলাও বিল ফরজ' (যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেয়াও হয়) এর অপব্যাখ্যা করেছেন এবং খতমে জামানিতে 'বিজজাত' বা প্রত্যক্ষ কোন ফজিলত নেই বাক্যটি হতে 'বিজজাত' প্রত্যক্ষ শব্দটি বাদ দিয়ে মারাত্মক খেয়ানত করেছেন। পাঠকবৃন্দ অতীত থেকে সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীদের আচরণ এভাবেই চলে আসছে।

২। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)এর উপর আনীত উক্ত অভিযোগটিও সম্পূর্ণ বানোয়াট ঃ

উক্ত আকীদা কেউ তাঁর কোন কিতাব হতে কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবে না। বরং উক্ত আকীদায় বিশ্বাসীকে তিনিও কাফের জানেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'ফতুয়ায়ে রশীদিয়া' ১ম খণ্ডে ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখে বা মুখে বলে যে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলেন তাহলে সে নিঃসন্দেহে অভিশপ্ত কাফের এবং এটা কোরআন, হাদীস ও এজমায়ে উম্মতের বিপরীত।"

তাঁর এ কিতাবটি আজও ছাপানো আছে। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) তাঁর ওফাতের কিছু দিন পূর্বে তাঁর উপর আরোপিত অপবাদের কথা শুনে পরিষ্কার লিখেন যে, ওই অভিযোগটি আমার দিকে আরোপ করা ভুল, সত্যের অপলাপ মাত্র।—কাতযুল ওয়াতীন ইত্যাদি।

৩। মাওলানা আম্বেটবী (রহঃ)এর উপর নিক্ষিপ্ত অভিযোগটিও সম্পূর্ণ জাল ঃ

তাঁর লিখিত 'বারাহীনে কাতেয়ার' একটি বাক্যকে এদিক সেদিক করে এবং তাঁর বাক্যের বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুফুরী মিথ্যা অপবাদ আনা হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর এই কিতাবটি আজও ছাপানো আছে। স্বচক্ষে দেখে এ কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। মাওলানা আম্বেটবী (রহঃ)এর উপর আনীত উক্ত অপবাদটি প্রচার হলে মাওলানা সৈয়দ মুর্তাজা (রহঃ) তাঁর নিকট একখানা পত্র লিখে কয়েকটি বিষয় তাঁর কাছ থেকে জানতে চান যে, "ইবলীস শয়তানের ইলম কি হুজুর (সঃ) এর ইলম হতে বেশী?" একথাটি 'বারাহীনে কাতেয়া' কিতাবে আপনি স্পষ্ট লিখেছেন বলে আহমদ রেজা খান তার বই 'হুছামুল হারামাইনে' উল্লেখ করেছেন। তাই এ মর্মে নিম্নের বিষয়গুলো আপনার কাছে জানতে চাই—

(ক) বারাহীন অথবা অন্য কোন কিতাবে আপনি এ উক্তি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন কি?

(খ) যদি পরিষ্কার না লিখেও থাকেন তাহলে ইশারা ইঙ্গিতে হলেও উক্ত উক্তি আপনার লেখা হতে বুঝা যায় কি?

(গ) যদি এ উক্তি আপনার লেখা হতে পরিষ্কার বুঝা না যায়, ইশারায় বুঝা যায় তাহলে এ অর্থ আপনি কি উদ্দেশ্যে করেছেন? না করেননি।

(ঘ) যদি এ উক্তি আপনি পরিষ্কার বা অস্পষ্ট কোনভাবেই না করে থাকেন এবং এটা আপনার উদ্দেশ্যেও না হয় তাহলে যে ব্যক্তি এরকম বিশ্বাস রাখে বা বলে যে ছরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবলিসের ইলম বেশী, তাকে আপনি মুসলমান জানেন, না কাফের জানেন? যে এবারত (বাক্য) খান সাহেব 'বারাহীনে কাতেয়া'

হতে নকল করেছে এবং উল্লেখিত উক্তি ঐ বাক্যের পরিস্কার অর্থও বলেছে, আপনার নিকট ঐ এবারতের ছহি অর্থ কি?

উক্ত প্রশ্নসমূহের যে জবাব হযরত আম্বেটবী (রহঃ) দিয়েছেন উহার সারসংক্ষেপ হয় এই—"মৌলভী আহমদ রেজা সাহেব বেরেলভী আমার উপর যে দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন তা একেবারে ভিত্তিহীন এবং অনর্থক। আমি এবং আমার ওস্তাদগণ এ জাতীয় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাফের, মুরতাদ ও মালয়ুন জানি। যে ব্যক্তি শুধু শয়তান কেন যে কোন মাখলুক সম্বন্ধেও এ আকীদা রাখে যে, ছরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর ইলম বেশী, সে কাফের।"

বারাহীনে কাতেয়ার ৪র্থ পৃষ্ঠায়ও এ বাক্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং কোন সাধারণ মুসলমানই যে কোন গুণাবলী ও মর্যাদায় কোন ব্যক্তিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমতুল্য জানে না।

তিনি আরো বলেন, "খান সাহেব বেরেলভী আমার উপর এটা শুধু অপবাদই দিয়েছেন। এর বিচার কেয়ামতের দিন হবে। এই কুফুরী উক্তিটি যে শয়তান (আলাইহিল লায়ান) এর ইলম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশী ইহা বারাহীনের কোন বাক্যে পরিস্কারভাবেও নেই, অপরিস্কারও নেই।"—কতয়ুল ওয়াতীন ইত্যাদি।

৪। হযরত থানভী (রহঃ)এর উপর আনীত উক্ত কুফুরী অভিযোগটিও সম্পূর্ণ প্রোপাগাণ্ডা ঃ

তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত ফতুয়াটি আহমদ রেজা লিখিত 'হুছামুল হারামাইন' বইয়ে যখন ছাপিয়ে আসছিল তখন মাওলানা সৈয়দ মুর্তাজা হাসান দেওবন্দী (রহঃ) হযরত থানভী (রহঃ)এর নিকট একটা পত্র লিখে তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগটি সত্য কিনা জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন যে,

(ক) আমি এই খবীস নাপাক উক্তিটি কোন কিতাবেই লিখিনি।

(খ) এবং লেখা তো দূরের কথা, এ উক্তিটি কোন সময় আমার অন্তরেও কল্পিত হয়নি। আমার লিখিত বাক্য থেকে এ উক্তিটি বুঝাও যায় না।

(গ) এবং এ উক্তি করা আমার উদ্দেশ্যও নয়।

(ঘ) যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস রাখে অথবা বিশ্বাস ছাড়াই পরিস্কার ভাবে বা ইঙ্গিতে এ জাতীয় কথা বলে তাহলে আমি তাকে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে মনে করি। কারণ, উক্ত কথায় ঐ ব্যক্তি অকাট্য বাণীসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। আমার এবং আমার সমস্ত বুযুর্গদের আকীদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমি, আমলী সমস্ত গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্বন্ধে সব সময় হতে এটাই যে, 'বাদ আজ খোদা বুজুর্গ তুই কেচ্ছা মুখতাছার' অর্থাৎ খোদার পর তুমিই (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়। কথা সংক্ষেপ।

তিনি তার এ জবাবী পত্রের নাম রাখেন বাসতুল বায়ান লিকাফফিল লিছান আনকা–তিবি হিফজিল ঈমান।—কাতয়ুল ওয়াতীন ইত্যাদি

৫। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর উপর আরোপিত অভিযোগগুলোও সম্পূর্ণ মিথ্যা ঃ

১। প্রথম অভিযোগটির উত্তর এই ঃ একদিন শহীদ (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণের জামাতে উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি উট এসে তাঁকে সেজদা করলে সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে গাছ, পশু পর্যন্ত সেজদা করে, আমরা কেন সেজদা করবো না? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো। আর নিজ ভাইয়ের (অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ইজ্জত ও সম্মানই করো।

—মেশকাত শরীফ বাবু ইশরতিননিছা

এ হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের জন্য ভাই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ হাদিসেরই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত শহীদ (রহঃ) বলেন, মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। যিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় ভাই। বড় ভাইয়ের মতই তাঁর সম্মান করা চাই। সবার মালিক আল্লাহ। বন্দেগী তাঁরই করা চাই। তিনি আরো লিখেন যে, এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, আওলিয়া, আম্বিয়া, ইমাম, পীরজাদাহ এবং

শহীদ আল্লাহর মুকাররম বান্দা। তাঁরা সবাই মানুষ এবং আমাদের ভাই। (আদম সন্তান ও মুসলমান হিসেবে, বংশীয় হিসাবে নয়।) তবে আল্লাহ তাঁদের বড়ত্ব দান করেছেন। তারা বড় ভাই। আর আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের ছোট ভাই। সুতরাং তাঁদের সম্মান মানুষের মতই করা উচিত, খোদার মত নয়।

পাঠকবৃন্দ ইনসাফের সহিত চিন্তা করবেন, হযরত শহীদ (রহঃ)এর উক্ত সমস্ত বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আঁকটানা বাক্যটি। অর্থাৎ মানুষ যত বড়ই হোক না কেন তার ইবাদত ও সেজদা করা যায় না। হাঁ মর্যাদা অনুপাতে তাঁর সম্মান করা কর্তব্য। হযরত শহীদ (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এক চুল বরাবরও সীমালংঘন করেননি। যদি কেউ তাঁর উপর অভিযোগ তুলেন যে, তিনি তাঁর বক্তব্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বলেছেন তার জবাবে বলা হবে যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বলেননি, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা ভাই শব্দটি তিনি তাঁর ভাষায় উল্লেখ করেছেন মাত্র। পাঠকবৃন্দ, অভিযোগকারীদের ধোকাবাজি বুঝার জন্য এখানে ভাই শব্দের উপর কিছু জরুরী আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। ভাই শব্দটি অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়—

(ক) আদম সন্তান বা মানুষ হিসাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই পরস্পর ভাই ভাই।

(খ) এক দেশী হিসাবে এক দেশের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকই পরস্পর ভাই ভাই।

(গ) ধর্ম ও মাযহাব হিসাবে এক ধর্মাবলম্বী সকলই পরস্পর ভাই ভাই।

(ঘ) উস্তাদ, পীর ইত্যাদি সম্পর্ক হিসাবে এক উস্তাদের সমস্ত ছাত্র, এক পীরের সমস্ত মুরীদ, সকলই পরস্পর ভাই ভাই।

(ঙ) বংশীয় মা, বাপ সম্পর্ক হিসাবে মা, বাপের সমস্ত আওলাদ পরস্পর ভাই ভাই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ভাই শব্দটি ধর্ম হিসাবে অথবা মানুষ হিসাবে অথবা দেশী হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। মা–বাপ বা বংশীয় হিসাবে নয়। ভাই শব্দটি হাদীস শরীফে যে হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, হযরত শহীদ

(রহঃ)ও ঐ হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ফাছাদ সৃষ্টিকারীরা সাধারণ মানুষকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, মাওলানা শহীদ (রহঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বংশীয় বা নিজ মা, বাপ শরীক আপন বড় ভাইয়ের মত সম্মান করার জন্য বলেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে শহীদ (রহঃ)এর আকীদা কি তা তাঁর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' হতেই পেশ করা হচ্ছে—

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী, ওলিগণের সর্দার ছিলেন।"—তাকবিয়া ১৪ পৃঃ

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র পৃথিবীর সর্দার, তাঁর মর্তবা সবার চেয়ে বড় এবং তিনি আল্লাহর আহকামের উপর সবার চেয়ে বেশী অটল এবং আল্লাহর পথ চিনার জন্য সবাই তাঁর মুহতাজ।"—তাকবিয়া ৬৪ পৃঃ

"রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ঈমান আনার অর্থ তাঁকে আল্লাহর রাসূল, এক মকবুল বান্দা এবং সমস্ত মাখলুক হতে গুণাবলীতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ জানা, ইত্যাদি।"—তাকবিয়া, ৭৯ পৃঃ

পাঠকবৃন্দ, যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে মর্যাদা দেন তিনি কি কোন দিন তাঁকে নিজ বংশীয় বড় ভাইয়ের সমতুল্য বলতে পারেন? না, কখনো না। ভাই শব্দটি উক্ত হাদীস ব্যতীত আরো অনেক হাদীসেই উল্লেখ্য হয়েছে। মেশকাত কিতাবুত তহরাতের ৩য় ফছলে উল্লেখ আছে যে, "একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাইদেরকে দেখার আকাংখা পোষণ করেছেন, তখন তার সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? এরশাদ হলো, তোমরা তো আমার সাহাবী, আমার ভাই ওরা—যারা আজও দুনিয়ায় আসেনি।"—আল হাদীস

অনুরূপভাবে ২য় স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে বললেন, ইসলামে তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।—যরকানী (দেওবন্দ ছে বিরিলিতক)

কোরআন মজীদে অনেক নবীর আলোচনায় তাঁদেরকে নিজ উম্মতের ভাই বলা হয়েছে। অথচ তাঁদের কাওমের মধ্যে কাফের মুশরিকও ছিলো। কোরআনে কারীমে সমস্ত ঈমানদারগণকেও ভাই বলা

হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন—ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখওয়াতুন অর্থাৎ "নিশ্চয় মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই।"—সূরা হুজরাত ৯

আরবী এ প্রবাদ বাক্য—কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়াতুন, "সকল মুসলমান ভাই ভাই" সবারই জানা আছে।

আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ বিশেষভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনদিনও নিজ বংশীয় বা মা-বাপ শরীক বড় ভাইয়ের মর্যাদা সমতুল্য নয়। (নাউযুবিল্লাহ) কুফুরী ও বেঈমানীর এ মতবাদ, কখনও হযরত শহীদ (রহঃ)এর মতবাদ হতে পারে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সম্বন্ধে হযরত শহীদ (রহঃ)এর ধারণাকি, তা কিছু পূর্বেই তাঁর কিতাব হতে পেশ করা হয়েছে। এখনো যদি অপবাদকারীরা তাদের মুখ বন্ধ না করে তাহলে তাদের এ খোলা মুখ একদিন জাহান্নামের অগ্নিতালা দিয়েই বন্ধ হবে। ইনশাআল্লাহ।

২। আহমদ রেজা খান কর্তৃক হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ)এর উপর আরোপিত এ অভিযোগটিও যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চামার হতেও নিকৃষ্ট বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ), সম্পূর্ণ মিথ্যা। হযরত শহীদ (রহঃ)এর বক্তব্য ও উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যা থেকে প্রমাণিত হবে যে, তাঁর উপর আরোপিত এ অভিযোগটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ।

হযরত শহীদ (রহঃ) সূরা লোকমানের একটি আয়াত ও উহার অর্থ লেখার পর বলেন যে, "আল্লাহ তাআলা হযরত লোকমান (আঃ)কে জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই তিনি বুঝেছেন যে, জুলুম এটাই যে, একজনের হক কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হক (ইবাদত বন্দেগী) তাঁর সৃষ্টিকে দিলো, (অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগীতে অন্য কাউকে শরীক করে নিলো) তাহলে সে ব্যক্তি বড়র চেয়ে বড় (আল্লাহ) এর হক নিয়ে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টকে দিয়ে দিলো। যেমন বাদশাহের রাজমুকুট একজন চামারের মাথায় রেখে দেওয়ার চেয়ে বড় বে-ইনসাফী আর কি আছে? একিন করে জানা দরকার যে, কোন মাখলুকের মর্যাদা সে বড় হোক আর ছোট হোক, আল্লাহ পাকের মহান মর্যাদার সামনে একজন বাদশাহের মর্যাদার তুলনায় একজন চামারের

মর্যাদার চেয়েও নিকৃষ্ট।"—তাকবিয়াতুল ঈমান ১৪ পৃঃ

হযরত শহীদ (রহঃ)এর উল্লিখিত বাণীর মতলব এটাই যে, সমস্ত সৃষ্টির বড়ত্বের মর্তবা 'লা–শরীক' আল্লাহ পাকের মুকাবিলায় এমনও নয় যেমন কোন বাদশাহের শানের তুলনায় একজন চামারের শান। কেননা বাদশাহ ও চামারের মাঝে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন উভয়েই মানুষ এবং সৃষ্টি, পরমুখাপেক্ষী, উভয়েই আহার করে, নিদ্রা যায়, রুগ্ন ও বিপদগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন প্রকার শিরকত বা অংশীদারিত্ব নেই। কোন বান্দা কোন দিন আল্লাহ হতে পারে না, কিন্তু একজন চামার যুগের পরিবর্তনে বাদশাহ হয়ে রাজমুকুট ও রাজ সিংহাসনের অধিকারী হতে পারে। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে পার্থক্য হৃদয়াঙ্গম করার জন্য মাওলানা শহীদ (রহঃ) বাদশাহ ও চামারের মর্যাদার পার্থক্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কাউকে চামার আখ্যায়িত করা বক্তব্যের মোটেও উদ্দেশ্য নহে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বা তাঁর কোন প্রসঙ্গই এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহর মর্যাদার এ জাতীয় দৃষ্টান্ত শেখ সাহাবুদ্দিন সরওয়ার্দি (রহঃ)এর কিতাব 'সীরাতুল আওলিয়া'র ৫৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ইত্যাদি। খান সাহেবের ফতুয়া মতে এসব বুজুর্গানে দ্বীনও কাফের হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ) —দেওবন্দ ছে বেরিলী তক

৩। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর উপর আরোপিত ৩য় অভিযোগটিও অপবাদ। কারণ,

(ক) প্রথমতঃ 'সিরাতে মুস্তাকীম' কিতাবটি তাঁর নিজের রচিতও নহে বরং এটা তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)এর বাণীসমূহের সংকলন। শহীদ (রহঃ) এবং তাঁর পীর ভাই মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) উভয়ে মিলেই সংকলন করেছেন এবং অভিযুক্ত অংশটি হযরত আবদুল হাই সাহেবেরই সংকলিত। হযরত শহীদ (রহঃ)এর নয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ উক্ত কিতাবটি ফারসী ভাষায় লিখা এবং অভিযুক্ত শব্দটি হল 'ছরফে হিম্মত' যার অর্থ ইচ্ছাকৃত খেয়াল করা অথচ রেজবী সম্প্রদায় উহার অর্থ করেছে 'খেয়াল আশা'। নিঃসন্দেহে এটা জ্ঞানসুলভ খেয়ানত ও ধোকাবাজী। বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাযের মাঝে নবী, শেখ

বা কোন বুজুর্গানে দ্বীনের খেয়াল আসা আল্লাহর বড় দান। এটা হযরত শহীদও স্বীকার করেন। যা উক্ত কিতাবেই উল্লেখ আছে।

(গ) তৃতীয়তঃ 'ছরফে হিম্মত' বা শুগলে বরজখ ও 'সুগলে রাবেতা' সুফীবাদের একটি পারিভাষিক শব্দ। অর্থাৎ সমস্ত কিছু হতে খেয়াল কে হটিয়ে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে খেয়াল করা। এ ভাবের খেয়াল নামাজে নিষিদ্ধ। কেননা কোরআনে আছে, "আমার স্মরণের জন্য নামাজ পড়।"—সূরা হুদ ১৯৩

আবার হাদীস শরীফেও আছে। এরশাদ হচ্ছে—"আল্লাহর ইবাদত কর এ ধারণায় যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।"—মেশকাত-কিতাবুল ঈমান

সুতরাং নামাজে গায়রুল্লাহর ধ্যান জমানো মারাত্মক নিষিদ্ধ এবং উহা নামাজের রূহ ও মকসুদের পরিপন্থী। আবার নামাজে গরু, গাধা ও নিকৃষ্ট বস্তুর খেয়াল জমানো হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের খেয়াল জমানো অধিক মারাত্মক। কেননা, সাধারণ বস্তুর খেয়াল বেশীক্ষণ থাকবে না। পক্ষান্তরে ইজ্জত ও ভক্তির কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের খেয়াল বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে। এটাই শহীদ (রহঃ)এর উক্ত বাণীর মতলব এবং এটা সম্পূর্ণই কোরআন, হাদীসসম্মত মত।

(ঘ) চতুর্থতঃ উক্ত কিতাবের গাও, খর, গরু শব্দটি ফারসী ভাষায় সাধারণত নিম্ন স্তরের বস্তুর জন্য প্রবাদ বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে হযরত শহীদ (রহঃ)এর উপর আরোপিত তৃতীয় অভিযোগটিও যে মিথ্যা তা আশা করি পাঠকবৃন্দ সহজেই অনুধাবন করেছেন। ইহা ছাড়া আরও ছোট–খাটো যে সব অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, সেসবের উত্তর দেওয়া সময়ের অপচয় মনে করি। রেজভী সম্প্রদায় কর্তৃক ওলামায়ে দেওবন্দীদের লিখিত কিতাবসমূহের বিষয়বস্তুকে কাট–ছাট করে ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে তাঁদের উপর কুফুরী ফতুয়া আরোপ করার কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

"তোমরা নামাজের নিকটেও যাবে না, যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত হও।"—সূরা নিছা ৪৩

কিন্তু নামাজ বিরোধী সুবিধাবাদী এক ব্যক্তি কোরআনের উপরোক্ত বাক্যের 'যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত হও' অংশটি বাদ দিয়ে 'তোমরা নামাজের নিকটেও যাবে না' এই অংশটি উল্লেখ করে বলে যে, কোরআনেও নামাজ না পড়ার নির্দেশ রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) যেমন প্রবাদ আছে—"এখানে পেশাব করবে না, করলে ১০০ টাকা জরিমানা হবে।" এক ব্যক্তি 'না' শব্দটি করবে–র সাথে যুক্ত না করে করলে এর সাথে যুক্ত করে সেখানে পেশাব করে দেয়। ফলে তাকে ১০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এ ভাবে বাক্যের ভিতর কম–বাড়া, দাড়ি কমা না বুঝলে অর্থের ভিতর মারাত্মক পরিবর্তন হয়ে যায়।

পাঠকবৃন্দ! উপরে বর্ণিত ওলামায়ে কেরামগণ যাঁদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁরা ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। সারাটি জীবন তাঁরা খাঁটি ইসলামের জন্য ও বাতিলের মুকাবিলায়ই ব্যয় করেছেন। এখন আপনাদের সম্মুখে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হক্কানী ওলামাগণের এবং রেজভী সম্প্রদায়ের নেতাদের কিছু অবস্থা তুলে ধরছি যাতে উভয় পক্ষ ও তাদের মতবাদের ভাল মন্দ দিক সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা এবং সত্য মিথ্যার আসল স্বরূপ উন্মোচন হয়।

তাকবিয়াতুল ঈমান ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ পীর ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)এর অভিমত

'তাকবিয়াতুল ঈমান' হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর লিখিত একখানা প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহা তৌহিদ, (একত্ববাদ) সুন্নাত অনুসরণের শিক্ষা, শিরক, বেদয়াত এবং কুসংস্কার দূরীকরণ বিষয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক। ইহা প্রত্যেক যুগেই বেদাতী ও কবর পূজকদের মধ্যে ভীতি এবং ত্রাস সঞ্চার করিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা এই কিতাবের বিরুদ্ধে তাহাদের জীবন মরণ সমস্যাকে একত্রিত করিয়া সর্বদাই ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে কুফুরী ফতুয়াও ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছে। এই নগন্য (জৌনপুরী) খাদেম তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবখানাকে খুব ভাল করিয়া দেখিলাম, ইহাতে

দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ছুন্নতুল জামাতের মাজহাব অনুযায়ী। উক্ত কিতাবের শব্দ ও বাক্যাবলী বেশ সুন্দর দেখিতে পাইলাম। বেদাতীরা একখানা সনদী কিতাবের লিখককে যিনি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় শহীদ হইয়াছেন তাহাকে কাফের বলিয়া থাকে। (নায়ুজুবিল্লাহে মিনহা) আমরা এইরূপ জঘন্য কাজ হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

চট্টগ্রামের বিখ্যাত বেদাতী মৌলভী মোখলেছুর রহমান ফারসী ভাষায় লিখিয়া মাওলানা কারামত আলী (রহঃ)এর নিকট ৭টি প্রশ্ন প্রেরণ করেন। ঐ প্রশ্নগুলির মধ্যে হযরত সৈয়দ ছাহেব (রহঃ), মাওলানা আবদুল হাই দেহলবী (রহঃ) এবং মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সাহেবের বিষয় সভ্যতা বর্জিত কথা ছিল। উক্ত প্রশ্নগুলির দলিল সহ লাজাওয়াব উত্তর লিখিয়া মাওলানা ছাহেব তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে ৫ম প্রশ্নটি তাকবিয়াতুল ঈমান এর বিষয় সম্বন্ধে ছিল, যে উহা সত্য, না মিথ্যা? এই জঘন্য প্রশ্নের উত্তর মাওলানা সাহেব পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী দিয়াছিলেন।

—মুকাশাফাতে রহম ও মাকামেয়ুল মুবতাদেয়ীন, (প্রণেতা মাওলানা জৌনপুরী (রহঃ))এর উদ্ধৃতিতে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ছাহেবের জীবনী, প্রণীত মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী হতে সংক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত

বিঃ দ্রঃ– মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) উভয়ই হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ)এর খলীফা। তবে হযরত জৌনপুরী (রহঃ) বালাকোটের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। পীরের আদেশক্রমে হেদায়েতের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে রংপুর টাউনে কারামতিয়া মসজিদের পাশে সপরিবারে শায়িত আছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)

জগৎ বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জিলার অন্তর্গত দেওবন্দ হতে পশ্চিম দিকে ১৬ মাইল দূরে নানুতা নামক এক বিখ্যাত গ্রামে ঐতিহাসিক আলেম পরিবারে ছিদ্দিকী খান্দানে ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ ইং সালে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর দেওবন্দের অধিবাসী মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট আরবী ও ফারসী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ছাহারানপুর গিয়ে নানা ওকীল মৌলভী নেওয়াজের নিকট আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক কিতাবাদি শেষ করেন। হাদীসে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মাওলানা মামলুক আলী ছিলেন তাঁর চাচা। তিনি তাঁকে ১২৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ সালের শেষের দিকে দিল্লী নিয়ে যান। সেখানে তিনি কাফিয়াসহ অনেক কিতাবাদি পড়াশুনা করেন। অতঃপর তাঁকে দিল্লীর ওরিয়ন্টাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি তাঁর চাচা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ উক্ত কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক মাওলানা মামলুক আলীর নিকট আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

উপমহাদেশের এক বিখ্যাত তাপস মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী ও ইতিহাস খ্যাত স্যার সৈয়দ আহমদ দিল্লীতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এরপর তিনি সারা ভারতবর্ষের অন্যতম কোরআন ও হাদীসের মারকাজ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর 'মছনদে ইলম'এ ভর্তি হয়ে উক্ত মছনদের দায়িত্বশীল হযরত শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দেদীর (রহঃ) নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। অতঃপর ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও অনন্য গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর সহপাঠী স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর প্রশংসায় যা বলেন তার সারাংশ হলো, মাওলানা নানুতবী (রহঃ) ছিলেন ফেরেশতা চরিত্রের লোক। ইসলামের সকল দিকে গুণান্বিত এমন লোক তাঁর যুগে খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

কর্মজীবনে তিনি মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহঃ)এর দিল্লীস্থ আহমদী মুদ্রণালয়ে সম্পাদনা ও সংশোধনী বিভাগের খুব কম বেতনে চাকুরী শুরু করেন। এছাড়া তিনি বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মোজতাবায়ী মুদ্রণালয়েও বেশ কিছুকাল কাজ করেছেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহঃ) কৃত বোখারী শরীফের বিখ্যাত টিকা লেখার শেষ পর্যায়ে তাঁর উপর ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ পারার হাশিয়া বা টিকা লেখার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি এ কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই

সম্পাদন করেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর জন্য সরকারী অনেক উচ্চপদই খোলা ছিল।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর কিতাবাদি পাঠ করলেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মরত ছাপাখানার চার দেয়ালের মধ্যেই তাঁর দরস সীমাবদ্ধ ছিল। খাছ খাছ কিছু লোক তাতে শরীক হতেন। এদের মধ্যে যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ), মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহুভী (রহঃ), মাওলানা ফখরুল হাসান গঙ্গোহী (রহঃ) প্রমুখ ওলামাগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত নানুতবী (রহঃ) তাঁর ধর্ম শিক্ষাকে জীবিকা নির্বাহের পথ বা উসিলা হিসাবে গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে শিক্ষা বিভাগের মস্তবড় সরকারী কর্মকর্তা হতে পারতেন। দ্বীনি শিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা তিনি পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর পিতা হযরত মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর নিকট নালিশও জানিয়েছিলেন।

মাওলানা কাসেম নানুতবীর (রহঃ) আধ্যাত্মিক মুরশিদ ছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব নামে যে ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা সংঘটিত করেছিলেন মূলতঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)এর অনুসারী মোজাহেদ আলেমগণ। থানা ভবন ও শ্যামলী এলাকার জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ)। ছাব্বিশ বছর বয়স্ক মাওলানা কাসেম (রহঃ) দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রধান সেনাপতির। সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজ রাজশক্তি পরাজিত হয় এবং শ্যামলী এলাকা ইংরেজ শাসন মুক্ত হয়। বৎসরাধিককাল পর ইংরজেদের হাতে দিল্লীর পতন হলে মোজাহেদগণের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অতঃপর ঘোরতর এক যুদ্ধের পর ইংরেজরা শ্যামলী এলাকা পুনঃ দখল করে। বিপ্লবের প্রধান নেতা মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) হিজরত করে মক্কা শরীফ চলে যান। নানুতবী (রহঃ) তিনদিন আত্মগোপন করে সুন্নতে নববী পালন করেন।

সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার সুযোগে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান পাদ্রীরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রতি নগ্ন হামলা শুরু করে। এদের সাথে যোগ দেয় একশ্রেণীর হিন্দু প্রতারক। এদের মধ্যে দয়ানন্দ

স্বরস্বতি নামক একজন ধর্মযাজক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণার এক মারাত্মক ঝড় সৃষ্টি করে। মাওলানা নানুতবী (রহঃ) একাধারে পাদ্রী ও হিন্দু ধর্মযাজকদের মোকাবিলায় অনেক জ্ঞান বিতর্কে (মোনাজারায়) অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিটি বিতর্কেই প্রতিপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মুনাজারাসমূহের মধ্যে মুনাজারায়ে শাহজাহানপুর, মুনাজারায়ে রূড়কী প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখনীর সংখ্যা ২৫ এর ঊর্ধ্বে।

ভারতবর্ষে তখন হিন্দুদের মত মুসলমানদের মাঝেও বিধবা বিবাহ দুষণীয় ছিল। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ), হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ), মাওলানা মুজাফফর রহমান কান্দলবী (রহঃ), মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) প্রমুখদের সংগ্রামী প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রচলন পুনরায় শুরু হয়। মাওলানা নানুতবী (রহঃ) তাঁর বড় বৃদ্ধা বিধবা বোনকেও বিবাহ করার উৎসাহ দিয়ে ধর্মবিরোধী কুপ্রথার উচ্ছেদ ঘটান।

মাওলানা নানুতবী (রহঃ) উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ নামক এক প্রত্যন্ত স্থানে চলে আসেন এবং ১২৮২ হিজরীর ১৫ই মুহররম মোতাবেক ১৮৬৭ সালের ৩০শে মে তারিখে বিখ্যাত দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র থেকে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা। এজন্য লেখাপড়ার সাথে সাথে দেওবন্দ শিক্ষার্থীগণের মধ্যে একটা বিপ্লবী চেতনাও সৃষ্টি করে দেয়া হতো। এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক ছিলেন মোল্লা মাহমুদ এবং প্রথম ছাত্র ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)।

মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। শত বৎসরের ব্যবধানেও তাঁর লেখা প্রতিটি বই মহামূল্যবান বলে গণ্য হয়ে আসছে।

হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে দেওবন্দ মাদ্রাসা তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আজ হতে প্রায় একশত ৩২ বৎসর পূর্বে তা আজ দ্বীনি ইলম শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এই ক্ষণজন্মা মহামনীষী হিজরী ১২৯৭ মোতাবেক ১৫ই এপ্রিল ১৮৮০ সালের বৃহস্পতিবার জোহরের সময় মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। দেওবন্দের আম কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)

সাহারানপুর হতে প্রায় ৩৩ মাইল দক্ষিণে যুক্ত প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদ গঙ্গোহ নামক স্থানে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৪২ হিজরীর ৬ই জিলকদ সোমবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা হেদায়েত আহমদ (রহঃ) তিনি যুগের একজন খাঁটি আলেম ছিলেন এবং দিল্লীর শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ছিলেন তাঁর মুরশিদ।

মাওলানা গঙ্গোহী মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তাঁর পিতাকে হারান এবং মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। গঙ্গোহেই কোরআন শিক্ষা করেন এবং মামার সাথে করনাল গিয়ে তাঁর নিকটেই ফার্সি শেখেন এবং নাহু ও ছরফ শিক্ষা করেন মৌলভী মুহাম্মদ বখশ রায়পুরীর কাছ থেকে। ১২৬১ হিজরীতে দিল্লী গিয়ে মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী (রহঃ)এর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক কিতাবাদি তিনি মুফতি ছদরুদ্দিন আযারদাহ (রহঃ)এর নিকট থেকে শেখেন। শেষে হযরত শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দেদী (রহঃ)এর খেদমতে থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন।

শায়খুল মাশায়েখ হযরত এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর নিকট বাইয়াত হয়ে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রশিক্ষণ করতঃ মাত্র ৫০ দিনের সাধনায় খেলাফত প্রাপ্ত হন। অতঃপর দেশে ফিরে হেকিমী পেশাকে জীবিকা নির্বাহের উছিলা হিসাবে গ্রহণ করেন। পাশাপাশি শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহী (রহঃ)এর শত শত বৎসরের অনাবাদী 'খানকায়ে কুদ্দুসিয়ার' আবাদে মনোনিবেশ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। তাঁর মুরশিদ হযরত হাজী সাহেব তখন শ্যামলী এলাকায় ইংরেজদের সাথে মোকাবেলায় ব্যস্ত। গঙ্গোহী (রহঃ) খানকায়ে কুদ্দুছিয়া থেকে বের হয়ে এলেন এবং মুর্শিদের সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হলেন। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে ইংরেজরা শ্যামলী এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ঐ যুদ্ধে হাফেজ জামেন সাহেব শহীদ হলে মাওলানা গঙ্গোহী (রহঃ) তাঁকে কাঁধে করে পাশের এক মসজিদে নিয়ে

যান এবং তাঁর পাশে বসে কোরআন খতম করেন।

যুদ্ধশেষে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। পরবর্তীতে এক সময় তাঁকে গ্রেফতার করে প্রথমে সাহারানপুর জেলখানায় এবং পরে মুজাফফর নগর জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। এভাবে ছয় মাসাধিক কাল কঠোর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। কারাগারেই বহু কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়। তিনি কারাগারে কয়েদীদের নিয়ে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করতেন।

কারাগার হতে মুক্ত হয়ে তিনি গঙ্গোহতেই দারস ও শিক্ষাদানের কাজে মনোনিবেশ করেন।

১২৯৯ হিজরীতে তৃতীয় বারের মত হজ্জ করে আসেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই ছিহাহ ছিত্তাহ পুরাপুরি খতম করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। সকাল হতে বেলা ১২টা পর্যন্ত তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্রদেরকে খুব স্নেহ ও মহব্বত করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে হাদীসের শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর–দূরান্ত হতে হাদীস পিপাসুদের ভীড় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কোন কোন সময় তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছাতো। তিনি অতি সহজ সরল ভাষায় হাদীসের দারস দিতেন। ফলে সাধারণ লোকও তাঁর কথা সহজেই বুঝতে সক্ষম হতেন। তাঁর হাদীসের দারসে বসলে আমল করারও আগ্রহ এমনিতেই সৃষ্টি হতো। শতাধিক আলেম তাঁর নিকট হতে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও সাগরেদদের জিকির ও সুন্নাহর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ১৩১৪ হিঃ পর্যন্ত তিনি শিক্ষাদান কার্য চালু রাখেন।

১২৯৭ হিজরীতে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে ১৩১৪ হিজরীতে মোজাহেরুল উলুম সাহারানপুর মাদ্রাসার মুরুব্বী নিযুক্ত হন।

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা 'আলকাওকাবুদদুররী' নামক গ্রন্থখানা তার বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তাঁর 'ফতোয়ায়ে রশিদিয়া' একটি উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব।

তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), হযরত মাওলানা খালীল আহমদ আমবেটবী (রহঃ), হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) প্রমুখ। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ)এর পিতা মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব ছিলেন তার শেষ সাগরেদ।

১৯০৫ সাল মোতাবেক ১৩২৩ হিজরীর ৮ মতান্তরে ৯ই জুমাদাল উখরা রোজ শুক্রবার জুমার আযানের পর ৭৮ বৎসর বয়সে এই মহাসাধক ইন্তেকাল করেন। গঙ্গোহ শহরেই তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

মাওলানা খালীল আহমদ আমবেটবী সাহারানপুরী (রহঃ)

মাওলানা খালীল আহমদ আমবেটবী (রহঃ) ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গোহের পথে ঐতিহাসিক আমবেটা নামক স্থানে ১২৬৯ হিজরী মুতাবেক ১৮৫২ ইং সালে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ)এর খানদানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্পর্কে মাওলানা মামলুক আলী সাহেবের নাতি (মেয়ের ছেলে) এবং মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহঃ)এর ভাগিনা।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর নানার হাতে বিসমিল্লাহর সবক নেন। কোরআন, উর্দু, ফারসী, প্রাথমিক আরবী কিতাবসমূহ পড়ার পর তাকে সরকারী ইংরেজী কলেজে ভর্তি করে দেয়া হয়। ঠিক ঐ যুগেই বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মামা তখন ঐ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। তিনি তাঁর ভাগিনাকে ১২৮৩ অথবা ১২৮৫ সালে কলেজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। কাফিয়া হতে শরহে তাহজীব ইত্যাদি অধ্যয়ন করার পর তিনি বিখ্যাত সাহারানপুর মোজাহেরুল উলুম মাদ্রাসায় চলে যান এবং সেখানে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, আকায়েদ, কালাম ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ১২৮৯ ইং সালে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ফিরে আসেন এবং মানতেক, ফালাছাফাহ আদব ইতিহাসের বড় বড় কিতাবাদি পড়ে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। শিক্ষা জীবনেই তিনি এক বৎসরে কোরআন মজিদ হিফজ করেন।

অতঃপর তিনি শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন এবং সাহারানপুর, ভাওয়ালপুর, রায়বেরেলী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৩০৮ হিজরীতে বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন। ১৩১৪ হিজরীতে তিনি দেওবন্দ হতে সাহারানপুর মাদ্রাসায় চলে যান এবং সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৩২৫ হিজরীতে একই মাদ্রাসার নাজেম, সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেস শাইখ জাকারিয়া (রহঃ) ছিলেন তাঁর খলিফা।

আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য তিনি হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)এর মুরীদ হন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রহঃ) নিজ মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন এবং লিখিতভাবে তাঁকে খিলাফত দান করেন। উক্ত খিলাফতনামায় হযরত গঙ্গোহী (রহঃ)ও দস্তখত করেন।

যদিও সকল বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত তবুও ইলমে হাদীসের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশী। তিনি ছিহাহ ছিত্তার হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যায় 'বজলুল মাজহুদ' নামে পাঁচ খণ্ড কিতাব লিখেছেন। তিনি ১৩৩৫ হিজরীতে সাহারানপুরে এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন এবং ১৩৪৪ হিজরীতে পবিত্র মদিনা শরীফে হিজরত করেন। সেখানেই তিনি উহা ১৩৪৫ হিজরী সনে লেখা শেষ করেন। এছাড়াও তিনি আরো কিছু কিতাব লিখেছেন।

মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা অবস্থায় তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৫ই রবিউচ্ছানী, ১৩৪৬ হিজরী সনে তিনি মদিনা মুনাওয়ারাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হযরত ওসমান যুন্নুরাইন (রাঃ)এর পাশে তিনি চির শায়িত আছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

হাকীমুল উম্মত, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, ফকীহ শ্রেষ্ঠ হযরত মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস সানী রোজ বুধবার সোবহে সাদেকের সময় যুক্ত প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর থানাভবনে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর পিতা জনাব মুন্সী আবদল হক সাহেব ছিলেন একজন প্রভাবশালী বিত্তবান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং উচ্চশ্রেণীর সাধক। আর মাতা ছিলেন একজন দ্বীনদার আল্লাহর ওলী। পিতৃকুলের দিক থেকে তিনি ফারুকী বংশ অর্থাৎ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর বংশধর। আর মাতৃকুলের দিক হতে 'আলাভী' অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)এর বংশধর।

মাত্র পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁর স্নেহময়ী জননীকে হারান এবং পিতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাহিরের ছেলেদের সাথে খেলাধুলা বা মেলামেশা করতেন না। বাড়ীতেই ছোট ভাই আকবর আলীকে নিয়েই খেলাধুলা করতেন।

হযরত থানভী (রহঃ)এর মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠ সহজেই কণ্ঠস্থ করতেন। তিনি কোরআন মজিদ ও প্রাথমিক উর্দু, ফারসী কিতাবাদি মীরাটে শিক্ষালাভ করেন। পরে থানাভবনে এসে তদীয় মাতুল ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১২৯৫ হিজরীতে বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায় গমন করেন। তিনি মাত্র ৫ বৎসরেই প্রায় ২২টি বিষয়ের জটিল কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়ন করে দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফেরেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯ বৎসর।

পাঠ্য জীবন শেষে ১৩০১ হিজরীতে তিনি কানপুর ফয়েজে আম মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি ওয়াজ নসিহতের কাজও এগিয়ে চলে। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর, মার্জিত ভাষা, অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী, কোরআন ও হাদীসের সহজ সরল ব্যাখ্যা, মারেফাত ও তাছাউফের সূক্ষ্মতত্ত্ব ইত্যাদি জনগণকে মুগ্ধ করে ফেলতো। তাঁর এ জনপ্রিয়তা দেখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর ওয়াজ মাহফিলে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায়ের কথা মাওলানার নিকট ব্যক্ত করলেন। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালে এ বিষয় নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তিনি মাদ্রাসার কার্য হতে ইস্তফা দেন এবং জনাব আবদুর রহমান খান ও জনাব কেফায়েতুল্লাহ সাহেবদ্বয়ের অনুরোধে টপকাপুরের আর এক মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসা নামে আজও উহা বিদ্যমান আছে।

দেওবন্দে থাকা অবস্থায় মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)এর পবিত্র নূরানী চেহারা দর্শনমাত্র তাঁর হাতে বায়য়াত হওয়ার বাসনা জাগরিত হয়। কিন্তু ছাত্র থাকার কারণে তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়নি।

১৩০৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে হাকিমুল উম্মতের পিতা হজ্জে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে নিলেন স্নেহের পুত্র হাকীমুল উম্মতকে। যথাসময়ে পিতা–পুত্র দু'জনে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর খেদমতে উপনীত হলেন। হযরত মাওলানার প্রথম দর্শনেই হাজী সাহেব পরম পরিতুষ্ট হলেন এবং হাতে হাত রেখে তাঁকে বায়আত করলেন। অতঃপর তাঁর পিতাকেও বায়আত করলেন। হজ্জ শেষে হাজী সাহেব চাইলেন মাওলানা সাহেব তাঁর পাশে ৬ মাস থাক। কিন্তু স্নেহময় পিতা এত দূরে পুত্রকে রেখে আসতে চাইলেন না। অগত্যা হযরত হাজী সাহেব বললেন, পিতার তাবেদারী আগে, এখন যাও, আগামীতে দেখা যাবে।

হজ্জ হতে প্রত্যাগমন করে কানপুরে অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, তাবলীগ, ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি কাজ পুরাদমে চলতে লাগলো। এ দিকে মুর্শিদের সাথে পত্র বিনিময়ও চলতে লাগলো। আল্লাহর ফজলে পার্থিব সংশ্রব অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁর মন ধাবিত হলো। মুর্শিদের নির্দেশে মন না চাইলেও মাদ্রাসার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেন না। এমনিভাবে তিনটি বৎসর কেটে যাওয়ার পর ১৩১০ সালে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। প্রথম হজ্জে মুর্শিদের নিকট ৬ মাস থাকার আহবান তাঁর বার বার স্মরণ হতে লাগলো।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মক্কা শরীফ গমনের অনুমতি পত্র আসল। স্নেহের মুরীদ তাঁর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকে কাছে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর মুর্শিদও তাঁর স্নেহের মুরীদকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। এভাবে ৬মাস মুর্শিদের সংস্পর্শে থেকে তিনি কামালিয়াতের উচ্চ শিখরে পৌছলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণতার স্তরে পৌছল। মুর্শিদের আন্তরিক দোয়ায় মাওলানার অন্তকরণ এলমে মারেফাতে পূর্ণ হয়ে গেল। বিদায় গ্রহণকালে হযরত হাজী সাহেব মুরাকাবায় বসে বললেন, আশ্চর্য! এর সম্মান কাসেম নানুতবী ও রশিদকে (গঙ্গোহী) অতিক্রম করে গেল। বস্তুতঃ এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল।

হিজরী ১৩১৫ সনে মাওলানা সাহেব কানপুর হতে থানাভবনে ফিরে এলেন এবং খানকায়ে এমদাদিয়ার আবাদে মশগুল হলেন। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দলেদলে বহু আলেম, ওলামা, অর্ধশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই তাঁর দরবার হতে ফয়েজ হাসেল করার জন্য সমবেত হতো, প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী তা লাভ করতো।

তিনি ছিলেন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। ইসলামের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাঁর কলম চলেনি। তাঁর এই বহুমূখী প্রতিভাই তাঁকে বানিয়েছে বিখ্যাত মোফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং লেখক। তিনি প্রায় ১০০০ (এক হাজার) কিতাবাদি লিখেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি ১০/১২ জেলদেরও আছে। তাঁর তাফসীরে আশরাফী বা তাফসীরে বায়ানুল কোরআন অদ্বিতীয়। 'বেহেশতী জেওর' তার আর একটি বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ। পাক–ভারত–বাংলার এমন কোন ঘর বোধহয় নেই যেখানে এই কেতাবখানা নেই। কেতাবখানা মেয়েদের জন্য লিখা হলেও ইহা এমন মকবুল হয়েছে যে, পুরুষরাও এমনকি আলেমগণও এ থেকে উপকৃত হচ্ছে। হানাফী মাযহাবের উপর লেখা তাঁর আর এক বিরাট খেদমত হলো 'এ'লায়ুছছুনান'। হানাফী মাযহাবের প্রতিটি আমল যে ছহিহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তা তিনি এ কিতাবে প্রমাণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি এ সমস্ত কিতাবের আইনগত স্বত্ব রাখেননি বা কোন এক খান কিতাব হতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও উপার্জন করেননি। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমত ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্যই লিখে গেছেন।

গোটা ভারতবর্ষের এমন কি বহু দেশের হাজার হাজার মানুষকে এমনকি দেশবরেণ্য অসংখ্য ওলামাকেও তিনি পীর–মুরীদির মাধ্যমে সংশোধন করেছেন। আম, খাছ, ছোট, বড় সর্বস্তরের লোক তাঁর পরশে এসে খাঁটি হয়েছে। সংশোধন হয়েছে। তাই তিনি 'হাকিমুল উম্মত' বা উম্মতের ডাক্তার। অনেক ছুফী, পীর ইলমে তাছাউফকে বিকৃত করেছিল। তিনি এই বিকৃত তাছাউফকে ত্রুটিমুক্ত করে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁরই সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ও চিকিৎসা দ্বারা তাছাউফের ভ্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইহা ছাড়াও দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মাঝে প্রবেশকৃত ভ্রান্তির সংশোধন করেন। তাই তিনি যুগের

সংস্কারক ও ১৪শ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ।

দূরদর্শী, দৃঢ়চেতা, সূক্ষ্মদর্শী, স্বাবলম্বী, সত্যপ্রিয়, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত এই জ্ঞান তাপস বুজর্গ ১৯শে জুলাই ১৯৪৩ ইং মোতাবেক ১৩ই রজব, ১৩৬২ হিজরী সোমবার দিবাগত রাতে এশার নামাজের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন। ইন্তেকালের দুইদিন পূর্বে পাঞ্জাবের এক মসজিদের ইমাম (যিনি সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর সাগরেদ ছিলেন) স্বপ্নে দেখেন, আকাশ প্রান্তে ধীরে ধীরে লিখা হচ্ছে, 'কাদ কুসেরা জানাহুল ইসলাম'। (ইসলামের বাহু ভেঙ্গে গেছে)।

তাঁর নামাজে জানাজার ইমামতি করেন তাঁরই ভাগ্নে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ)। তাঁর কবর শরীফ থানাভবনের কবরস্থানে নিশানবিহীন অবস্থায় রক্ষিত আছে।

মুজাহেদে আ'জম বিপ্লবী আলেম শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)

হিজরী ১৩তম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ আমীরুল মু'মিনিন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)এর দক্ষিণ হস্ত ও খলিফা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুজহেদ আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), ইংরেজী ১৭৭৮ সাল মুতাবেক ১১৯৩ হিজরীর ১২ই রবিউচ্ছানী দিল্লী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২শ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও ভারতমুরব্বী শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)এর নাতি। যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও বুজুর্গ হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ), হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) এবং হযরত শাহ রফিউদ্দিন (রহঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)। তাঁরা ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)এর বংশধর।

ছোটবেলায় পিতা শাহ আবদুল গনি (রহঃ)কে হারিয়ে তিনি চাচা হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন ও তাঁর নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। দীর্ঘ দিন তিনি চাচা ত্রয়ের সংশ্রবে থেকে ইলমে দ্বীন হাসেল করে অত্যন্ত বিচক্ষণ আলেম, বক্তা ও

সমাজসেবক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৪/১৫ বৎসর বয়সেই শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি কর্মময় জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার, শিরেক, বেদআত মুসলিম সমাজ হতে দূর করার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী সুবক্তা ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী। সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দিল্লী থেকে বহু বেদআত উচ্ছেদ করতে সমর্থ হন। এ ব্যাপারে তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করেন।

তিনি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের লোকদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শরাবী, জুয়ারী, ব্যভিচারী ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত লোকজনকেও দরদের সাথে সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালাতেন। ফারুকী নমুনায় তাঁর এই সংস্কার আন্দোলন চলাকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশীয় এজেন্টদের ইঙ্গিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করা হয়। এবং তাঁর আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য নামধারী কিছু আলেম দ্বারা তাঁকে 'লা মাযহাবী' আখ্যা দেওয়া হয়। এতেও কোন কাজ না হওয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে তাঁর ওয়াজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তিনি বৃটিশ এজেন্টদের সাথে বাহাছ, বিতর্ক করে তাদের পরাজিত করেন এবং তারা তাঁর যুক্তির কাছে টিকতে না পেরে তাঁর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সাদাসিদা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাঁকে দেখলে কেউই অনুমান করতে পারতো না যে, ইনিই দিল্লীর তথা ভারতের সবচেয়ে উচ্চ ও সুপ্রসিদ্ধ খানদানী শাহ ওলীউল্লাহ পরিবারের একজন সদস্য। মূলতঃ তিনি ছিলেন শাহ ওলিউল্লাহর চিন্তাধারার বাস্তব নমুনা। রাজতন্ত্রের বড় দুশমন, আযাদী আন্দোলনের বীর পুরুষ। তাঁর শারীরিক, মানসিক ও জিহাদী চিন্তা–চেতনার দিকে লক্ষ্য করে তাঁর চাচা শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) তাঁকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)এর সাথে জেহাদী আন্দোলনে যোগদানের নির্দেশ দেন। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকা তাঁর ছিল অসহনীয়। তাঁর জীবন জেহাদ থেকে শুরু হয়ে জেহাদের উপরই খতম হয়।

যৌবনের প্রারম্ভেই ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার লক্ষ্যে শরীরচর্চাসহ নানান কলাকৌশল রপ্ত করায় ব্রতী হন। শরীরকে

অধিক তাপ সহ্য করার উপযোগী করার লক্ষ্যে তিনি দিল্লী জামে মসজিদের বারান্দায় উত্তপ্ত পাথরে শরীর এলিয়ে দিতেন এবং দুপুরের প্রখর তাপের মধ্যেও টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি যমুনার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার কেঁটে দিল্লী থেকে সুদূর আগ্রা পর্যন্ত যেতেন। আবার সেখান থেকে সাঁতরিয়ে দিল্লী ফিরে আসতেন। তিনি শীতের দিনে প্রায় বিনা বস্ত্রে কিংবা গরমের দিনে গরম পোশাকে সফর করতে পারতেন। তিনি ভূখা ও পিপাসার্ত থাকার অভ্যাসও করেছিলেন। যার জন্য গরমের দিনেও তিন দিন পর্যন্ত পানি পান না করে থাকতে পারতেন। এমন কি দশ দিন পর্যন্ত তিনি নিদ্রাহীন জীবন–যাপনও করতে পারতেন। তিনি বলতেন মানুষ ইচ্ছা করলে সৃষ্টি তার ক্ষতি করতে পারে না।

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক, ময়দানে জিহাদের বিচক্ষণ নির্ভিক সেনানায়ক। ভারতীয় মুসলমানদের দূরাবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং মুসলিম উম্মার মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে তিনি ফরজ মনে করতেন। এ সময় শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অগ্রযাত্রাকে পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে এদেশের জনগণকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এক ফতুয়া জারী করলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, এদেশ দারুল ইসলাম নয় বরং দারুল হরব বা ইসলামী রাষ্ট্র নয় শত্রুদেশ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানেরই জেহাদে অংশগ্রহণ করা ওয়াজেব। তিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ)কে প্রধান ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ ও কনিষ্ঠ জামাতা মাওলানা আবদুল হাই সাহেবকে সহকারী করে এক মোজাহিদ বাহিনী গঠন করেন।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ (রহঃ)এর সহিত ১৮১৮ সালে হজ্জে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেন। প্রায় তিন বছরে এ হজ্জের সফর শেষ হয়। ঐ সফরেই জেহাদের যেমন লোক সংগ্রহ হয়েছে তেমনি জেহাদের পরিপূর্ণ রূপরেখাও তৈরী হয়েছে।

সশস্ত্র জেহাদ শুরু করার লক্ষ্যে ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী রায়বেরেলী হতে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর যে জেহাদী কাফেলা যাত্রা করে তাতে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) অংশগ্রহণ করেন এবং সৈয়দ আহমদ (রহঃ)এর প্রধান সহচর ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন।

রন্‌জিত সিংহের সেনাপতি বুধ সিং এর সহিত আকুরা খটকে মুজাহিদদের যে যুদ্ধ হয় তাতে বুধ সিংহ তার সৈন্য সহ পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর নেতৃত্বে রাতের অন্ধকারে শিখদের ছাউনি আক্রমণ করা হয় এবং বহু অস্ত্র, রসদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

পরবর্তীতে পেশোয়ারও মুজাহিদদের দখলে আসে এবং সে এলাকায় ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এই খেলাফত ও জেহাদ এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া শুরু হয়। এমনকি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুজাহিদদের 'ওয়াহাবী' বলে সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টাও চালানো হয়। বাধ্য হয়ে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এসব ভাড়াটিয়া পীর ও শিয়াদের ফতোয়ার মোকাবিলায় 'মানসাবে ইমামত' নামক মূল্যবান এক কিতাব লিখেন। এতে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার ও এ উদ্দেশ্যে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করার লক্ষ্যে জিহাদ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

১৮৩১ ইং সালের ৬ই মে মোতাবেক ১২৪৬ হিঃ ২৪শে জিলকদ রোজ শুক্রবার মুজাহিদ শিবিরে জুমার নামাজের আয়োজন চলছে। এমন সময় রাজা রনজিত সিং এর পুত্র শের সিং প্রায় ২০ হাজার সুসজ্জিত শিখ সেনা নিয়ে তিন দিক হতে আক্রমণ করে বসলো। প্রথমে মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধে তারা টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুজাহিদগণ তাদের পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায় এবং পাহাড়ে উঠার প্রচেষ্টারত শিখদের পা ধরে টেনে নীচে নামিয়ে কতল করতে শুরু করে। ইত্যবসরে সৈয়দ আহমদ (রহঃ) লোকজনের চোখের আড়ালে চলে যান। মুজাহিদগণ ভাবলেন তিনি বোধহয় ইন্তেকাল করেছেন। এদিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) শাহাদত বরণ করেন। আর এই সুযোগে শিখ বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে সৈয়দ আহমদ (রহঃ) সহ প্রায় দেড়শো মুজাহিদকে শহীদ করেন। যে মুজাহেদী কাফেলার ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী মোতাবেক ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছ ছানী রায়বেরেলী হতে যাত্রা শুরু হয়, বহু

জনপদ, প্রান্তর ভূমি, নদী–নালা, পাহাড়–পর্বত, বন–জঙ্গল এবং উপত্যকা ভূমি অতিক্রম করে তা ১৮৩১ সালের ১৭ই এপ্রিল মোতাবেক ১২৪৬ হিজরী ৫ই জিলক্বদ মাসে বালাকোটে প্রবেশ করে এবং মাত্র ১৯ দিনের মাথায় এ যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত মুফাচ্ছির মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ, মহাসংস্কারক, মুজাদ্দেদী দেমাগের অধিকারী। এই মর্দে মুজাহিদকে তাঁর চাচা শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ) এক চিঠিতে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' হিসাবে সম্বোধন করেন। তাঁর লিখুনী শক্তি ছিল অসাধারণ। এ দিক থেকে তিনি তাঁর দাদা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)এর যোগ্য উত্তরসূরী। মানসাবে ইমামত, আকাবাত, তাকবিয়াতুল ঈমান ও সিরাতে মুস্তাকীম তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে তাকবিয়াতুল ঈমান ও সিরাতে মুস্তাকীম গ্রন্থদ্বয় তার অসাধারণ প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে। তাকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থ দ্বারা মুসলমানদের যে আকীদাগত সংশোধনী এসেছে তা কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সুশৃঙ্খল চেষ্টার দ্বারাও হয় তো সম্ভব হতো না। হযরত গঙ্গোহী (রহঃ) বলেন, উক্ত 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের উছিলায় হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)এর জীবদ্দশাতেই প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ লোক আকীদাগত ত্রুটিমুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর ওফাতের পর আরও কত উপকার হয়েছে তা অনুমান করা সুকঠিন। সংস্কার আন্দোলনের জেহাদ দ্বারা তাঁর যে কর্মময় জীবন শুরু হয় বালাকোটের জিহাদে শাহাদত বরণের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। লাহোরের বালাকোট নামক স্থানেই তাঁর কবর বিদ্যমান।

মুবাল্লেগে আ'জম মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ১৩০৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ ইং সালে ভারতের যুক্ত প্রদেশের কান্দালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ইসমাঈল কান্দলবী (রহঃ) একজন বড় ওলীয়ে কামেল ছিলেন। তাঁর মা হাফেজা সাফিয়্যা খাতুনও একজন উচ্চস্তরের ওলি ছিলেন। তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)এর চাচা। তিনি ছিলেন পিতা, মাতার তৃতীয় সন্তান। মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক হতে তিনি ছিলেন

ছিদ্দিকী খান্দানের অন্তর্ভুক্ত। পারিবারিক পরিবেশেই পবিত্র কোরআন হেফজ সহ প্রাথমিক কিতাবাদী পাঠ সমাপ্ত করেন।

অতঃপর বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়ার সাথে গঙ্গোহে যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আলেম হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (রহঃ)এর সান্নিধ্যে আসেন। বিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তিনি মাওলানা গঙ্গোহী (রহঃ)এর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া ছাড়াও তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক তা'লীমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত গঙ্গোহী (রহঃ)এর ইন্তেকালের পর তিনি ১৩২৩ হিজরীতে এলমে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে আসেন। এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহঃ)এর নিকট এলমে হাদীস পাঠ করে সনদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁর নিকট হতে ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যে জিহাদেরও শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হযরত গঙ্গোহীর (রহঃ) বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)এর হাতে বয়য়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফতও লাভ করেন।

তিনি ১৩২৮ হিজরী সনে সাহারানপুরের মাদ্রাসা মোজাহেরুল উলুমে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৩৩৪ হিজরী সনে তাঁর বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়ার ইন্তেকালের পর পরিবারের সদস্য, আত্মীয় এবং ভক্ত অনুরক্তদের অনুরোধে মরহুম পিতার ও বড় ভাইয়ের কর্মস্থল দিল্লীর বস্তি নিযামুদ্দিনে অবস্থিত মসজিদ ও মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এই সময় তিনি দিল্লীর দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত 'মেওয়াত' অঞ্চলের দূরাবস্থা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। এই এলাকাবাসীগণ মুসলমান হলেও ১৮৫৭ ইং সালে সিপাহী বিপ্লবের পর তারা ইসলাম ধর্ম হতে বহু দূরে সরে যায়। তাদের ইসলামী পরিচিতি পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়ার পথে। অত্র এলাকায় মাওলানা ইসমাইল (রহঃ)এর কিছু মুরীদ ছিল। তাঁদের সহায়তায় তিনি প্রথমেই দশটি মক্তব খোলেন এবং কোরআন পাঠ ও দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এতে কিছুটা ফল দেখা দিলেও বয়স্ক নিরক্ষরদের কোন উপকার এর দ্বারা হচ্ছিল না। অতঃপর তিনি বেতনধারী মোবাল্লেগ দ্বারা বয়স্কদের নিকট গিয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বয়স্ক লোকেরা সংসারের বিভিন্ন

কাজের ব্যস্ততার কারণে তাদের নিকট থেকে কোন দ্বীনি শিক্ষা হাছেলের সুযোগ গ্রহণ করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর ওস্তাদ হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরীর সহিত হজ্জে গমন করেন। হজ্জের সফরে মদিনা মনোওয়ারায় অবস্থানকালে তিনি ময়দানে নেমে তাবলীগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, যারা দ্বীনি শিক্ষা লাভ করতে পারেনি সেসব লোককে একদিকে যেমন মক্তব মাদ্রাসায় ভর্তি করা সম্ভব নয় অন্যদিকে তেমনি সাংসারিক কাজ কর্মে পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের পক্ষে দ্বীন শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও যদি তাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বের করে নিয়ে মসজিদ অথবা আলেম ওলামাগণের সাহচর্যে রাখা হয় তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এবাদত বন্দেগীর সুন্নত নিয়ম পদ্ধতি এবং দ্বীনি জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় তালিমটুকু রপ্ত করতে পারবে। তিনি আরো চিন্তা করলেন, যে পর্যন্ত না তাবলীগ ও সংশোধনের কাজ ইসলামের প্রাথমিক যুগের তরীকায় না হবে অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে নিজের জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মত একদল লোক তৈরী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আওয়ামের মাঝে দ্বীনের তলব পয়দা করা কঠিন হবে।

অতঃপর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে একদিকে মেওয়াতীদেরকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য বাড়ীঘর ছেড়ে দ্বীন শিখার ও শিখানোর জন্য তৈরী করতে সমর্থ হলেন অন্যদিকে ওলামাদেরকেও একথা বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, তাবলীগ ও এছলাহের কাজ ওলামাদের, আওয়ামদের নয়। ফলে, ওলামা ও আওয়ামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্বীনের এই কাজ মেওয়াত হতে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

অতঃপর তিনি মেওয়াতী মুবাল্লিগগণকে ভারতের প্রসিদ্ধ এলমি কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে ওলামাদের থেকে ফয়েজ বরকত হাছেল করার ব্যবস্থা করেন এবং দেওবন্দ, সাহারানপুরের মত এলাকার ওলামাগণকে মেওয়াতে এসে কাজের অগ্রগতি দেখার ও তাদেরকে ফয়েজ বরকত দিয়ে আলোকিত করার জন্য অনুরোধ জানান। ওলামাগণ মেওয়াত

এলাকার অভূতপূর্ব দ্বীনি উন্নতি দেখে খুশী হন ও তাদের জন্য দোয়া করেন। তাই তো মেওয়াতবাসীরা তাবলীগি কাজে সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত।

দ্বীনের এই তাবলীগি কাজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ১৩৫৬ হিজরী সনে হজ্জে গমন করেন এবং সেখানে ভারতীয় বণিকদল, আরবীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়াও তিনি বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সাথে মত বিনিময় করে তথায় তাবলীগি কাজ চালু করার বীজ বপন করে আসেন।

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) শারীরিকভাবে অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। পাঠ্য অবস্থায় তিনি সাত বৎসর অসুস্থ ছিলেন। হেকিমের পরামর্শ মোতাবেক তিনি ঐ সাত বছর পানি পান হতে বিরত ছিলেন। শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও তিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন বলিয়ান। আর তাই তিনি যে তাবলীগি কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাতে হয়েছেন সফল। হাজার হাজার এমন ত্যাগী ব্যক্তি তৈরী করে গেছেন, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীনের এ মেহনতী কাজকে পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বের আনাচে কানাচে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর তাবলীগের রাস্তায় সফল নেতৃত্ব দিয়ে এ মহান সাধক পুরুষ ১৩৬৩ হিজরী সন মুতাবেক ১৯৪৪ সনের ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যে সব মহান ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারকের অসাধারণ কীর্তিগাঁথা চির অক্ষয় ও অম্লান হয়ে আছে ও থাকবে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাঁদেরই একজন। তাঁর পরবর্তীতে তাঁর এ চিন্তাধারাকে বিশ্বব্যাপী যারা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁরই উত্তরসূরী ও সুযোগ্য সন্তান হযরতজী মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)। বাপ বেটা উভয়ের কবর শরীফ দিল্লীর নেজামুদ্দিন আওলিয়ার তাবলীগি মারকাজ সংলগ্ন স্থানেই অবস্থিত।

[এ ছয়জন বুজুর্গের জীবনী যে সমস্ত গ্রন্থরাজি হতে সংগৃহিত ঃ শানদারমাজী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, বীস বড়ে মুসলমান, মওজে কাউছার, তারীখে দাওয়াত ও আজীমত, মুকাদ্দামায়ে আকাবা ইত্যাদি।]

সুন্নাত ওয়াল জামাতের ছদ্মাবরণে বেরেলভী রেজভী ফিতনার ইতিহাস

নবুওয়াত ও খেলাফতে রাশেদার যুগের পর থেকেই উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা, ফেরকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। যদ্দ্বারা মুসলিম ঐক্য খান খান হয়ে যায়। তন্মধ্যে বিশাল অখণ্ড ভারতে যা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনবহুল দেশ আহমদ রেজা খান বেরেলভীর সৃষ্ট তাকফীরি (কাফের ফতুয়া দেয়ার) ফিতনা সবচেয়ে বড় মারাত্মক মনে হয়।

১৩১১ হিজরী সনে কানপুর শহরে মাওলানা মোহাম্মদ আলী মঙ্গীরি (রহঃ)এর আহবানে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বী উচ্চ পর্যায়ের ওলামাগণের এক বিশাল সমাবেশ ঘটে। উক্ত সমাবেশে মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে নদওয়াতুল ওলামা নামে এক আনজুমান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়।

আমাদের জানামতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটাই সর্ববৃহৎ মুসলিম সংগঠন যেখানে সর্বমতের ওলামা মাশায়েখগণকে এক প্লাটফর্মে আনার চেষ্টা করা হয়। আহমদ রেজা খান বেরেলভীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কোন কথায় তিনি নারাজ হয়ে সভা সমাপ্তির পূর্বেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। এবং নদওয়াতুল ওলামা (বর্তমান নদওয়া নয়) নামীয় ঐ সংগঠনটির বিরুদ্ধে পোষ্টার বিজ্ঞাপন এবং শতের মত বই পুস্তক লিখে বিরাট হাঙ্গামার সৃষ্টি করেন এবং ঐ সংগঠনের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তি ও আলেমগণকে কাফের ফতুয়া দিয়ে সংগঠনটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেন এবং নতুনভাবে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে নতুন এক ফেরকার সৃষ্টি করেন যা বেরেলভী, রেজা খানী ইত্যাদি নামে পরিচিত। সে উক্ত সংগঠনের লোকদের কাফের ফতুয়া দেয়ার সবচেয়ে বড় দলীল এটাই দিয়েছে যে, সংগঠনটি ওয়াহাবী, ও গায়রে মুকাল্লিদ (চার মাযহাব অমান্যকারী)দেরকেও সাথে নিয়েছে। এবং সংগঠনটির ওলামাগণ শাহ ইসমাঈল হোসেন দেহলভী (রহঃ)কে নিজেদের নেতা মনে করেন। অথচ তার মতে ৭০টি বা তার চেয়েও বেশী কারণে তিনি কাফের। (নাউযুবিল্লাহ)

এ আহমদ রেজা খান 'নদওয়াতুল ওলামা' সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা দিয়ে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের ওলামাগণ থেকেও তাঁদের বিরুদ্ধে কুফুরী ফতুয়া সংগ্রহ করে 'ফাতাওয়াল হারামাইন বিরাজফি নাদওয়াতুল মাইন' নাম দিয়ে ছাপিয়ে হাজার হাজার কপি প্রচার করে। 'নদওয়াতুল উলামা' সংগঠনটিতে বহু বিজ্ঞ আলেম এবং কলমবাজ থাকলেও তাঁরা তার অপপ্রচারের দিকে কর্ণপাত করলেন না এবং তার মিথ্যা ফতুয়াবাজীর জবাব না দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকাকেই সঙ্গত মনে করেন। দীর্ঘ দশ বছর নদওয়ার বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজী করে তার ধারণা মতে যখন নদওয়া সংগঠনটি চুরমার হয়ে গেল, তখন সে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র উত্তর ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্রাসার আকাবির ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণের দিকে তার শেন দৃষ্টি তাক করে।

১৩২০ হিজরী সনে 'আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ' নামে একটি কিতাব লেখে তাতে সে সর্বপ্রথম দেওবন্দী জামাতের উচ্চ স্তরের আলেম ও বুজুর্গবর্গ (১) সর্ব জনাব মাওলানা কাসেম নানুতী (রহঃ), (২) মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ), (৩) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) প্রমুখগণকে খাঁটি কাফের বলে এবং আরো বলে, যে ব্যক্তি এঁদের কুফুরীতে সন্দেহ প্রকাশ করবে সেও খাঁটি কাফের ও জাহান্নামী। আহমদ রেজার এ ফতুয়া সম্বন্ধে অনেক বছর ওলামায়ে দেওবন্দ অবগতও ছিলেন না।

অতঃপর সম্ভবতঃ ১৩২৭ হিজরীতে দেওবন্দের যুবক ফাজেল মাওলানা সাইয়েদ মুর্তাজা হাসান চাঁদপুরী (রহঃ) উক্ত ফতুয়াটি সম্বন্ধে অবগত হন এবং কুফুরী ফতুয়া সম্বলিত রেজার কিতাবটিও কোনভাবে সংগ্রহ করে তাঁর ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)এর নিকট উক্ত ফতুয়ার জবাব লিখার অনুমতি চাইলে হযরত মাওলানা তাঁকে নিয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেওবন্দী জামাতের মুরুব্বী হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বলেন—

"ভাই! তুমি আহমদ রেজার কত জবাব দিবে, সে তো নিত্য নতুন অভিযোগ তুলে কিতাবের পর কিতাব, লিফলেটের পর লিফলেট

ছাপাতে থাকবে। তার তো কাজই এটা। নদওয়া ওয়ালাদের সাথে সে যা করেছে তাতো সম্মুখেই আছে। তাই আমার রায় হল তার জবাব না দিয়ে নিজের কাছে লিপ্ত থাকা এবং আখেরাতের ফিকির করা।"

তখন হযরত শায়খুল হিন্দের পরামর্শে আহমদ রেজার ভ্রান্ত ও মিথ্যা অভিযোগগুলোর জবাব না দেয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়। অবশ্য তখন আহমদ রেজার উক্ত ফিতনার ভারতে ব্যাপকভাবে কোন আছর পড়েনি। আর ফতুয়াটি আরবী ভাষায় হওয়াতে উহার বিশেষ চর্চাও হয়নি।

তাই সম্ভবত দেওবন্দী ওলামাগণ সম্বন্ধে তার কুফুরী ফতুয়াটি ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সে ১৩২৩ হিজরীর শেষের দিকে বহু কষ্ট ও অর্থের বিনিময়ে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ গিয়ে অত্যন্ত চতুরতা ও ধোকাবাজির মাধ্যমে বিশিষ্ট ওলামায়ে দেওবন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তাঁদের বিরুদ্ধেও ওলামায়ে হারামাইন হতে কুফুরী ফতুয়া সংগ্রহ করে 'হুছামুল হারামাইন' নাম দিয়ে উর্দু অনুবাদ সহ তা ছাপিয়ে ১৩২৫ অথবা ১৩২৬ হিজরীতে ব্যাপক প্রচার করে।

আহমদ রেজার এ জাল ফতুয়ায় আরবীয় ওলামাদের দস্তখত দেখে ভারতের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এর বিরাট প্রভাব পড়ে এবং শুরু হয়ে যায় বেরেলভী দেওবন্দী লড়াই। সৃষ্টি হয়ে যায় সমগ্র অখণ্ড ভারতব্যাপী এক অশান্ত পরিস্থিতি। ফলে ভাটা পড়ে যায় আযাদী আন্দোলনের জোয়ার। আর এর থেকে ফায়দা লুটতে থাকে মুসলমানদের চির শত্রু ইংরেজ বেনিয়ারা।

এহেন পরিস্থিতিতে এ ফিতনার মুকাবিলা না করে চুপ থাকা কিছুতেই সমীচীন ছিল না এবং মুসলমানদেরকে এ ফিতনা থেকে বাঁচানো ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কলম হাতে নিলেন ওলামায়ে দেওবন্দ এবং (১) আছছাহাবুল মিদরার (২) আল খাতমু আলা লিছানিল খাছমি (৩) বাছতুল বানান (৪) কাতয়ুল ওয়াতীন (৫) আশ শেহাবুছ ছাকিব ইত্যাদি কিতাব লিখে প্রমাণ করলেন যে, আহমদ রেজা কর্তৃক ওলামায়ে দেওবন্দীদের উপর আরোপিত কুফুরী অভিযোগগুলো সম্পূর্ণই মিথ্যা ও অপবাদ।

অন্যদিকে আহমদ রেজা যখন আরব হতে ভারতে ফিরে আসে, তখন হারামাইন শরীফাইনের কোন কোন আলেম আহমদ রেজার ধোকাবাজী ও জাল ফতুয়া সম্বন্ধে অবগত হন। এবং তাঁরা তার ঐ জাল ফতুয়াটি উদঘাটন জরুরী মনে করেন। সুতরাং তারা আহমদ রেজা কর্তৃক ওলামায়ে দেওবন্দীদের উপর আরোপিত লিখিত অলিখিত সমস্ত অভিযোগ ও আকায়েদগুলো উল্লেখ করে ওলামায়ে দেওবন্দীদের নিকট উহার জবাব তলব করেন। ওলামায়ে দেওবন্দীর পক্ষ হতে মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) সমস্ত প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব উল্লেখ করেন। জবাবগুলো হারামাইন শরীফাইনে পৌছলে হারামাইনের ওলামায়ে কেরাম তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং লিখেন যে, দেওবন্দ থেকে দেওয়া এ আকীদাগুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এ আকীদা হতে একটি আকীদাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেলাফ নয়। ঐ ফতুয়ায় ৬৯ জন আরবীয় ওলামাগণের দস্তখত থাকে।

পবিত্র মক্কা মদীনার ওলামায়ে কেরামের মতে দেওবন্দীরা যে কাফের নয় বরং তারা খাঁটি সুন্নী মুসলমান, এ সম্পর্কীয় ফতুয়াটি উর্দু অনুবাদ সহ ঐ যুগেই 'আত তাছদীকাত লি দাফয়িত তালবীছাত', (আল মোহান্নেদ আলাল মুফান্নেদ) নামে ছাপিয়ে প্রচার করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ এরপর 'হোছামুল হারামাইনের' কারণে সৃষ্ট ফেতনা অনেক কমে যায়। অতঃপর সে যুগেই মাওলানা মুর্তাজা হাছান (রহঃ) এবং মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ (রহঃ) উক্ত হোসামূল হারামাইনের জবাবে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব লিখে রেজা সাহেবের জাল ফতুয়া ও তার ধোকাবাজীর সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটন করেন।

এরপরও আহমদ রেজাদের ফতুয়াবাজী বন্ধ হয়নি বটে কিন্তু তখন ফতুয়াটি নিস্প্রাণ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯১৪ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো ইউরোপীয় শক্তির হস্তগত হয়ে যায়, ইসলামী খেলাফত হুমকীর সম্মুখীন হয়। হিন্দুস্তানে খেলাফত আন্দোলনের ডাক উঠে, এ দেশের শতকরা ৯০ জন আলেম সমাজও তাঁদের অভ্যন্তরীন মত পার্থক্য প্রত্যাখ্যান করে পবিত্র স্থানসমূহ

এবং খেলাফতে ইসলামীয়ার হেফাজতের লক্ষ্যে এক প্লাটফর্মে জমা হয়ে যান।

এমনকি তাকফীরি ফেতনায় আহমদ রেজার শরীক দল 'ওলামায়ে বদায়ুন'গণও খেলাফত আন্দোলনের কাফেলায় যোগ দেন। কিন্তু আহমদ রেজার দল তাতে যোগ তো দেয়নি বরং তার শরীক দল বদায়ুনীদেরকেও তারা 'ফেরকায়ে গান্দুইয়াহ' (গান্ধীর দল) আখ্যা দেয় এবং তাদেরও মাওলানা আব্দুল বারী ফেরেঙ্গী মহল্লী লাখনুবীর বিরুদ্ধে পোষ্টারিং যুদ্ধ শুরু করে দেয়।

খেলাফত আন্দোলনের যুগে ১৩৪০ হিঃ সনে আহমদ রেজার মৃত্যু হয়ে যায়। কিন্তু সে তার মৃত্যুর পর একটি বিশেষ দল রেখে যায়, যারা তার অযথা কুফুরী ফতুয়ার ব্যবসা চালু রাখে। তার রেখে যাওয়া দলটি মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সব দলকেই কাফের ফতুয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে আরম্ভ করে মুসলিম লীগ, আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা শিবলী নোমানী, মাওলানা কবি আলতাফ হোসেন হা-লী, ডঃ ইকবাল প্রমুখ তাদের কুফুরী ফতুয়ার আঘাত হতে রক্ষা পাননি। রেজভী ফেরকার লিখিত 'তাজা-নুবু আহলিছ ছুন্নাহ' কিতাবে উক্ত কুফুরী ফতুয়াগুলো উল্লেখ আছে।

রেজাখানিয়ত কা তানকীদি জায়েযাহ, মাকামেউল হাদীদ, বেরেলভী ফিতনা কা নয়া রূপ ইত্যাদি।

কুফুরী ফতুয়ার উৎস কোথায়

১। আহমদ রেজা ও তার ভক্ত কর্তৃক ইংরেজ বিদ্রোহী সমস্ত গ্রুপ, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে ভারতবর্ষে সত্যিকারার্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধারক বাহক ভারত মুরুব্বী শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভীর খান্দানের ছিলছিলাভুক্ত ও তাঁদের অন্যতম উত্তরসূরী হাযারাতে ওলামায়ে দেওবন্দকে কুফুরী ফতুয়া দেওয়ার উৎস, তৎকালিন ইংরেজ বৃটিশ সরকার। কেননা অখণ্ড ভারতবর্ষ হতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

১৮৫৭ ইংরেজীতে শ্যামলী ইত্যাদির অস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ঐতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাটি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের দুর্গে পরিণত হয়। ওলামায়ে দেওবন্দ ভারতবর্ষ ও তার বাইরে সব দেশেই এ বৃটিশ সরকারের বড় যম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। বৃটিশ দেখলো যে, বিদ্রোহী ওলামায়ে দেওবন্দীদের উত্থানকে রুখার একমাত্র উপায় হলো ওলামায়ে দেওবন্দীগণ হতে সাধারণ মুসলমানদের আস্থা নষ্ট করে দেয়া। তাই তারা এ হীন লক্ষ্যে ইসলাম ও ওলামাদের কলংক এমন কিছু মৌলবী নামধারী লোককে খরীদ করা শুরু করে যারা তাদের ইঙ্গিতে বিদ্রোহী সমস্ত পার্টি ও ওলামায়ে হক্কানীকে কাফের ফতুয়া দিতে থাকে। মিথ্যা মিথ্যা কুফুরী ফতুয়ার এ কাজ বৃটিশের স্বার্থে আহমদ রেজা খান ব্রেলভী থেকে যেভাবে সমাধা হয়েছে অন্য কারো থেকে এরূপ সম্ভব হয়নি। যখন ভারতে মুসলমানদের রক্ত দিয়ে ইংরেজরা গোছল করতেছিলো, মুসলমানদের সমস্ত স্মৃতি মিটিয়ে তাদের খৃষ্টান বানানোর হীন পরিকল্পনা চলছিলো, ভারতকে 'দারুল হরব' বা শত্রুদেশ ফতুয়া দিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দ কাফনের কাপড় পরে জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ, পায়ে তাঁদের লোহার জিঞ্জির, জেলের উঁচু দেওয়াল তাদের কদমে চুমু খাচ্ছিল, ঠিক তেমনি সময়ে ভারতের সমস্ত ইংরেজ বিরোধী মুসলিম দলগুলোকে বিশেষভাবে খাঁটি হানাফী সুন্নি আকাবেরে ওলামায়ে দেওবন্দীগণকে কাফের, মুর্তাদ, ওয়াহাবী ইত্যাদি ঘৃণিত শব্দ দিয়ে আখ্যায়িত করা এবং বিদ্রোহী আন্দোলনের জোয়ারের শুভ মুহূর্তে 'এ'লামুল এ'লাম বিয়ান্না হিন্দুস্তানা দারুল ইসলাম' কিতাব লিখে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে ইসলামী রাষ্ট্র ফতুয়া দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিদ্রোহ করা হারাম ঘোষণা দেওয়া এবং ইংরেজ বিরোধিতায় তার কোন জেল নির্যাতন ভোগ করার ইতিহাস না থাকা ইত্যাদি তার প্রত্যেক কাজই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সে একজন ইংরেজদের খরিদা গোলাম ও বিশ্বস্ত সুচতুর দালাল।

হাদিস, তাফসীর, সীরাতুন্নবী, সীরাতে ছাহাবী, সীরাতে আওলিয়া, ফেকাহ, বদ রূসুম, বেদআত, কাদিয়ানী, শিয়া, খ্রীষ্টান, আরিয়া সমাজ ইত্যাদি বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে এবং ইসলামী আন্দোলন, সামাজিকতা, জনহীতকর কাজের ব্যাপারে তার ও তার দলের তেমন

কোন লেখনী দেখা যায় না। তার ও তার দলের লিখনী প্রায় দেওবন্দী ও বৃটিশ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবং যে সমস্ত ব্যাপারে তাদের আর্থিক স্বার্থ আছে সে সম্বন্ধে। যেমন নজর, নিয়াজ, ওরস, মিলাদ, ফাতেহা, সালাম, কেয়াম, হাদিয়া, তোহফা, কবর পাকা, কবরে চাদর দেওয়া ইত্যাদি। ইহাও তাদের অসাধু হওয়ার ইংগিত বহন করে।

বৃটিশের মদদপুষ্ট বেরেলভীদের আকীদা ঃ

এ বেরেলভী গ্রুপের আকিদা ও আমল ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু বৌদ্ধ, ইত্যাদি অমুসলিম এবং ভ্রান্ত শিয়া বেদআতীদের সাথে মিল রাখে। ইহুদীরা হযরত ওজাইব (আঃ)কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহর বেটা, খৃষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)কে অতিরঞ্জিত করে আল্লাহর বেটা, আল্লাহর মানবিক রূপ, আল্লাহর তিন অংশের এক অংশ (ত্রিত্ববাদ) দাবী করেছে, হিন্দুরা তাদের ভক্ত রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে আল্লাহর আকার বা মানবিয় রূপ মনে করে। —আল কোরআন

বৌদ্ধরা গৌতম বৌদ্ধকে আল্লাহর মানবিক প্রকাশ বিশ্বাস করে, হিন্দুরা কালিজীর না–রা বা শ্লোগান লাগায়। —দেওবন্দ ছে বেরেলী তক

ইহুদী খৃষ্টানদের পোপ পাদ্রীরা এবং হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ও গুরুরা তাদের অন্ধ অনুসারীদেরকে ধর্ম বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়ে তাদের বোকা বানিয়ে শোষণ করে এবং তাদের পকেট খালি করে। ইত্যাদি।—কোরআন ও তারীখ

আবার খৃষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)কে সর্বস্থানে হাজির নাজির মনে করে।—কেথুলিক–কিতাবে ইবাদত

শিয়ারা তাদের ইমামগণকে (ক) আলেমুল গায়েব (খ) এবং তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির উপর অবগত মনে করে। (গ) না' রায়ে হায়দারী ইয়া আলীর ধ্বনি দেয়। (ঘ) তাবারবা বা সাহাবাগণের বদনাম করে। (ঙ) তকিয়া বা প্রয়োজনে সত্যকে গোপন করে। ইত্যাদি।—রেজাখানিয়াত কা তানকীদি জায়েজা, ইরানী ইনকিলাব আওর ইমাম খোমিনী ইত্যাদি।

তদ্রুপ আহমদ রেজা ও তার দল বেরেলভীরা (১) আল্লাহর হাবীব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর মানবীয় রূপ মনে করে।—বাহারে শরীয়ত ২২ পৃষ্ঠায় তারা এই কবিতাটি সব সময় পড়ে 'ওহী–জুমুস্তাবী আরশ পর থা খোদা হো কর, উতার পড়াথা মদীনা মে–মুস্তাফা হো কর'

অর্থাৎ যিনি খোদা হয়ে আরশের উপর আসীন ছিলেন তিনিই মুস্তাফা হয়ে মদিনায় নেমে এলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর যাবতীয় কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিনিধি মনে করে।

—বাহারে শরীয়ত ১ম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা–আমজাদ আলী রচিত।

(৩) তারা 'না রায়ে রেসালত ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে ধ্বনি দেয় যা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগ থেকে কোন যুগেই চালু ছিলো না। বরং 'ইয়া গাওছাল আজমের' ধ্বনিও দিয়ে থাকে।

(৪) তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওলীগণকে আলেমুল গাইব এবং তাঁকে সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত মনে করে।

(৫) তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ধোকা দিয়ে থাকে।—তারীখ

(৬) তারা তাবারবা বা ছাহাবীদের বদনাম করে। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর শানে গুস্তাখী করেছে।—হাদায়েকে বখশীশ

ছাহাবীয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান কারী (রাঃ)কে কাফের ইত্যাদি বলেছে। (নাউযুবিল্লাহ।)

—মালফুজাত ২য় খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে রেজা খানিয়াত কা তানকাদি জায়েযা।

(৭) তারা সত্যকে নিজের মতলব হাসিলের জন্য গোপন করে। তাই তো দেওবন্দী ও নদওয়া লাইনের মাদ্রাসায় নিজেকে দেওবন্দী হওয়ার শপথ করে পড়ালেখা করে অথচ জ্ঞান অর্জন করে যাওয়ার পর কুকুরের লেজের মত বাঁকা ও রেজবী হয়ে যায়।—তারীখ ইত্যাদি

সুন্নী জামাতের সংজ্ঞা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় বনী ইসরাইল ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। এদের সবাই জাহান্নামী হবে এক ফেরকা ব্যতীত। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ (নাজী) ফেরকাটা কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তরীকার উপর আমি ও আমার ছাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত সে তরীকার উপর যারা চলে তারাই। (ঐ নাজী, জান্নাতী

ফেরকা।) তিরমিজি ২য়খণ্ড ৮৯ পৃঃ মেশকাত ১ম খণ্ড ৩০ পৃঃ।)

এ হাদিস এবং এর সম অর্থের অসংখ্য হাদিসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ সংজ্ঞা বের করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা হলো সুন্নাত আর সাহাবাগণ হলেন জামায়াত। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতী তরীকা এবং তার আদর্শের প্রতিচ্ছবি ছাহাবাগণের তরীকা মত নিজেদের জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠন করায় বিশ্বাসী তাঁদেরই নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা সুন্নি জামায়াত। পৃথিবীতে প্রচলিত চার মাযহাবের প্রকৃত অনুসারীরা এ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাত ওয়াল জামাতের এ ব্যাখ্যা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ফতুয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠাতেও উল্লেখ আছে।—রেজা খানিয়াত কা তানকীদি জায়েজাহ

বিদয়াতের সংজ্ঞা ঃ

বিদয়াতের আভিধানিক অর্থ প্রত্যেক নতুন বস্তু বা অপূর্ব সৃজন। এ আভিধানিক বিদআত পাঁচভাবে বিভক্ত। সংক্ষেপে দুই ভাগও বলা যায়— (১) হাছানাহ বা ভাল (২) ছাইয়েয়াহ বা খারাপ। অথবা প্রত্যেক ঐ সমস্ত নব আবিস্কৃত বস্তু যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সৃষ্টি হয়েছে তা ইবাদত জাতীয় বস্তুও হতে পারে আবার আদত বা অভ্যাস জাতীয়ও হতে পারে। ইহা পাঁচ প্রকার ঃ যথা—(১) ওয়াজিব (২) মুস্তাহাবাত (৩) হারাম (৪) মাকরূহ (৫) মুবাহ।

শরিয়াতের পরিভাষায় বিদয়াত বলা হয় কোন আকীদা বা আমল বা অবস্থা যা কোরআন সুন্নাহ, ইজমা ও শরয়ী কেয়াছের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রঃ)এর ভাষায় বিদআত বলা হয়, ঐ সমস্ত বস্তুকে যার ভিত্তি শরিয়াত থেকে সাব্যস্ত নয়। অর্থাৎ কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে যার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেইনের যুগে যার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এ (বর্জনীয়) কাজকে দ্বীনের কাজ মনে করে করা হয় বা (করণীয় কাজকে) ছাড়া হয়।—তালীমুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড

খুব সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, যে কাজ দ্বীনের অংশ নয় অথচ

দ্বীনের অংশ মনে করে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যেই করা হয় তাকেই বিদয়াত বলে।

শরিয়াতের পরিভাষায় এ বিদয়াত খারাপ, নিন্দনীয়, গুমরাহী। আরবী ভাষায় এ বিদআতকে বিদআতে ছায়্যেয়াহ বলা হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারের কোন প্রকার বিদয়াতে হাছানাহ্ (ভাল) নাই। তিন যুগের পর দুনিয়াবী কোন জিনিস নব আবিস্কার করা বা তা ব্যবহার করা যেমন ঃ প্লেন, মটর, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি সরাসরি সওয়াবের নিয়ত না থাকায় দ্বিতীয় প্রকারের নিষিদ্ধ বেদয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার তিন স্বর্ণ যুগের পর দ্বীনের প্রয়োজনে শরিয়াতের কোন দলিলের ভিত্তিতে কোন কিছু নব আবিস্কার করা এবং তার উপর আমল করাও বিদয়াত নহে। যেমন ঃ বর্তমানে দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মাবলী, কোরআন, হাদীস বুঝার জন্য আরবী ব্যাকরণ, বালাগাত, বা অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি আবিস্কার করা, আত্মশুদ্ধির জন্য খানকার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কোরআন, হাদিসের মূলনীতির আলোকে কেয়াছে শরয়ীর মাধ্যমে তিন যুগের পর সৃষ্ট ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ 'বেদয়াতে সায়্যেয়ার' অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইহার উপর দ্বীন বুঝা নির্ভর করে। এটাকে আরবীতে বিদআত লিদ দ্বীন বলে। বিদয়াত ফিদ দ্বীনই নিষিদ্ধ। লিদ দ্বীন নয়।

বিদয়াতে ছায়্যেয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

(১) প্রচলিত কিয়াম ও মিলাদ নিয়ে শরিয়তের সীমালংঘন করে বাড়াবাড়ি করা।

(২) মসজিদের ভিতর নামায শেষে সবাই মিলে নিত্য উচ্চস্বরে জিকির বা দরুদ, সালাম পাঠ করা।

(৩) ফরজ জামাতের পর নহে বরং সুন্নাত, নফলের পর ইমাম মুক্তাদী সবাই মিলে হাত উঠায়ে মোনাজাত করার প্রথা চালু করা।

(৪) ঢোল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ওরশ করা।

(৫) কবরে চেরাগ (বাতি) দেওয়া।

(৬) কবরের উপরে চাদর ইত্যাদি দেওয়া।

(৭) মুর্দাদের নামের উপর মান্নত বা মানষী করা।

(৮) মুর্দার নামের উপর মান্নতি বস্তুকে তবারক মনে করে বন্টন করা।

(৯) বাদ্যযন্ত্র দিয়ে কাওয়ালী গাওয়া।

(১০) আমভাবে মেয়েলোকদের কবর জিয়ারত করা।

(১১) কবর, মাজারের তাওয়াফ করা।

(১২) আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্মানের নিয়তে সিজদাহ করা। (১৩) কবরের উপর ঘর উঠানো।

(১৪) বুজর্গদের রুহের উপর ছওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের মাজারে খাওয়া পৌঁছানো জরুরী মনে করা।

(১৫) নেতা, বুজর্গদের রূহের উপর ছওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে তাদের কবরে, মাজারে পুষ্প অর্পণ করা।

(১৬) কবর চুমু খাওয়া।

(১৭) মুর্দা মারা গেলে তার মৃত্যুর ঠিক ৩য় বা ৭ম বা ১০ম বা ৪০তম দিন বা অন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে মুর্দার বাড়ীতে মুর্দারই অবন্টনকৃত মাল দিয়ে জিয়ারতের বা কুলখানীর রেওয়াজ করা। বিশেষ করে মুর্দার কোন ওয়ারিস নাবালিগ বা অনুপস্থিত থাকলে। তবে অনির্দিষ্ট দিনে করা নিজের মাল দিয়ে বিদয়াত ও গুনাহ নহে।

(১৮) কবরের উপর আযান দেওয়া। (১৯) জন্ম বার্ষিকী।

(২০) মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।

(২১) আযান, একামতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা।

(২২) আশুরার দিন তাজিয়া মিছিল বের করা ও (২৩) শোক করা।

(২৪) শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদিতে ছওয়াব মনে করে মসজিদে, মাজারে, রাস্তাঘাটে আলোকসজ্জা করা।

(২৫) ইমাম সাহেব ছালাম ফিরায়ে শুধু ডান দিকে হয়েই মুকতাদীর দিকে মুখ ফেরানোর অভ্যাস করা।

(২৬) জানাজা নামাযের পর পরই হাত উঠিয়ে একত্রে দোয়া করা ইত্যাদি।

—এখতেলাফে উম্মৎ আওর সীরাতে মুস্তাকীম, সুন্নাত আওর বিদয়াত ইত্যাদি।

বেদয়াতের কুফল ঃ

১। বিদায় হজ্জের দিন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। এর পরেও ধর্ম্মের মধ্যে বেদআত প্রবেশ করানো প্রকারান্তরে ইসলাম ধর্মের উপর এ অপবাদ দেয়া যে, ইসলাম মূলতঃ পরিপূর্ণ ধর্ম নয়। (নাউযুবিল্লাহ।)

২। শরীয়তের দলিল ছাড়া বেদআত সৃষ্টি করা প্রকারন্তরে নবুওয়াতের দাবী করা। কারণ, যে কাজের ছওয়াব আল্লাহপাক তাঁর রছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা জানালেন না, তা কি বেদআতীরা ওহীর মাধ্যমে পেলেন? (নাউযুবিল্লাহ্) সুতরাং বেদআতীরা গুমরাহ। তাদের কথা যে মেনে চলবে, সেও গুমরাহ।

৩। বেদআতীরা প্রকারন্তরে এ দাবী করছে যে, এ কাজ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তিন স্বর্ণ যুগের লোকদের জানা ছিল না কিংবা জানা ছিল কিন্তু বলেননি। (নাউযুবিল্লাহ)। তাই বেদআত করা মানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ অপবাদ দেয়া যে, তিনি তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেননি।

৪। বেদআতকারী বেদআতকে ভাল ও ছওয়াব অর্জনের একটি পথ মনে করে। সুতরাং সে তওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। তাই তার তওবা নসীব হয় না।

৫। বেদআতী ব্যক্তি ও জাতি অভিশপ্ত। তাদের কোন এবাদত কবুল হয় না।

৬। বেদআতের নহুছতও অন্ধকার, সুন্নাতের নূর হতে বঞ্চিত থাকবে।

৭। বেদআতীরা হাউজে কাওছারের সরবত হতে মাহরুম বা বঞ্চিত থাকবে।

৮। বেদআত দ্বীনের তাহরীফ বা পরিবর্তনের পথ। আর তাই আল্লাহ পাক তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণ দ্বীন পাঠিয়েছেন, বেদআতের মাধ্যমে তার আসল রূপরেখা বদলে যায়। ফলে কোনটি আসল ও কোনটি নকল তা বুঝা কঠিন হয়ে যায়।

৯। বেদআতীদের পেছনে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমি বা হারামের কাছাকাছি।

বেদআতের ক্ষতি সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ

১। রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে এমন কোন নতুন জিনিস ঢুকাবে যা ধর্মে নাই সে ও উহা মরদুদ।—বুখারী

২। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (ধর্মীয় ব্যাপারে) প্রত্যেক নতুন কাজ গুমরাহী। আর প্রত্যেক গুমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।—নাছায়ী ঃ ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ এবং রাহে সুন্নত ঃ ১১৮ পৃঃ

৩। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন বেদআতীকে সম্মান করলো, সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তাকে সাহায্য করলো। —মেশকাত, রাহে সুন্নাত ১২১ পৃঃ

৪। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যখন আমার উম্মতের মাঝে বেদআত সৃষ্টি হয় এবং আমার ছাহাবাগণকে মন্দ বলা হয়, তখন আলেমদের উপর জরুরী, সে যেন তার এলম প্রকাশ করে (উহাকে প্রতিরোধ করে।) আর যে আলেম ইহা করবে না তার উপর আল্লাহর ফেরেস্তাদের এবং সমস্ত মানুষের লা'নত বা অভিশম্পাত।

—এতেছাম ঃ ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ বাবে বেদআত কেয়া হ্যায়

সুন্নাত ও বেদআত সম্বন্ধে উল্লেখিত বর্ণনা কোরআন, হাদীস ও হানাফী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদিতে রয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে হযরত থানবী (রহঃ)এর এছলাহুর রুছুম ও বেহেশতী জেওর নামীয় কেতাব দু'টি দেখা যেতে পারে। ইত্যাদি।

রেজাখানীদের নিকট সুন্নীর সংজ্ঞা ঃ

রেজাখানীদের আকায়েদ ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিয়া ভ্রান্তদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ আহমদ রেজা ও তার দল রেজাখানী বেরেলভীরা শুধু তাদেরকেই সুন্নী বলে মনে করে যারা উল্লেখিত বেদআতী ভ্রান্ত আকিদাগুলো বিশ্বাস করে। তারা সুন্নতের খাঁটি অনুসারী, নিখুঁত তৌহিদের পতাকাবাহী ওলামায়ে দেওবন্দকে কাফের, ওহাবী ইত্যাদি এবং ভারত স্বাধীনতার স্বপক্ষের সমস্ত দলকে অমুসলিম, মোরতাদ মনে করে। এক কথায় তাদের আকায়েদে যারা বিশ্বাসী নয় এমন দল তাদের নিকট ভ্রান্ত, কাফের ও ওয়াহাবী। আর একমাত্র মুসলিম ও সুন্নী বলতে

তাদেরকেই বুঝায়। (নাউযুবিল্লাহ)।

১। রেজাখানীদের মাদ্রাসা দারুল উলুম আশরাফিয়া মোবারকপুরের দস্তুরে (গঠনতন্ত্রে) আছাছিতে সুন্নী হওয়ার মাপকাঠি ইহাই লেখা হয়েছে যে, "কিতাবে মুস্তাতাব 'হুছামুল হারামাইন' মুছান্নাফায়ে আ'লা হযরত ফাজেলে বেরেলভীকো হরফ–ব–হরফ মানতাহু।" অর্থাৎ আমি (সুন্নী হবার জন্য) আহমদ রেজার 'হুছামুল হারামাইন' কিতাব অক্ষরে অক্ষরে মানি।—দস্তরে আছাছী দারুল উলুম আশরাফিয়া মুবারকপুর, ৩ পৃঃ

অথচ এই কিতাবেই আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দকে অপবাদমূলক কাফের ফতোয়া দেয়া আছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

২। রেজাখানী আকীদায় বিশ্বাসী আলেম মুস্তাক আহমদ নেজামী এর লিখিত 'অল ইন্ডিয়া সুন্নি তাবলীগ জামায়াত আল মা'রুফ–বে–এছলাহী জামায়াত' কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "সুন্নীর অর্থ ঐ দল যারা হযরত ছাইয়েদেনা ইমাম আহমদ রেজা (রাঃ) এবং ফতুয়ায়ে 'হুছামুল হারামাইন' এর সাথে ষোল আনা একমত হয়ে কার্যত তার সহযোগিতা করে।"

৩। মৃত্যুর দু'ঘন্টা পূর্বে আহমদ রেজা তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে অসিয়তনামা লেখান, তার মধ্যে একটি অসিয়ত এই ছিল যে, যথাসম্ভব শরীয়তের ইত্তেবা ছাড়বে না এবং আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাব থেকে বুঝা যায়, তার উপরে কঠোরভাবে কায়েম থাকা প্রত্যেক ফরজ হতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

—অছায়া শরীফ ১২ পৃঃ,রেজা খানিয়ত কা তানকীদি জায়েযাহ ১১৬–১১৯ পৃঃ

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল শরীয়ত সম্পর্কে তিনি অতি হালকা শব্দ যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে তার মস্তিস্কপ্রসূত বাতিল ও বেদআতী আকীদাগুলো মানার জন্য কড়া শব্দ কঠোরভাবে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। অথচ তার কিতাবগুলো খাঁটি সুন্নত বিরুধী, শেরক বেদআতে ভরপুর এবং হক্কানী, প্রকৃত সুন্নী ওলামা ও খাঁটি মুসলমানগণ সম্বন্ধে কুফুরী, ওহাবী ইত্যাকার ভ্রান্ত ফতোয়ায় সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

আজহারুল হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ইতিহাস

হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে ভারতবর্ষে আরবী ইলম (জ্ঞান)সমূহের প্রবেশ ঘটে। সর্বপ্রথম 'মুলতান' ইলমের শহর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এরপর গজনভী বাদশাহদের যুগে লাহোর ইলমের মারকাজে পরিণত হয়। অতঃপর হিজরীর সপ্তম শতাব্দীতে দিল্লী শহর ইলমের প্রাণকেন্দ্র সাব্যস্ত হয়। পরবর্তীতে এ দিল্লীর উছিলায় জৌনপুরেও ইলমের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আবার জৌনপুরের জ্ঞান রৌশনীতে লাখনুও প্রজ্জ্বলিত হয়। লাখনুতে দ্বীনি ইলমের আলো এমন প্রখরে চমকে উঠলো যা পূর্ব ভারতের প্রত্যেক দেশ যেমন বলগেরাম, ছন্দীলাহ, গুপামি ও খায়েরাবাদ, বিহার, বাঙাল ইত্যাদি দেশকে ইলমের জ্যোতি দিয়ে চমকিয়ে দেয়। যে কারণে বাদশাহ শাহজাহান একসময় গর্ব করে বলছিলেন, "পূর্ব ভারত আমাদের সিরাজনগর।" ইসলামী ইলম ও ফনের কেন্দ্রভূমি দিল্লী শহরে দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে ইলম পিপাসীগণ তাদের পিপাসা নিবারণের জন্যে আসতো।

মুগল আমলের শেষের দিকে এ দিল্লী হতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১১৪ হিঃ–১১৭৬ হিঃ মুতাবেক ১৭৩২–১৭৬২ ইং)এর মত যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আবির্ভূত হন, যার ইলমি ফয়েজে এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে হিন্দুস্থানে দ্বীনি ইলমসমূহ বিশেষ করে তাফসীর ও হাদিছ বিষয়ের যতগুলো ছিলছিলা (সূত্র) মওজুদ আছে সবগুলোর গোড়া হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ)এরই ছিলছিলা। এই উপমহাদেশে ইলমে দ্বীনের যা কিছু রুচি ও আগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে তা এই ওয়ালিউল্লাহ খান্দানেরই ফয়েজ ও বরকত।

১৮৫৭ সালে থানাভবনের খানকায়ে এমদাদিয়া হতে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)

মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) মাওলানা থানভী (রহঃ) প্রমুখ ওলামায়ে দেওবন্দীগণ কর্তৃক পরিচালিত বৃটিশ বিরোধী জেহাদে ঐতিহাসিক শ্যামলীর ময়দানে মুসলমানদের নির্মম পরাজয়ের পর দিল্লীর মুসলিম শাসনও ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যায়। সাথে সাথে ছয়শত বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত দিল্লীর ইলমী কেন্দ্রটির আলোও নিভে যায়।

১৮৫৭ সলে আজাদী আন্দোলনে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে মুসলিমগণ বিশেষভাবে ওলামা সম্প্রদায়ই ইংরেজদের প্রধান দুশমন ও তাদের পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হন। তারা অবর্ণনীয় খুন, শূলী, জেল, দেশান্তর ইত্যাদি জুলুমের সাথে সাথে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসমূহ—মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াকফ সম্পত্তি, তাহজিব, তামাদ্দুন, ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞান ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য যেকোন প্রকারের প্রচেষ্টা কম করেনি। এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে বিশেষ করে মুসলমানগণকে মুর্তাদ (ধর্মচ্যুত) করে খ্রীষ্টান বানাবার জন্য ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার আমদানী করে সমস্ত ভারতে প্রাইমারী থেকে আরম্ভ করে উচ্চ পর্যায়ের অসংখ্য ইংরেজী শিক্ষাগার তৈরী করে এবং ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার কোন মিশ্রণও রাখেনি। সারা দেশের নাগারিককে ধর্ম শিক্ষাবিহীন শুধু ইংরেজী শিক্ষার জন্য উৎসাহ দান ও চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং ইংরেজী শিক্ষার উপরই দুনিয়াবী পদমর্যাদা ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা রাখা হয়।

ধর্ম শিক্ষাবিহীন শুধু ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য তারা হিন্দু মুসলিম হতে অনেক বিশ্বস্ত সেবাদাসদেরকেও কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপসংস্কৃতির ধারক–বাহক এ ধর্মহীন ইংরেজী শিক্ষার সাথে সাথে তারা অসংখ্য মিশন স্কুল, মিশন হাসপাতাল খুলে এবং ইউরোপ থেকে আনীত অগণিত পাদ্রীর মাধ্যমে ইসলামের কুৎসা ও খৃষ্টান ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করে ভারতীয়দেরকে খৃষ্টান বানাবার অপকৌশল ইখতিয়ার করে। আবার মুসলমানদের ঈমান আকায়েদ ও একতা নষ্ট করার জন্য সরকারী নবী ও পীরের সৃষ্টিও করা হয়।

এ সময়টি ছিল ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুরাবস্থা। যখন মুসলিম জাতির অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। ধর্মীয় ওলামা ও শিক্ষালয় প্রায় খতম। ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম কৃপায় তাঁর কিছু মকবুল বান্দাগণকে উত্তর ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দ নামক ছোট্ট একটি শহরে ১২৮৩ হিঃ মুতাবেক ১৮৬৬ ইং বৃহস্পতিবারে চাত্তা মসজিদের বারান্দায় একটি আনার গাছের ছায়ার নীচে মাহমুদ নামক এক ওস্তাদ এবং মাহমুদ নামের এক ছাত্রের মাধ্যমে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার খেয়াল জন্মায়ে দেন। যে মাদ্রাসাটি মুসলমানদের মৃতদেহে নতুন জীবন ফিরিয়ে আনে, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, নিরাশা দূর করে, ধর্মীয় জ্ঞানের পরিস্কার আলো দিয়ে এশিয়াকে তথা সারা বিশ্বকে আলোকিত করে, সর্বপ্রকারের বেদয়াত কুসংস্কার দূর করে ও বাতিল মতবাদগুলোকে মৃত্যুর দ্বারে পৌছিয়ে দেয়। মুসলমানদের বড় ও চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়া ও খৃষ্টানী শক্তির উত্থানকে নির্মূল করে মুসলমানদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনে। প্রতিকূল পরিবেশে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার পাহাড় সত্বেও বিজাতীয় সভ্যতার জোয়ারকে রুখে দিয়ে নিখুঁত ইসলামী সভ্যতা, নিরঙ্কুশ তৌহীদি আকায়েদ ও সুন্নাতে মুহাম্মাদীকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

এ দেওবন্দ মাদ্রাসা না হলে আজ অখণ্ড ভারতে খাঁটি মুসলমান ও নিখুঁত ইসলামের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। বরং ভারতের অবস্থা স্পেনের মতই হতো। সুতরাং এ কথা বলা মোটেও অবাস্তব হবে না যে, দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা একটি আন্দোলন ও জেহাদ এবং নিরব মুজাদ্দেদ। ইহা শুধু একটি ধর্মীয় পাঠশালাই নয়।

—তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ ইত্যাদি

দেওবন্দ মাদ্রাসার ছয় জন প্রাথমিক বুজুর্গ ঃ

যাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ও উহার পরিচালনায় শুরু থেকে শরীক ছিলেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব ১। মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর।

২। মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহঃ)। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।

৩। মাওলানা রফিউদ্দীন (রহঃ) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর।

৪। মাওলানা জুলফিকার আলী (রহঃ)। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ।

৫। হাজী সৈয়দ আবেদ শাহ্ (রহঃ)। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ।

৬। মাওলানা ফজলুর রহমান ওছমানী (রহঃ)। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। —তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ

দেওবন্দ মাদ্রাসার আটটি উছুল বা কানুন ঃ

(১) মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের সব সময় যথাসাধ্য চাঁদা বাড়ানোর উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

(২) ছাত্র বাড়ানো এবং তাদের ফ্রি খানার ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য মাদ্রাসার হিতাকাঙ্খীদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

(৩) মাদ্রাসার নেজাম শুরা (পরামর্শ) ভিত্তিক হবে এবং উহার 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল' কার্যকরী কমিটি আহলে শুরার উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৪) শিক্ষক, ষ্টাফ ও কর্মকর্তাগণ এক দলীয় হতে হবে। অন্যথায় মতভেদ বিশৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কলুষিত হতে পারে।

(৫) পরামর্শের মাধ্যমে যে শিক্ষা নেছাব বা সিলেবাস নির্ধারিত হবে তা পরিপূর্ণ করতে হবে।

(৬) অস্থায়ী আমদানীকে উসিলা করে আল্লার উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে মাদ্রাসা চলবে এবং গায়েবী সাহায্য আসবে। আর যদি স্থায়ী কোন আমদানী বা গ্রান্টিযুক্ত কোন অনুদানের উপর নির্ভর করা হয় তাহলে মাদ্রাসার উন্নতি হবে না, আল্লাহর ভয়, আশা খতম হয়ে যাবে, গায়েবী এমদাদ বন্দ হয়ে যাবে এবং ধনসম্পদের লালসায় কর্মকর্তাদের মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে।

(৭) মাদ্রাসাটি বেসরকারী থাকবে। কারণ, রাষ্ট্রের প্রভাব ও দখল মাদ্রাসার জন্য খুব ক্ষতিকর হবে।

(৮) যথাসম্ভব মুখলেছ এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের চাঁদা বা অনুদান বেশী সংগ্রহ করতে হবে। যাদের দান হালালই হয়। এতে বরকত বেশী হবে এবং মাদ্রাসার মঙ্গলেরও বেশী আশা করা যায়।

মাদ্রাসার এ আটটি কানুনের মধ্যে একটি আন্দোলনের কর্মসূচীও নিহিত আছে—

(১) প্রথম কানুনে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণরায় সৃষ্টির ইঙ্গিত।

(২) দ্বিতীয় কানুনে স্বৈরাচার হটানোর জন্য ভারী এক সেনাদল তৈরীর ইঙ্গিত।

(৩) তৃতীয় কানুনে সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে গণমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত।

(৪) চতুর্থ কানুনে আজাদী আন্দোলনে এক প্লাটফর্ম থেকে অগ্রসর হওয়ার ঘোষণা।

(৫) পঞ্চম কানুনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ দায়িত্ববোধের শিক্ষা গ্রহণ করার ইঙ্গিত।

(৬) ষষ্ঠ কানুনে নবাবী প্রথা উচ্ছেদ, গরীব মজদুরদের সাহস বাড়ানো এবং 'আওয়ামী কনষ্টিটিউসন' এর দিকে ইশারা।

(৭) সপ্তম কানুনে অসহযোগ আন্দোলন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে নিদর্শন।

(৮) অষ্টম কানুনে আজাদী আন্দোলনের জন্য মুখলেছানা জজবার প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরাজয়ের পর মাওলানা নানুতবী (রহঃ) জেহাদের কৌশল বদলালেন মাত্র। এই দেওবন্দ মাদ্রাসার মাধ্যমে তিনি আগামী দিনের আন্দোলনের বৃক্ষ রোপন করলেন এবং এ মাদ্রাসাটিকে সেনা ছাউনিও বলা যেতে পারে। মাদ্রাসার আটটি কানুনকে গভীরভাবে দেখলেও তা বুঝা যায়। মনে হয়, মাওলানা নানুতবী শ্যামলীর প্রান্তরে, দাঁড়িয়ে এ আটটি কানুন বা শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

দেওবন্দী চিন্তাধারা এলহামী বা ঐশ্বরিক

দেওবন্দ মাদ্রাসা ও উহার চিন্তাধারা এলহামী, মনগড়া নয়। দারুল–উলুম দেওবন্দের ইলমী সনদ বা সূত্র হিন্দুস্তানের বড় মুরুব্বী শাহ ওলীউলাহ দেহলবী (রহঃ) পর্যন্ত পৌছে। আর তাঁর সনদ রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছে। কোরআন, হাদীস, তাওহীদ ও রিসালাত বা খাঁটি ইসলামী শিক্ষাকে যুগের যুক্তিবাদীগণের নিকট যুক্তির মাধ্যমে পেশ করে তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার ব্যাপারে শাহ সাহেবের একটা বিশেষ রং বা পদ্ধতি ছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ এলহামী বা খোদাপ্রদত্ত। শাহ সাহেব (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর যুক্তিগুলো তিনি প্রায় কাশফী ও যাওকী রং এ পেশ করেছেন। ফলে তাঁর যুক্তিগুলোতে ঐ সমস্ত যুক্তিবাদীরাই তৃপ্তি পেতেন যাঁরা কোরআন–হাদীসের বর্ণনাকে যে কোন পর্যায়ে মেনে কাশফ ও যাওকের কিছু গুরুত্ব দিতো এবং যাদের অন্তর হতে ঈমানের অনুভূতি একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি।

পরবর্তীতে বিজ্ঞানের প্রভাবযুক্ত যুক্তিবাদের যৌবনকালে প্রত্যেক থিওরী ও মতবাদ যে পর্যন্ত দৃশ্যাকারে বা চাক্ষুস প্রমাণিত না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তা যুক্তিবাদীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতো না। শুধু যুক্তির মাপকাঠিতে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল না। ইহা আদি ইহুদী, লেলিন, ষ্টালিন প্রমুখ বস্তুবাদীদেরও মতবাদ ছিল। যুক্তিবাদের এ যৌবনকালে ইসলামকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তির নিরীখে প্রমাণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন শাহ ওলীউল্লাহরই (রহঃ) চতুর্থ ইলমী পৃষ্ঠের এক হীরা হযরত শাহ আব্দুল গণি দেহলভী (রহঃ)। তাই একবার তিনি তাঁর এক সাগরীদ হাকীম নুরুদ্দিনকে বলেছিলেন, মিয়া নুরুদ্দিন! কেতাব তো খতম করে ফেলেছ এখন কিছু আল্লাহ আল্লাহ শিখ। অর্থাৎ বেশী বেশী জিকির ও সাধনার দ্বারা কলবের মধ্যে মারিফত হাসিল কর, আর মারিফতের দ্বারা অদৃশ্য বস্তু দৃশ্যাকার হয়ে যায়।

শাহ আব্দুল গণি সাহেবের এই জ্ঞান ও শিক্ষা শাহ ওলী উল্লাহ (রহঃ)এর এলহামী নূরেরই আছর বা ক্রিয়া ছিল, যারফলে এই যাওকা তরীকা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের নিকটই প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল, বে–দ্বীন ও

নাস্তিকদের মধ্যে নয়। তাই এ ধর্মহীন যুক্তিবাদী ব্যক্তিদেরকে বুঝানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল প্রথমতঃ সরাসরি কোরআন-হাদীসের সূত্র উল্লেখ না করে দ্বীনের বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক মূলনীতির দ্বারা দর্শন রূপে এবং বর্তমান যুগে প্রচলিত ইজমসমূহের অনুকরণে এমনভাবে তুলে ধরা, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, ইহা একটি স্বতন্ত্র ফালসাফা বা দর্শন এবং ইজম যা যুগোপযোগী জীবন বিধান। অতঃপর যখন যুক্তিবাদীরা দর্শন ও ইজমের কায়দায় পেশ করা দ্বীনকে যুগোপযোগী ইজম মনে করে কবুল করে নিবে তখনই তাদের সম্মুখে এই ইজমের আসল রূপ উন্মোচন করে বলা হবে যে, এই ইজমই হচ্ছে ইসলাম ও ধর্ম যার নামটি শোনাও তোমাদের অরুচি ছিল। অতঃপর তারা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করে নিবে।

মোটকথা, ধর্মকে ধর্মের নাম দিয়ে নয় বরং বিজ্ঞান ফালসাফা সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নামের ছদ্মবরণে, ইজমের ছুরতে পেশ করে পরবর্তীতে যদি বলা হয়, ইহাই ইসলাম, ইহাই ধর্ম, তখন কোন বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ধর্মের নাম শুনে নাক ছিটকাবে না, বরং ধর্মকেই সবাই পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসাবে মেনে নেবে। হাঁ, উক্ত নিয়মে ইসলাম বা কোরআন-হাদীসকে পেশ না করে শুধু ধর্ম শব্দ দিয়ে যখন পেশ করা হয় তখন যুগোপযোগী ইসলামকে শুধু ধর্ম নামের কারণে আধুনিক যুগের লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে বসে।

কাজেই যুগের প্রয়োজনে ইজমের কায়দায় ইসলামকে যুক্তিবাদীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য শাহ ওলীউল্লাহর (রহঃ) পঞ্চম খান্দানের এলমী উত্তরসূরী এক যোগ্য ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন। যাঁর নাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)। যিনি শাহ ওলী উল্লাহ (রহঃ), শাহ আব্দুল গণি (রহঃ), শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ) ও শাহ মোহাঃ এছহাক (রহঃ)এর জ্ঞানসমূহের সারাংশ এবং যিনি ঐতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইলহামে রব্বী বা ঐশ্বরিক ও খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে যুগের প্রয়োজনে প্রথমতঃ ধর্মের নাম দিয়ে নয় বরং একটি মজবুত দর্শন ও যুগোপযোগী মতবাদের ছুরতে পেশ করেন।

শেষের দিকে বলে দেন সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এ মানবিক বলিষ্ঠ জীবন-বিধানটির নামই হচ্ছে ইসলাম। তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ সাবলীল বর্ণনা পদ্ধতির গুণে একজন কট্টর বে-দ্বীন ও নাস্তিক পর্যন্ত ইসলামী নিয়ম-নীতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

শাহ ওলী উল্লাহ (রহঃ) ও শাহ আব্দুল গণি (রহঃ)এর ন্যায় এ পদ্ধতিতে ইসলামকে বুঝানোর রীতি গ্রহণ করা হযরত নানুতবী (রহঃ)এর মনগড়া ছিল না, বরং উহা ছিল সম্পূর্ণ এলমে লাদুনী এবং ইলহামে রব্বানীর উছিলায়। যা হযরত নানুতবী (রহঃ) তাঁর রচিত কিতাব মাছাবীহুত তারাবীহ, তাকরীরে দেলপেয়ীর ইত্যাদিতে উল্লেখ করেছেন। দেওবন্দী মতবাদ যা খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রবর্তক হলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) যিনি খান্দানে ওলী উল্লাহরই ইলমি সিলসিলাভুক্ত। আর ওলীউল্লাহী চিন্তাধারা এবং কাসেমী চিন্তাধারা উভয়টিই ইলহামী বা খোদাপ্রদত্ত ও ঐশ্বরিক। ওলীউল্লাহী ও কাসেমী চিন্তাধারার সমষ্টিই হচ্ছে দেওবন্দী চিন্তাধারা। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হল যে, খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বাধিক ধারক বাহক এবং সমস্ত সুন্নাত ওয়াল জামাতের শাখা-প্রশাখাসমূহের সমষ্টি এ দেওবন্দী মতবাদ ও চিন্তাধারা কারো মনগড়া নয়, বরং সম্পূর্ণ এলহামী বা খোদাপ্রদত্ত বা ঐশ্বরিক।

দেওবন্দ মাদ্রাসা ও তার যাবতীয় বিষয়ই ইলহামী ঃ

উপরোক্ত দাবীর স্বপক্ষে অনেক ঘটনা বিদ্যমান। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১। হযরত নানুতবী (রহঃ) বলেন, আমাকে এ দেওবন্দ মাদ্রাসার ছুরত আলমে মেছালে একটি লটকানো পাতিলের মত দেখানো হয়েছিল। কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, তাওয়াক্কুল দিয়ে। যে এ মাদ্রাসা আসবাব ও উসিলা অবলম্বন করলেও এর প্রকৃত ভরসা আল্লাহর উপরই থাকবে। তাই এ দেওবন্দী মাদ্রাসার আটটি উসুলে (কানুনে) তাওয়াক্কুলের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২। মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) বলেন, একবার স্বপ্নে আমি বাইতুল্লাহ শরীফের ছাদের উপর দাঁড়ানো ছিলাম, আর আমার হাত–পায়ের আঙ্গুলী হতে নহর জারী হয়ে পৃথিবীর আনাচে–কানাচে প্রবাহিত হচ্ছে। দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার পর আহলুল্লাহ বা আল্লাওয়ালাগণ মন্তব্য করেন যে, উক্ত খাবের তাবীর ছিল এ দারুল উলুম দেওবন্দ।

৩। দেওবন্দ মাদ্রাসার দ্বিতীয় মুহতামিম মাওলানা রফিউদ্দিন ছাহেব একবার স্বপ্নে দেখেন যে, উলুমে দ্বীনিয়ার চাবিসমূহ তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যাও দেওবন্দ মাদ্রাসা করা হয়েছে।

৪। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যখন উহার রূপরেখার উপর পরামর্শ হচ্ছিল তখন সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন এলহামের ভিত্তিতে একই মত পোষণ করেন।

৫। দেওবন্দ মাদ্রাসাটি দিল্লী, সাহারানপুর বা মীরাট ইত্যাদি কোন কেন্দ্রীয় শহরে না হয়ে দেওবন্দ এর ন্যায় একটি ছোট শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও ইলহামী। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বহু বছর পূর্বে সৈয়দ আহমদ শাহীদ (রহঃ) জেহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার প্রাক্কালে দেওবন্দ অতিক্রম করার সময় ঐ স্থানে পৌছে (যেখানে বর্তমানে দেওবন্দ মাদ্রাসা অবস্থিত) বলেছেন, 'মুজে ইহাছে এলম কি খুশবু আরাহী হায়।' এখান থেকে আমার কাছে এলমের ঘ্রাণ আসছে অথচ সে স্থানটিতে তখন ময়লার স্তূপ ছিল।

৬। দেওবন্দে ধর্মীয় শিক্ষার কাজ প্রথম দেওবন্দের চাত্বা নামীয় এক ছোট মসজিদে আরম্ভ হয়। এর আট নয় বছর পর ভিন্নভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভিন্নভাবে মাদ্রাসার ঘর নির্মাণের আলোচনার সময় হাজী আবেদ শাহ (রহঃ) ইহার বিরোধিতা করে বলেন, ঘর নির্মাণে অযথা জনগণের পয়সা কেন নষ্ট করা হবে, যখন শহরে বড় মসজিদ রয়েছে যার তিন দিকেই কামরা আছে। সেখানে ৩০/৪০ জন ছাত্র ভালভাবেই থাকতে পারবে। তখন নানুতবী (রঃ) বলেন, হাজী সাহেব! এ মাদ্রাসা সম্বন্ধে আপনি ঐ জিনিস দেখতে পাচ্ছেন না, যা আমি দেখছি। এ মাদ্রাসা এ পর্যন্ত থাকবে না, আরও অগ্রসর হবে। অতঃপর

হাজী সাহেবও রাজি হয়ে যান।

৭। দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র নির্বাচনের ব্যাপারটাও ইলহামী ও গায়েবী ঈশারার উপর ভিত্তি। হযরত মাওলানা তৈয়ব (রহঃ) বলেন, একদিন মাওলানা রফি উদ্দিন সাহেব তাঁর মুহতামেমীর যুগে এহাতায়ে মুলছেরীতে (নূদরা বিল্ডিং এর সামনে) দাঁড়ানো ছিলেন। কিছু ছাত্রও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় দাওরা হাদীসের এক ছাত্র বোর্ডিং থেকে খাবার নিয়ে দৌড়িয়ে তাঁর সামনে আসে এবং অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণভাবে বাটি মাওলানা সাহেবের সম্মুখে মাটিতে নিক্ষেপ করে বলে 'এটাই হলো আপনার মুহতমামী ও শৃংখলা। এই পানির ন্যায় শুরবা, না আছে ইহাতে ঘি, না মসল্লা, না অন্য কিছু।'

এভাবে আরও কিছু অশালীন বাক্য ব্যবহার করে। উপস্থিত ছাত্রগণ ইহাতে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে যান, কিন্তু মাওলানার সম্মানার্থে তাকে কিছু বললেন না। মাওলানা সাহেব গভীর মনোযোগের সহিত ছাত্রটির মাথা হতে পা পর্যন্ত তিনবার পর্যবেক্ষণ করলেন। ছাত্রটি ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর মাওলানা সাহেব বললেন, এ কি দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র? এরপর বললেন, এ ছেলেটি মাদ্রাসার ছাত্র নয়। ছাত্ররা বললেন, হুযুর! এর নাম রীতিমত বোর্ডিং খাতায় লেখা আছে এবং সে নিয়মিত বোর্ডিং থেকে খাবার উঠায়।

যাচাই করার পর উদঘাটিত হলো যে, সে প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসার ছাত্র নয়, বরং ধোকাবাজী করে তারই নামের একজন প্রকৃত ছাত্রের খোরাকী সে উঠায়ে আসছিল। আর আসল ছেলেটিকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। ঘটনাটি পরিস্কার হয়ে যাওয়ার পর ছাত্ররা হযরত মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, হুজুর! আপনার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তারা আরও আরজ করলেন যে, হুজুর! এ ছেলের ছাত্র হওয়ার পক্ষে জাহেরী প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও আপনি এত দৃঢ়তার সাথে কি ভাবে বলে দিলেন যে, এ ছেলে দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র নয়? উত্তরে হুজুর বলেন, আমার এহতেমামীর দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকে আমি একটি স্বপ্ন দেখি যে, দারুল উলুমের (দেওবন্দ মাদ্রাসার) এই ইন্দারা (যা এহাতায়ে মুলছেরীতে অবস্থিত) দুধে ভর্তি এবং ইন্দারার উপরের অংশ পর্যন্ত দুধ

এসে গেছে যা হাত দিয়ে নেওয়া যায়। ইন্দারাটির মাথায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ এনে দুধ বন্টন করছেন। শত শত লোক দুধ নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ মশক ভর্তি করে, কেউ বালতি ভর্তি করে, কেউ লোটা ভর্তি করে, কেউ বাটি ভর্তি করে, আর যার হাতে কোন পাত্র নেই, সে হাতের কোষ ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখার পর আমি ইহার ব্যাখ্যা জানার জন্য মোরাকাবায় বসলে আমার উপর কাশফ হয় যে, ইন্দারা হলো দেওবন্দ মাদ্রাসার আকৃতি, দুধ হলো ইলমের আকৃতি, হুজুর (দঃ) ইলম বন্টনকারী, আর দুধ সংগ্রহকারীগণ হলো দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র। মাওলানা সাহেব বলেন, যখন শিক্ষা বছর শুরু হয় (শাওয়াল মাস) এবং ভর্তির জন্য ছাত্ররা আসে তখন ভর্তি হওয়া সব ছেলেকে আমি চিনে ফেলি যে, এরা দুধ সংগ্রহকারীদের মধ্যে ছিল। আমি (মাদ্রাসার ডাউলের শেকায়েতকারী) ঐ বেআদব ছেলেটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার দৃষ্টি দিয়েছি—এ ছেলে (দুধ সংগ্রহের) ঐ শুভ মুহূর্তে উপস্থিত ছিল না। তাই আমি দৃঢ়চিত্তে বলে দিয়েছি যে, এই ব্যক্তি দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র নয়। আলহামদুলিল্লাহ, রেজিষ্ট্রি খাতার মাধ্যমেও এর সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল। এ ঘটনার দ্বারা ইহাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, দেওবন্দের এ মকবুল মাদ্রাসার ছাত্র নির্বাচনে কিছু গায়েবী নির্বাচনের সম্পৃক্ততাও জড়িত রয়েছে।

৮। দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এলহাম ও গায়েবী ইশারার দখল রয়েছে। যার অনেক প্রমাণ তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দের ভূমিকা ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে। কাজেই বলা যায় দেওবন্দ মাদ্রাসার অফিসিয়াল কার্যাবলী, বিল্ডিং ইত্যাদি মাদ্রাসাটির জাহেরী দিক। পক্ষান্তরে উল্লেখিত এবং অনুরূপ আরও অসংখ্য এলহামী ঘটনাবলী হলো তার রূহ বা বাতেনী দিক।

৯। বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক পরিচালিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত শ্যামলী যুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ ও ভিত্তি খননটিও এলহামী। মাদ্রাসার নকশা তৈরীর পর পরামর্শক্রমে নির্ধারিত স্থানে ইহার ভিত খনন করা হয়। কিন্তু তখনও ভিত্তি স্থাপন

করা হয় নাই, এই সময় দেওবন্দ মাদ্রাসার দ্বিতীয় মোহ্তামেম মাওলানা রফিউদ্দিন নকশেবন্দী (রহঃ) রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, ঐ ভিতের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি। তিনি এরশাদ করলেন, উত্তর দিকে যে ভীত খনন করা হয়েছে তাতে মাদ্রাসার ছেহেন বা বারান্দা ছোট হবে। ইহা বলে তিনি ঐ ভীতের স্থান হতে উত্তর দিকে দশ–বিশ হাত এগিয়ে লাঠি মোবারক দিয়ে দাগ টেনে দিয়ে এরশাদ করলেন, মাদ্রাসার ভীতের জন্য যেন এ স্থানটি খনন করা হয়। জাগ্রত হয়েই মাওলানা রফি উদ্দিন (রহঃ) ঐ স্থানে গেলেন এবং স্বপ্নে দেখানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠির দ্বারা দাগানো স্থান হুবহু দেখতে পেলেন এবং তিনি কমিটি বা অন্য কারো পরামর্শ ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাগানো স্থানে নতুন ভীত খনন করলেন। কেউ তাতে আপত্তি করলেন না। ঐ স্থানটি এখন নুদরা নামে প্রসিদ্ধ।

১০। দেওবন্দ মাদ্রাসার আটটি উসুল বা কানুনও এলহামী। তাই মাদ্রাসায় আগত চিন্তাবিদগণ মাদ্রাসার উসুলগুলো দেখা মাত্রই বলে দেন এটা এলহামী ছাড়া আর কিছুই নয়। খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্কালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার যখন দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন তখন তাঁকে মাওলানা নানুতবী (রহঃ) এর নিজ হাতে লেখা মাদ্রাসার আটটি উসুল দেখানো হলে তাঁর চোখে পানি এসে যায়। এবং তিনি বলেন, এ উসুলের সাথে বিবেকের কি সম্পর্ক আছে? এটা তো এলহামী। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ইত্যাদি।

—মুকাদ্দামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ইত্যাদি।

ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে ওলামায়ে দেওবন্দীদের ভূমিকা

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট–ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে বাণিজ্যের উসিলায় ইংরেজদের ভারত আগমন এবং তৎকালীন ভারতের মুসলিম শাসকদের আভ্যন্তরীণ কলহ–বিবাদ ও বিলাসিতা দেখে ভারত মুরুব্বী শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই ভারতবর্ষ

থেকে ইংরেজ কর্তৃক মুসলিম শাসন উৎখাত হবে। তিনি মুসলিম শাসকদের এ বিষয়ে সতর্কও করে দেন। ক্ষমতা হারানোর পর তা কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে সে ব্যাপারে তিনি ১১৪৪ হিজরীতে (১৭৩১ খৃঃ) স্বপ্নের ভিত্তিতে 'ফক্কে কুল্লেনেজাম' নামে একটি নতুন আন্দোলনের রূপরেখা খাড়া করেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর বিপ্লবী কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ইত্যাদিতে রয়েছে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ) এ আন্দোলনের ইমাম নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর দৌহিত্র মুহাদ্দেস শাহ এসহাক দেহলবী (রহঃ) ঐ আন্দোলনের ইমাম নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। উক্ত তিনজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন ঐ 'ওলীউল্লাহী আন্দোলনের' ইমাম। আর ঐ আন্দোলনের আমীর ছিলেন শহীদ মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ), ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলনের আরও একজন বীরপুরুষ হলেন শহীদ মাওলানা ইসমাঈল ইবনে শাহ আবদুল গনী ইবনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)। যিনি আন্দোলনটির ইমাম বা আমীর কিছুই ছিলেন না। কিন্তু আজীবন এ আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করে পরিশেষে স্বীয় শাহাদাতের মাধ্যমে আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করে গেছেন।

ইমাম এসহাক (রহঃ) ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে ছিলেন। অতঃপর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থান করেন। ঐ সময় দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন উস্তাদকুল শিরোমনী হযরত মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ)। মাওলানা মামলুক (রহঃ)এর পর এ আন্দেলনের আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)। তিনি দীর্ঘ ১২ বৎসর দিল্লীতে অবস্থান করে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। অতঃপর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি মক্কাতে অবস্থান করেন। মক্কায় অবস্থানকালে ভারতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাছেম নানুতবী (রহঃ) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর দেওবন্দ মাদ্রাসারই প্রথম

সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহঃ) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আন্দোলনটির আমীর থাকেন। এরপর ভারত স্বাধীন হয় অর্থাৎ ১৯৪৭ ইং পর্যন্ত ঐ আন্দোলনের আমীর ছিলেন মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দী (রহঃ)।

১৭৫৭ ইং সালে পলাশীর ময়দানে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের পর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম বলতে গেলে একমাত্র দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সামন্তবর্গের মধ্যে সীমিত ছিল। নানা কৌশলে দীর্ঘদিন থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদেরকে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়ে এবং কলহরত মুসলিম শাসকদের আভ্যন্তরীণ আত্মকলহকে কাজে লাগিয়ে সর্বশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুগল সম্রাটের নিকট থেকে জোরপূর্বক লিখিতভাবে ক্ষমতা আদায় করে ব্রিটিশ তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে আন্দোলনের দ্বিতীয় ইমাম শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মৌলবী আবদুল হাই দেহলবী (রহঃ) কর্তৃক ভারতকে 'দারুল হরব' শত্রু কবলিত দেশ ফতোয়া দানের পর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশ কবল মুক্ত করার এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় শহীদে বালাকোট হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ)এর উপর। তিনি ১৮২০ ইংরেজীতে আজাদী আন্দোলনের জন্য একটি সরকার গঠন করেন।

১৮২৪ সালে তাঁর আণ্ডার গ্রাউণ্ড সরকারের সেন্টার ভারত আফগান সীমান্ত এলাকা 'স্বাধীন ইয়াগিস্তানে' নিয়ে আসেন। ১৮২২ ইংরেজীতে হজ্জ পালন করার পর ১৮২৩ ইংরেজীতে বালাকোটে শহীদ হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ আট বৎসর যাবৎ ভারত উপমহাদেশে তিনি স্বাধীনতার জিহাদ পরিচালনা করেন। ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাবলীগি মারকাজগুলো মুজাহিদ ভর্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় এবং এক লক্ষের বেশী লোক তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেন।

ধূর্ত ইংরেজ জাতি ব্রিটিশ বিরোধী শিখদেরকে সর্বদাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে রাখতো। তাই হযরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময়

পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের শিখ রাজ্যের শিখ রাজা রঞ্জিত সিং মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালালে সৈয়দ আহমদ (রহঃ)এর ইংরেজ বিদ্রোহী বাহিনী ও তিনি শিখদের বিরুদ্ধেই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধে 'আকোরায়' বিজয় লাভ করেন।

আবার ১৮৩০ ইংরেজীতেও আরেকটি যুদ্ধ হয়। তখন পেশোয়ার জয় করেন এবং সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রও কায়েম করা হয়। ইংরেজদের সাথে প্রথমতঃ যুদ্ধ না করে শিখদের সাথে যুদ্ধ করার কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আজাদী আন্দোলনে শিখ জাতি প্রতিবন্ধক হতে পারে। তাই তাদেরকে আগে দুর্বল করা উচিত।

পরবর্তীতে সৈয়দ সাহেবের অনুগামীর ছদ্মাবরণে সীমান্তের এক মুসলিম বিশ্বাসঘাতকের সক্রিয় সহায়তায় লাহোরের বালাকোট নামক স্থানে ১৮৩১ ইংরেজীর মে মাসে রঞ্জিত সিং এর সেনাপতি শের সিংহ সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)এর উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে তাঁরা বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে ২৪শে জিলকদ, ১২৪৬ হিজরীতে (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) শাহাদতবরণ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ যুদ্ধে নোয়াখালীর মাওলানা ইমামুদ্দিন (রহঃ) ও চট্টগ্রাম নেজামপুরের মাওলানা নূর মুহাম্মদ (রহঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গাজী হয়েছেন, শহীদ হননি। তাছাড়া আরো একজন বাঙ্গালী গাজী হয়েছেন তিনি হলেন কলকাতার হাজী জামাল উদ্দিন (রহঃ)।

সৈয়দ সাহেবের শাহাদাতের পর ঐতিহাসিক 'ইয়াগিস্তান' এলাকাটি সৈয়দ সাহেবের আযাদী আন্দোলন সরকারের রাজধানী এবং মুজাহিদ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার সাব্যস্ত হয়। সৈয়দ সাহেবের শাহাদতের পর আযাদী আন্দোলনের কাজ তাঁর গড়া মুজাহিদ বাহিনী নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালিয়ে যান। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ও সম্মিলিত মুজাহিদ বাহিনী 'ইয়াগিস্তানের' দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত 'সিতানা শিবির' হতে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর অবিরত দুর্বার আক্রমণ চালাতে থাকে। তাদের তৎপরতা ইংরেজ বিরোধী ঘটনা প্রবাহকে ক্রমশঃ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে বইয়ে নিয়ে যায়।

১৮৩১ সালে সৈয়দ সাহেব শহীদ হবার পর আন্দোলনের ইমাম হন শাহ মোহাম্মদ ইসহাক (রহঃ)। ১৮৪৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করলে আন্দোলনের আমীর হন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) (১৮১৭–১৮৯৯)।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেওবন্দী ওলামাদের অংশগ্রহণ ঃ

১. ইংরেজ বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৮৮–১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ) অধীনতামূলক মিত্রতা বা সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি (Subsidiary Alliance) দ্বারা দেশী রাজন্যবর্গকে নিজ অধীনে আনয়ন এবং 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' বা বর্তন নীতির (Doctrin of Lapse) নামে অপু এক হিন্দু রাজাদের রাজ্য হরণ ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

২. শহীদে বালাকোট হযরত বেরেলবীর সাথে যারা একত্রে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের উপর ইংরেজ সরকারের নির্যাতনের কারণে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজ সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।

৩. উপর্যপুরি (ক) ভারতীয়দের ইংরেজী ভাষা শিখতে বাধ্যকরণ। (খ) ইংরেজ পাদ্রিগণ কর্তৃক ভারতীয়দের ছলে বলে কলে কৌশলে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিতকরণের অপপ্রয়াস। (গ) হিন্দু সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সতীদাহ প্রথা, আইনের সাহায্যে রহিত করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপকরণ। (ঘ) ভারতীয় হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের গরু ও শূকরের চর্বি মাখানো টোটা দাঁতে কেটে 'এণ্ড ফিল রাইফেলে' ভরতে দেয়া ইত্যাদি কারণসমূহ ভারতীয়দের অন্তরে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা বিপ্লব তারই বহিঃপ্রকাশ।

উপরোক্ত কারণে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মুসলমানেরা তাদের মুক্তির জন্য বিপ্লবকে অপরিহার্য মনে করলো এবং সে মতে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১৮৫৭ সালের ১১ই মে, সারা ভারতবর্ষে একত্রে বিপ্লব আরম্ভ হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেই নির্দিষ্ট তারিখের প্রায় ২ মাস পূর্বে মার্চ মাসের ২২ তারিখে বাংলাদেশের 'বারাকপুরে' ভারতীয় সিপাহীগণ কর্তৃক ব্রিটিশ সেনানায়ক হত্যার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম বিপ্লব আরম্ভ হয়

এবং সাথে সাথে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধের লেলিহান শিখা সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অপ্রস্তুত অবস্থায় বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণে সুশৃংখলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ইংরেজদের উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এবং বাঙ্গালী হিন্দু, পাঞ্জাবী, শিখ, নেপালী গুর্খা, হায়দারাবাদের নেজাম, স্যার সালার জং, স্যার দিনকর রাও হোলকার এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ ব্যক্তিগণ সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সহায়তা করায় স্বাধীনতা বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

১৮৫৭ সালের এ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে ওয়ালীউল্লাহী আযাদী আন্দোলনের তৎকালীন আমীর, দেওবন্দীদের মুরুব্বী হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) এক পরামর্শ বৈঠকে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) থেকে যুদ্ধের পক্ষে রায় পাওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং একটি সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। থানা ভবনে সংগঠিত ঐ সরকারে হাজী সাহেব আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন। মাওলানা নানুতবী দেওবন্দী (রহঃ) প্রধান সেনাপতি এবং মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ) দেওবন্দী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

চতুর্দিক থেকে আগত সমস্ত মুজাহিদ, সেনাপতি মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)এর নেতৃত্বে সুশৃংখলভাবে পার্শ্ববর্তী 'শামেলী' নামক স্থানে ইংরেজদের শিবিরে আক্রমণ করে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তা দখল করে নেন। যুদ্ধে হাফেজ জামেন (রহঃ) শাহাদাত বরণ করেন।

এ দিকে ইংরেজ সৈন্য দিল্লী পূর্ণ দখল করার খবর শামেলী তথা থানাভবন পৌছার সাথে সাথে মুজাহিদগণ যে যার পথে কেটে পড়েন। ফলে শামেলী ও থানাভবন ব্রিটিশের পুনঃ দখলে চলে যায়। মুজাহিদগণের প্রতি ওয়ারেন্ট জারি হয়। মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ) বন্দী হন। হাজী সাহেব বহুদিন আত্মগোপন করে অবশেষে ১৮৫৯ ইংরেজীতে মক্কায় হিজরত করেন।

মাওলানা নানুতবী (রহঃ) মাত্র তিন দিন আত্মগোপন থাকার পর প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে এসে ঘোষণা দিলেন যে, মাত্র তিন দিন

আত্মগোপন করা সুন্নত। (হিজরতের প্রাক্কালে হুজুর (সাঃ) গারে ছাওরে তিন দিন আত্মগোপন করেছিলেন। মাওলানা নানুতবী ঐদিকেই ইঙ্গিত করেন।)

সিপাহী বিপ্লবে পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সেনাদের মুসলিম নির্যাতনের নমুনা

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের মূলনায়ক ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায় এবং তাতে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ভূমিকা বেশী থাকার কারণে মুসলমানদের উপরই নির্যাতন বেশী হয়। ঐ নির্যাতন হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাইকারী হারে রক্তপাতের সাথে সাথে নেতৃবর্গ, রাজপুত্র, ওলামা ও কবিদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। থানা ভবন শহর ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাড়ীগুলো আগুন দিয়ে ছাই করে দেয়া হয়। ঐ যুদ্ধে (প্রায়) দুই লক্ষ মুসলমান শহীদ হয়। তাতে সাড়ে একান্ন হাজার ওলামা ছিলেন। দাড়ি, লম্বা জামাধারী ব্যক্তি দেখামাত্রই ফাঁসি দেয়া হতো। শুধু দিল্লীতেই পাঁচ শত ওলামাগণকে ফাঁসি দেয়া হয়। দিল্লীর মসজিদের ছেহেনে মুসলমানদের কতল করা হয়।

দিল্লীর অলি গলি লাল আর কবরে পরিণত হয়। দরজা খুলে মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে ইংরেজ সেনারা মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানী করে। তাদের অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার মুসলিম নারী ইন্দ্রায় (কুয়ায়) ঝাঁপ দেয়। জীবিত মেয়েদের ইন্দ্রা থেকে উঠানোর ইচ্ছা পোষণ করলে, তারা বলতো, আমরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। আমাদের মেরে ফেলো তবুও ইজ্জত নষ্ট করো না। অনেক অভিভাবক শ্লীলতাহানীর ভয়ে নিজ হাতে তাদের মেয়েদেরকে মেরে ফেলে পরে তারাও আত্মহত্যা করেছিলো।

ছোট শিশু এবং মেয়েলোকেরাও তাদের হত্যা হতে রক্ষা পায়নি। দিল্লীতে বর্ষার পানির মত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। শুধু দিল্লী শহরেই বিভিন্নভাবে ২৭ হাজার ওলামা শহীদ হন। মাসের পর মাস এই হত্যাকাণ্ড চালু থাকে। অসংখ্য লাশ দাফন ছাড়া থাকায় কুকুর শকুনের খোরাক হয়। দিল্লীতে ২৪ হাজার রাজবংশীয় লোককেই হত্যা করা হয়। অনেককে

দেশান্তর করা হয়। বহু স্থানে ফাঁসি দেয়ার পর ইংরেজরা চেয়ারে বসে তামাশার আসর করতো। ইংরেজদের মহল ও বাগানের কাছে হুগলী নদীতে হাজার হাজার লাশ ভেসে থাকতো। পাটনা, কলিকাতার অলি গলি লাশে ভরা ছিলো। যুদ্ধস্থলের আশপাশে এমন কোন গাছ ছিলো না যেখানে হিন্দু মুসলমানদের লাশ ঝুলছিলো না। মুসলমানদেরকে শূকরের চামড়ায় সিলায়ে দেয়া হতো এবং শূকরের চর্বি গায়ে মেখে তাদের পুড়িয়ে ফেলা হতো। ফাঁসির সময় সাধারণত আমগাছ এবং হাতি ব্যবহার করা হতো। বন্দীদের গলায় রশি বেঁধে রশির একমাথা গাছের ডালের উপর দিয়ে নিয়ে এনে হাতির গলায় লাগিয়ে হাতিকে হাঁকানো হতো, ইত্যাদি।

সব নির্যাতনের কথা লিখতে গেলে একটি বড় বই হয়ে যাবে।

—দারুল উলুম কি তারীখে সিয়াসত

দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধ কঠোর হস্তে দমন করার পর তাদের সাম্রাজ্য পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকেই তারা আর্থিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল করে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যে আর্থিক দুরাবস্থা সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন—দৈনিক দেড় আনা অথবা আধা সের শস্যের বিনিময়ে একজন ভারতীয় স্বেচ্ছায় ঘাড় কর্তন করতে প্রস্তুত হতো। ফার্সীর পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজী করে মুসলমানদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। হাতী, ঘোড়ার মালিক মুসলমানগণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে বাধ্য হন। রাজবংশীয় ফুলের মত মেয়েরা ছিঁড়া চাদর মাথায় দিয়ে বাড়ী বাড়ী রান্না বান্নার চাকুরী খুঁজে বেড়াতো। প্রজা ও নবাবদের উপর ভারী ট্যাক্স বসিয়ে তাদের পঙ্গু করে রেখেছিলো। আর ইংরেজ চিন্তাবিদরা বললো যে, সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের ধ্বংস করতে হলে, তাদের অন্তর থেকে পবিত্র কোরআন বিতাড়িত করতে হবে। তাই একদিন ইংল্যাণ্ডের মুসলিম বিদ্বেষী 'প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্লাডা ষ্টোন' ব্রিটিশ জাতীয় সংসদে পূর্ণ অধিবেশন চলাকালে পবিত্র কোরআন স্বহস্তে উত্তোলন করে বলেছিলো যতদিন এই বইখানা অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পৃথিবী কৃষ্টি

সভ্যতা লাভ করতে পারবে না। 'হেনরী হ্যারিংটন টমাস' বলেছিলো, এমন যেকোন সরকার যারা অন্য ধর্মাবলম্বী, মুসলমান কখনও সে সরকারের ভাল প্রজা হতে পারে না।

ভারতীয়দের জন্য ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের 'লর্ড ম্যাকলে' পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলো ভারতীয়দের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এমন এক যুবক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা যারা রং ও বংশের দিক দিয়ে হবে ভারতীয় এবং মন ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে হবে খাঁটি বিলাতি। অন্যদিকে পুরাতন মাদ্রাসাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রফেসার 'মাকছামলজ' এর মতে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠার আগে শুধু বাংলাতেই ৮০ হাজার মাদ্রাসা ছিলো। ব্রিটিশ সরকার চাকুরী, মেম, গাড়ি, বাড়ী ও অন্যান্য লোভ দেখিয়ে মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর কৌশল অবলম্বন করে ইত্যাদি।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইসলাম ও মুসলমানী রক্ষা করার বিকল্প দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাই এ দেওবন্দ মাদ্রাসা মুসলিম সন্তানদেরকে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে শিরক, বিদায়াত এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি হতে মুক্ত করার ও ভারতে খাঁটি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদের চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে স্বাধীন হবার পূর্বাপর যুক্ত ভারতে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা

১৩২৩ হিজরীতে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের সভাপতি নিযুক্ত হবার পর দারুল উলূম থেকে শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারী সমস্ত পুরাতন ছাত্রগুলোকে একত্রিত করে 'জমিয়াতুল আনসার' নামীয় সংস্থাতে যোগ দিতে বলেন। ১৯১৪ সালে তাঁর সুসংগঠিত দলটিকে উক্ত জমিয়তের মাধ্যমে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন।

১৮৫৭ সালের পর সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে আজাদ করার লক্ষ্যে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের ভিতরে জনগণ এবং সৈনিকদেরকে সংঘবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের বাইরে আফগান, তুরস্ক ও অন্যান্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যে ভারত আজাদের লক্ষ্যে হাজার হাজার বৈপ্লবিকদের সাথে বহু গোপন ও সুশৃংখল কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের ভিতরে গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য তিনি একটি হেড কোয়ার্টার ও নয়টি সেন্টার খোলেন। এবং বড় বড় বিপ্লবী লিডারদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার নির্দেশ জারী করেন। হেড কোয়ার্টার দিল্লীতে ছিলো। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মোহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজ পুত রায় ও রাজেন্দ্র প্রসাদ দিল্লীর দায়িত্বে ছিলেন এবং এঁদেরই নির্দেশে বাকী নয়টি সেন্টার চলতো।

সেন্টারগুলোর নাম ঃ রান্দির, পানিপথ, লাহোর, দীনপুর, আমরুট, করাচী, এতমামজয়ী এবং জয়ী, রাওগী, ঢাকা। শেষটা ছিলো বাংলা প্রদেশের সেন্টার, যার দায়িত্বে ছিলেন মোঃ রিয়াজ আহমদ। এ সেন্টারগুলোকে সাহায্য করার জন্য বহিরমুলুকেও অনেক সেন্টার খোলা হয়। বহির মুলুকের সেন্টারগুলোর হেড কোয়ার্টার ছিলো কাবুল। যা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) এবং রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এর দায়িত্বে ছিলো।

আর কাবুল সেন্টারের ব্রাঞ্চ ছিলো ৫টি—মদীনা, ইস্তাম্বুল, কুস্তুনতুনিয়া, আনকারা ও বরলন। বরলনে হরদয়াল দায়িত্বে ছিলেন। মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) এবং হরদয়ালের মাধ্যমে জার্মান-তুরস্ক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আজাদী এবং তুর্কীদের সমর্থন লাভের জন্য শায়খুল হিন্দ (রহঃ) চীন, বার্মা, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকায়ও মিশন প্রেরণ করেন। সরকারী খবর এ সেন্টারগুলোতে পৌছানোর জন্য ১৯ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নওজোয়ান নিযুক্ত করা হয়। শায়খুল হিন্দের যুদ্ধে উক্ত প্রায় সেন্টারগুলো ধর্মীয় শিক্ষার আবরণে ঢাকা ছিলো। অর্থাৎ সেন্টারগুলোতে পড়ালেখা চালু ছিলো। ফলে বহু বৎসর পর্যন্ত এ সুদূর প্রসারী

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আফগানিস্তানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। রাওলেট রিপোর্টের বর্ণনা মতে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মথুরী সেই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, মাওলানা সিন্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাওলানা বরকতুল্লাহ ভূপালী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেওবন্দীদের কুটনৈতিক ভূমিকা ।। ১৯১৫ সালের ঐতিহাসিক রেশমী চিঠি আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে একদিকে যেমন জার্মানী, ইতালী এবং অষ্ট্রিয়ার সমন্বয়ে ত্রিপল এলায়্যানস বা ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী স্থাপিত হয়। অন্যদিকে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত হয় ট্রিপল এনট্যোনিক বা ত্রিপক্ষীয় আঁতাত। ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে উপরোক্ত ত্রিশক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে খ্যাত। পরবর্তী পর্যায়ে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে তুরস্কও বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারতের জিহাদী ওলামায়ে হকদের অনুসারী দেওবন্দী মাশায়েখগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতার এক অপূর্ব সুযোগ মনে করেন।

রেশমী চিঠি আন্দোলনের নায়ক ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করা। কারণ, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন এই আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তুতি চলছিলো তখন ধারণা করা হতো যে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত এদেশ থেকে বৃটিশ বিতাড়ন অসম্ভব।

অন্যদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য আকাংখা দাবী দাওয়া আদায়ের মধ্যে সীমিত ছিলো। এজন্য পূর্ব পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লবকে কার্যকর করার সুযোগ বয়ে আনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শায়খুল হিন্দ কর্তৃক সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিলো আভ্যন্তরীণ

গোলযোগ এবং বহির্গত আক্রমণের মাধ্যমে বিপ্লবকে স্বার্থক করে তোলা। অতএব, তিনি তাঁর এই আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে যে দুইজন সহকর্মীকে নির্বাচিত করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত, অনুগত ছাত্রদ্বয় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) ও মাওলানা মোহাম্মাদ মিঞা মনসুর আনসারী (রহঃ)।

তাই তুরস্ক হতে ভারত আক্রমণের প্রতিবন্ধক ইরান, আফগানকে হাত করে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং আফগানিস্তানকে মুজাহিদীনের সমর্থনকারী বানানোর লক্ষ্যে হামলার তারিখ ১৯১৮ ইং সালের ফেব্রুয়ারী ও হামলার স্থান কোলাত, কোয়েটা, পেশাওয়ার, উগী নির্ধারণ করে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র মাওলানা সিন্ধীকে (১২৮৯–১৩৬০ হিঃ) ১৩৩৩ হিজরী মুতাবেক ১৯১৫ ইং সালের ১৫ই অক্টোবরে কাবুলে পাঠান।

১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বরে মুজাহিদীনের আমীর মাওলানা বশীর সাহেবের পরামর্শে মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) 'জুনুদুল্লাহ' নামে আরেকটি দল কায়েম করেন। যারা অস্থায়ী রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করতো।

হামলার তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর দৃশ্যত হজ্জের লক্ষ্যে বাস্তবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও অস্ত্র লাভের আশায় শায়খুল হিন্দ (রহঃ) ১৯১৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মক্কার উদ্দেশ্যে বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করেন। তবে তিনি মুজাহিদ কেন্দ্রগুলোকে সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন নির্ধারিত তারিখে নতুন আদেশ আসার পূর্বে যুদ্ধ শুরু না করে।

শায়খুল হিন্দ মক্কায় পৌঁছে প্রথমে হেজাজের তুর্কী গভর্নর গালিব পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গালিবের মাধ্যমে ঐ সময় মদীনায় আগমানেচ্ছুক তুরস্কের দেশরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশা এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলিক সেনাপতি জামাল পাশার সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তুরস্ক সরকারের সর্বোচ্চ পদস্থ এই সামরিক নেতৃদ্বয়ের সাথে শায়খুল হিন্দের যে গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আনোয়ার পাশার দস্তখত সম্বলিত আলাদাভাবে তৈরী আরবী, ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় রচিত

সামরিক গোপন চুক্তি তারই ফল। এই চুক্তিতে তুর্কি সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং ভারতীয় বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্ক সরকারের সামরিক সাহায্য দানের আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার লিপিবদ্ধ করা হয়। সাথে সাথে শায়খুল হিন্দের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তাঁকে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রত্যেক তুর্কি সামরিক এবং বেসামরিক অফিসারদের উপর আদেশ জারী করা হয়। তিনি উক্ত চুক্তিপত্রখানার বহু ফটোকপি করে একটি কাপড় বহনকারী সিন্দুকের তক্তার ভিতর সংরক্ষণ করে মাওলানা হাদী হাসানের মাধ্যমে দিল্লীর ফটোগ্রাফার আহমদ মির্জা সাহেবের নিকট অলৌকিকভাবে কড়া চেকের পরেও পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং কিছু পরে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মুজাহিদ সেন্টারগুলোতেও পৌঁছে যায়।

মাওলানা মনসুর আনসারী এবং মাওলানা হাদী হাসানের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের চিঠিখানা আফগানেও পৌঁছে যায়। যেহেতু আনোয়ার পাশার পত্রখানা আফগান, তুরস্ক সামরিক চুক্তির ভিত্তিতে ছিলো সেহেতু উহা আফগান পৌঁছার সাথে সাথে রাষ্ট্রিয় নেতৃবৃন্দ এবং মাওলানা সিন্ধী (রহঃ)এর সঙ্গে আলোচনার পর আফগান আমীর হাবিবুল্লাহ খান নির্ধারিত এলাকাগুলো দিয়ে নির্ধারিত তারিখে তুরস্ক সেনাদেরকে ভারত আক্রমণের অনুমতি দিয়ে দিলে মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) আফগান শাসকের উক্ত মঞ্জুরীর খবরটি হেজাজে অবস্থানরত তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দু (রহঃ)এর নিকট ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কাগজে না লিখে একটি রেশমী রুমালে বুনিত অক্ষরে লিখে পাঠান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পত্রখানা ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যায়। উক্ত পত্রখানা রেশমী রুমালে লিখিত হওয়ার কারণে শায়খুল হিন্দ (রহঃ) এবং তদীয় ছাত্র মাওলানা সিন্ধী (রহঃ)এর আন্তর্জাতিক, কূটনৈতিক তৎপরতা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বৃটিশ বিরোধী যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠে তা তাহরীকে ইনকেলাব ওরফে রেশমী খুতুত কি তাহরীক বা বিপ্লব আন্দোলন ওরফে রেশমী চিঠির আন্দোলন নামে অভিহিত।

চিঠিখানা আরবী ভাষায় হাবিবুল্লাহ খান ও তাঁর তিন পুত্র আমানুল্লাহ খান, নছরুল্লাহ খান ও এনায়েতুল্লাহ খানের দস্তখত

সম্বলিত ছিলো। এ চার ব্যক্তির নাম বুননের মধ্যেই এসে যায়। তদুপরি রুমালের উপর ব্যক্তি চতুষ্টয়ের দস্তখত হলুদ রং–এর কালি দিয়ে অংকন করে দেয়া হয়। পুরা রুমালটি দিক, পাশ এক হাতে করে হলুদ রং এর ছিলো। মাওলানা সিন্ধী (রহঃ) এক দক্ষ কারিগরের মাধ্যমে বুনিয়ে পত্রখানা হিন্দুস্থানীয় মিশনের জনৈক শেখ আবদুল হক নামক এক নবদীক্ষিত মুসলিম ব্যক্তির হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি (আবদুল হক) যেন উক্ত রুমালখানা শেখ আবদুর রহিম হায়দারাবাদীকে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি (হায়দারাবাদী) যেন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়ে রুমালটি শায়খুল হিন্দের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু আবদুল হক পত্রখানা হায়দারাবাদীকে না দিয়ে জনৈক আল্লাহ নেওয়াজ খানের পিতা খান বাহাদুর হক নেওয়াজ খান নামক অন্য এক ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেন।

খানবাহাদুর তার প্রতি বৃটিশ সরকারের অধিক কৃপা দৃষ্টির প্রত্যাশায় উক্ত রুমালখানা বৃটিশ গোয়েন্দা প্রধান স্যার মাইকেল এডওয়ার্ডের হাতে দেওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ সরকার বৃটিশ বিরোধী এই নতুন কূটনৈতিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অবগত হয়।

দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত বৃটিশ বাহিনীর উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করার আশা নস্যাৎ হয়ে যায়। যদিও যুদ্ধের তারিখ নির্ধারিত ছিলো, কিন্তু পূর্ব ঘোষণা মতে নতুন আদেশ আসার পূর্বে যুদ্ধ আরম্ভ না করার নির্দেশ ছিলো। তাই নির্ধারিত তারিখে কোন সেন্টার থেকেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি এবং বৃটিশ সরকারও রেশমী পত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের তারিখ জানতে পেরে ১৯১৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর আগে আগে বিপ্লবী লিডারদেরকে গ্রেফতার করে ফেলে।

অন্যদিকে তুরস্ক সরকার কর্তৃক তুর্কীর ওসমানী খলিফা আবদুল হামিদ এর বরখাস্তকে কেন্দ্র করে ধূর্ত ইংরেজ সরকার তুর্কী গভর্নর শরীফ হোসেনের মাধ্যমে মক্কা মোয়াজ্জমায় সমস্ত তুর্কীদেরকে কাফের ফতুয়া দেয়ার এক ষড়যন্ত্র খাড়া করে এবং আরব জাতির নেতা বানানোর লোভ দেখিয়ে শরীফ হোসেনের মাধ্যমে আরব জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে।

১৯১৭ সালে শায়খুল হিন্দ দেওবন্দী (রহঃ) তাঁর সফরসঙ্গীগণ সহ মাল্টার দ্বীপে অন্তরীণ ঃ

বিশ্বাসঘাতক শরীফ হোসেনের ইঙ্গিতে মক্কায় অবস্থানরত রেশমী আন্দোলনের নেতা শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহঃ) দেওবন্দী হতেও তুর্কীদেরকে কাফের ফতুয়ার আবেদন পত্রে সত্যায়ন চাওয়া হয়। শায়খুল হিন্দ (রহঃ) ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দানে গ্রহণযোগ্য কারণে অস্বীকৃতি জানালে উহাকে কেন্দ্র করে বাস্তবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে বৃটিশের দালাল গভর্নর শরীফ হোসেনের এক আদেশ বলে ২৪শে সফর ১৩৩৫ হিজরী ১৯১৬ ইং এর ডিসেম্বরে শায়খুল হিন্দ ও তাঁর সাথীবৃন্দ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা ওযায়ের গোল (রহঃ), মাওলানা হাকীম সরত হোসেন (রহঃ), মাওলানা ওহিদ আহমদ (রহঃ) বন্দী হন। একমাস জেদ্দায় থাকার পর ১২ই জানুয়ারী ১৯১৭ খৃঃ মিশরের 'জিয়াহ' জেলে তাঁদের স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সোপর্দ করা হলে ২৪শে রবিউস সানী ১৩৩৫ হিঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ ইংরেজীতে তাঁরা ভূমধ্যসাগরস্থ মাল্টা দ্বীপের উদ্দেশ্যে হেজাজ ত্যাগ করেন।

শায়খুল হিন্দ বন্দী হবার পর ভারতে এক বিরাট কম্পন সৃষ্টি হয়। সর্বমহল থেকে তাঁকে মুক্তির দাবী উত্থাপন হয়। ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যে 'আঞ্জুমানে এয়ানতে নজরে বান্দানে ইসলাম' নামে একটি সংস্থা খুলে সারাদেশে তার শাখা খোলেন। ৬ই নভেম্বর ১৯১৭ সালে মাওলানা হাফেজ আহমদের নেতৃত্বে ১৫ জন দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষকসহ ওলামায়ে দেওবন্দের একটি ডেপুটিশন 'স্যার জেমস মিষ্টান' এর নিকট মাওলানা শায়খুল হিন্দের মুক্তির জন্য মৌখিক ও লিখিত দাবী জানান। গভীর তদন্তের পরও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী প্রমাণের খোঁজ না পাওয়ায় এবং খেলাফত পার্টির দাবীর চাপে অবশেষে তাঁকে তাঁর সাথীবৃন্দসহ সাড়ে তিন বৎসর মাল্টা দ্বীপে বন্দীজীবন অতিবাহিত হবার পর যুদ্ধের অবসান্তে মুক্তি দেয়া হয়।

মুক্তির পর ১৯২০ সালের ৮ই জুন তারিখে তিনি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করলে দিল্লি, লাক্ষ্ণৌ, আমরুহা ইত্যাদি থেকে দলে দলে যেমন

তাঁর সম্মানে বিজয়ী মিছিল আসতে থাকে, তেমনি ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন—এম. কে. গান্ধি, মাওলানা আবদুল বারী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ হযরতের সম্মানে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে আসেন। দেশে ফিরেই ভারত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ ইং ১৩৩৭ হিজরীতে ওলামায়ে দেওবন্দ ও সর্বভারতীয় ওলামাগণ দ্বারা গঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ'এর সভাপতি নিযুক্ত হন এবং খেলাফত তথা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করেন।

১৯২০ সালে শায়খুল হিন্দের ইন্তেকাল ঃ

৩০শে নভেম্বর মঙ্গলবার ১৯২০ ইং স্বাধীনতার এই বীরপুরুষ ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ)

ইন্তেকালের সময় তিনি যে কথাটুকু উচ্চারণ করেন তা ছিল ঃ "মৃত্যুতে তো কোন আক্ষেপ নাই, কিন্তু আফসোস যে, আমি বিছানার উপর মরছি। আকাংখা তো এই ছিল যে, আমি জেহাদের ময়দানে থাকতাম এবং আল্লাহর কথা বুলন্দ করার অপরাধে আমাকে টুকরা করা হতো।"

এরপর আট বার আল্লাহ, আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করার পর স্তব্ধ হয়ে যান। যুক্ত প্রদেশের গভর্নর 'স্যার স্পিন ষ্টন' বলেছিলেন—"এ ব্যক্তিকে যদি পুড়ে ছাইও করা হয়, তাঁর ছাই পর্যন্ত যে গলিতে ইংরেজ থাকে সে গলি দিয়ে অতিক্রম করবে না।"

তিনি আরো বলেন—"এ ব্যক্তিকে যদি টুকরা টুকরাও করা হয়, তাঁর প্রত্যেক টুকরা হতে ইংরেজ বিরোধী শত্রুতা ঝরতে থাকবে।"

অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসান্তে মাওলানা সিন্ধী (রহঃ)ও আফগানিস্তানে বৃটিশের ইংগিতে বন্দী হন। মুক্তির পর স্বাধীনতার আশায় তিনি এশিয়ার নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। সাত বৎসর কাবুলে, সাত মাস মস্কোতে, তিন বৎসর আংকারায় এবং বার বৎসর মক্কায়, মোট পঁচিশ বৎসর বাইরে কাটিয়ে ১৯৩৯ইংরেজীতে ভারতে ফিরে আসেন এবং স্বাধীনের তিন বৎসর আগে ১৯৪৪ সালে ৭২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি)

আযাদী আন্দোলনের আখেরী নেতা মাওলানা মাদানী (রহঃ) ঃ

শায়খুল হিন্দের ওফাতের পর তাঁরই সুযোগ্য সাগরিদ মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) (শায়খুল হাদীস, দেওবন্দ মাদ্রাসা) আন্দোলনটির নেতা নির্বাচিত হন এবং তাঁর আমলেই বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে এবং স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

ভারত স্বাধীনতার মূল নেতৃবৃন্দ আলেম সমাজ

ভারত স্বাধীনতার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ মুহাদ্দেস হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ), তাঁর বংশধর ও তাঁর সিলসিলাভুক্ত ওলামায়ে দেওবন্দীগণই, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস ইত্যাদি নয়।

১. কারণ, ১৭৩১ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম তিনিই বৃটিশ বিরোধী আজাদী আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন।

২. পরবর্তীতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাদ্দেস শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' শত্রু কবলিত দেশ ফতুয়া দেওয়াতে আজাদী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

৩. তাঁর এ ফতুয়ার বাস্তবায়নের জন্য তাঁর নির্দেশেই তাঁর খলিফা মাওলানা সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলবী, মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী (রহঃ) প্রমুখের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়। ১২৪৬ হিজরী সালে তাঁরা বৃটিশ মিত্র শিখ রাজ্যের বালাকোট নামক স্থানে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

৪. পরবর্তীতে তাঁদেরই তৈরীকৃত অবশিষ্ট মুজাহিদ বাহিনী ঐতিহাসিক 'ইয়াগিস্থান'কে কেন্দ্র করে সেখান থেকে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ ও তৎপরতা সর্ব সময়েই জারী রাখেন।

৫. ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনে (প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ) হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ)এর নেতৃত্বে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক 'শ্যামল ও থানাভবনে' বৃটিশ সেনার বিরুদ্ধে জেহাদ করে প্রথম দিকে জয়যুক্ত হন।

৬. শেষের দিকে পরাজিত হবার পর ১২৮৩ হিজরী ১৮৬৬ ইংরেজীতে

আজাদী আন্দোলনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অন্তরালে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ একটি বিরাট মজবুত কিল্লা তৈরী করেন।

৭. ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শ্যামলী যুদ্ধের সিপাহসালার মাওলানা কাসেম নানুতবী দেওবন্দীর সুযোগ্য শাগরিদ 'দারুল উলুম দেওবন্দ' কিল্লারই এক সিংহমানব শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) তাঁর রাজনৈতিক সাথীদের নিয়ে ভারত আজাদীর জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেন যা ইতিহাসে 'রেশমী চিঠির আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ।

৮. ১৯১৫ সালের পূর্বের বড় বড় সমস্ত বিপ্লবী নেতাগণ শাইখুল হিন্দেরই আজাদী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই বিভিন্ন যুদ্ধকেন্দ্রে কাজ করতেন। যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ইতিহাস তাঁকে ভুলে গেছে এবং স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী নেতারাও তাঁর স্মরণ করেন না।

আযাদীর জন্য ১৯১৮ সালের 'খেলাফত আন্দোলন' সংগঠনটি যদিও বা দৃশ্যতঃ অদেওবন্দী তথা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আজাদ, ডাঃ আনসারী, হাকীম আজমল খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, কিন্তু বাস্তবে শাইখুল হিন্দেরই উদ্ভাবিত। কেননা খেলাফত কমিটির নেতৃবৃন্দ সবাই শাইখুল হিন্দের আযাদী আন্দোলনের সদস্য ছিলেন এবং তাঁরা তাঁরই রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় রাজনীতির ময়দানে জড়িয়ে পড়েন। মোদ্দাকথা এর সবাই তাঁর রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। কাজেই তাঁদের প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁরই কাজ বিবেচিত হবে। ইহা ছাড়াও 'খেলাফত কমিটি'তে অনেক ওলামায়ে দেওবন্দী এবং তলাবায়ে দেওবন্দীও সক্রিয় জড়িত ছিলেন।

৯. কংগ্রেস নেতা করম চাঁদ মহাত্মা গান্ধীও হযরত শাইখুল হিন্দ দেওবন্দী (রহঃ)এর আযাদী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সেহেতু নীতিগতভাবে কংগ্রেসের যাবতীয় রাজনৈতিক অবদান শাইখুল হিন্দেরই অবদানে পরিগণিত হবে।

১০. 'খেলাফত আন্দোলন' মূলত নন–কোঅপারেশন মুভমেন্ট (অসহযোগ আন্দোলন) এর মধ্য দিয়েই চাঙ্গা হয়। আর নন কো অপারেশন মুভমেন্ট জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের তৎকালীন সভাপতি 'শাইখুল হিন্দ'এর ফতুয়া মতে জমিয়তের পাঁচশত ওলামার দস্তখতেই পাশ হয়। এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকেও খেলাফতের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রথমতঃ মহাত্মা গান্ধী, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত কংগ্রেসী তা মেনে নিলে পরবর্তীতে দৃশ্যতঃ এ অসহযোগ আন্দোলনটি কংগ্রেসেরই বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। ফলে এ অসহযোগ আন্দোলনের কারণেই বৃটিশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং কংগ্রেসের সমস্ত অবদানের কেন্দ্রবিন্দু অন্য কথায় ভারত আযাদীর বড় নেতা শাইখুল হিন্দ দেওবন্দী (রহঃ)কেই বলতে হবে।

১১. আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক হলো জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ। ১৩৪৫ হিজরী ১৯২৬ ইং সালে জমিয়তের কলকাতা অধিবেশনে ওলামায়ে দেওবন্দীর মাধ্যমেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হয়। অতঃপর ১৩৪৬ হিজরী ১৯২৭ ইং সালে জমিয়তের পেশোয়ার সভায় স্বাধীনতার কথা পূর্ণব্যক্ত করা হয়। এর তিন বৎসর পর কংগ্রেস তার লাহোর সভাতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে।

ইহা ছাড়াও কংগ্রেসের অস্তিত্ব মূলতঃ ভারতকে বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করা ছিল না। বৃটিশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব–অভিযোগ ও দাবী–দাওয়া জানানোর উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান 'এলান অক্টেভিয়ান হিউমের' পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার 'উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের' সভাপতিত্বে ১৮৮৫ ইং সালের ২৮শে ডিসেম্বর দু'জন মুসলিম ৭৮ জন হিন্দু নিয়ে বোম্বাইতে গঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেসের নীতি বৃটিশ সরকারের পূর্ণ আনুগত্যই ছিল। ভারত জমিয়তের নেতা মাওলানা আসআদ মাদানীর বর্ণনা মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আযাদীর জন্য শাইখুল হিন্দ (রহঃ) সর্ব জাতীয় একটি ঐক্যফ্রন্টের চেষ্টা করেন। এ উপলক্ষে তিনিই বৃহৎ স্বার্থে গান্ধীকে জনগণের নিকট পরিচয়

করিয়ে দেন। এবং (হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কৌশলগত কারণে) তাকে ঐ সময় লিডার নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়াও মুসলমানদেরই অর্থে তাঁকে ঐক্যের লক্ষ্যে সমগ্র ভারতবাসীদের নিকট পরিচয় করানো হয়।

তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস ইংরেজদেরই দল ছিল। মুসলমানেরাই তাকে সেকুলার বানিয়েছেন এবং মুসলমানেরাই গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী উপাধি দিয়েছেন। যাতে তার উসিলায় হিন্দুরা ইংরেজদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায় এবং আযাদীর জন্য লড়াই করে। —দারুল উলূম কি তারীখে সিয়াসাত ইত্যাদি।

অপর দিকে ১৩২৭ হিজরী ১৯০৯ ইং সালে ওলামায়ে দেওবন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'জমিয়তে আনসার' সংগঠনটি এবং ১৯১৯ সালে ২৮ ডিসেম্বর অমৃতসরে মাওলানা আবদুল বারীর নেতৃত্বে মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' সংগঠনটি কখনো ইংরেজদের স্বপক্ষে যায়নি। ওলামায়ে হিন্দ ও দেওবন্দীদের এই সংগঠনগুলো ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আযাদীর জন্য নানা কৌশলে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত পাঠ্য ইতিহাসের পাতায় ওলামাদের এ অবদানগুলোর কোন আলোচনাই নেই।

পাকিস্তান কায়েমে ওলামায়ে দেওবন্দীগণের ভূমিকা

১৯৫৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যখন 'মুসলমান এক স্বতন্ত্র জাতি' মতবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন তখন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী (রহঃ)এর ইঙ্গিতে তাঁর খোলাফাগণ ঐ আন্দোলনের কামিয়াবীর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরই অন্যতম খলিফা পাক–ভারতের স্বনামধন্য আলেম বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী দেওবন্দী (রহঃ) পাকিস্তান কায়েম আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন এবং প্যাকিস্তান কায়েমের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে কলকাতায় মুহাম্মাদ আলী পার্কে 'নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' সংগঠনটির সভাপতি নিযুক্ত হন। পাকিস্তান হবার পর তাতে ইসলামী হুকুমাত বা কুরআন সুন্নাহর আইন

প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আমরণ অক্লান্ত সংগ্রাম করেন। পাকিস্তান সমর্থনের কারণে মাওলানা ওসমানী ও তাঁর সহযোগী পাকিস্তান কায়েমের পক্ষপাতি ওলামাগণ ভারত হতে পাকিস্তানে হিজরতের কষ্টও স্বীকার করেন।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ সাহেব মারা গেলে দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক প্রধান মুরুব্বী মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী দেওবন্দীই তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্টে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে পাকিস্তানী জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করেন মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী দেওবন্দী (রহঃ)। আর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী দেওবন্দী (রহঃ)। যিনি মাওলানা থানভী (রহঃ)এর ভাগ্নে ও বিশিষ্ট খলিফা।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেওবন্দী আলেম সমাজ পাকিস্তানে ইসলামী আইন জারী করার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং যুগে যুগে তাঁরা আংশিক কামিয়াবও হয়ে আসছেন। জমিয়ত প্রধান ও পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম সদস্য মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর উসিলায়ই মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাব পাশ হয়। বর্তমানে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বহুলাংশে কায়েম হবার কৃতিত্ব দেওবন্দী আলেম সমাজেরই বেশী।

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে সর্ব বিরোধী দলীয় যে জোট গঠিত হয় সে জোটটির প্রধান ছিলেন মুফতি মাহমুদ। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা হতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি একসময় পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর দলটি পাকিস্তানে অতীত থেকে সত্যিকার বলিষ্ঠ ইসলামী দল হিসাবে পরিগণিত। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম হাজরভীসহ পাকিস্তানে দেওবন্দীদের রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক অনেক সংগঠন আছে। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা ওসমানী, মাওলানা জাফর আহমদ, মাওলানা মুফতী শফী, মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী, মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী, মুফতী মাহমূদ, মাওলানা আবদুল্লাহ দরখাস্তী,

মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জালন্ধরী, মাওলানা গোলাম গাউস হাজরভী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা ফজলুর রহমান, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাওলানা তকী উসমানী প্রমুখ দেওবন্দী উলামাগণ পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা ছিলেন ও আছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনগুলোতে দেওবন্দী উলামাগণ জড়িত আছেন। প্রত্যেক নির্বাচনেই তাঁরা বহু আসনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন। গত ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে যেখানে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ১টি পেয়েছে সেখানে দেওবন্দীদের 'জমিয়তে ওলামা' ১২টি সিট লাভ করে।

মুসলিম লীগ সরকার ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমে গড়িমসি, আইয়ুব সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইন, ডঃ ফজলুর রহমানের ইসলামকে আধুনিকিকরণ, গোলাম আহমদ পারভেজদের হাদিস অস্বীকার ফিতনা, জাফরুল্লাহ্ খানদের কাদিয়ানী ফিতনা, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও কমিউনিষ্টদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র, সিয়ারিজম ফিতনা, বেদায়াতী ফিতনা ইত্যাদির মুকাবেলা ও দমনে পাকিস্তানের দেওবন্দী উলামাগণ সব সময়ই সোচ্চার এবং প্রকারভেদে বাতিলের যেভাবে মুকাবিলা করার প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই মুকাবিলা করে যাচ্ছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি অসংখ্য ধর্মীয় পত্রিকা ও কিতাবাদীর মাধ্যমেও তাঁরা জাতিকে ইসলাম সম্বন্ধে অবগত ও বাতিল মতবাদের নানা স্বরূপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক সংকেত দিয়ে আসছেন।

'দেওবন্দী উলামাগণের নজীরবিহীন অবদান' নামক শিরোনামে যে সমস্ত অবদানের কথা উল্লেখ হয়েছে পাকিস্তানী দেওবন্দী উলামায়ে কেরামগণও উহার প্রায়গুলোর অংশীদার।—নকশে হায়াত, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম কি তারীখে সিয়াসত, দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ, ইত্যাদি।

মাওলানা মাদানী (রহঃ) হতে ডঃ ইকবালের সমালোচনা প্রত্যাহার

মরহুম আব্বাস আলী খান বিরচিত 'মাওলানা মওদুদী' নামীয় জীবন চরিতে 'মাওলানা মাদানীর জাতীয়তাবাদ' অধ্যায়ে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর প্রতি দোষারোপ তথা কটাক্ষ করতে গিয়ে খান সাহেব আল্লামা ইকবাল মরহুমের কবিতার সূরে একটি তীব্র সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন যে, মরহুম মওদূদী কর্তৃক লিখিত 'মাছয়ালায়ে কাওমিয়াত' নামীয় গ্রন্থে মাদানী (রহঃ)এর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তথা এক জাতীয়তাবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করায় মরহুম মওদুদীর প্রতি মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর আক্রোশের মূল কারণ। এ বিষয়ে তিনি (খান সাহেব) তাঁর ভাষায় লেখেন— "বলা বাহুল্য, ডঃ ইকবালের কয়েক ছত্র কবিতা যদিও মরহুম মাদানী সাহেবের মতবাদকে কষাঘাত করলো, তথাপিও তা 'একজাতীয়তা' মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।"

তাই ভ্রান্ত এক জাতীয়তাবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য মরহুম মওদূদী উল্লেখিত 'মাছয়ালায়ে কাওমিয়াত' পুস্তিকাটি লিপিবদ্ধ করেন। এর পর খান সাহেব লিখেন, মাওলানা মওদুদীর প্রতি মাওলানা মাদানীর অন্ধ আক্রোশের এটাই মূল কারণ। এই আক্রোশকে ভিত্তি করেই মাওলানা মাদানী পরবর্তীকালে মাওলানা মওদুদীর উপরে আমরণ ফতোয়াবাজীর মেশিনগান থেকে অমূলক, ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক অভিযোগ টেনে রোষানল প্রজ্জ্বলিত ফতোয়ার গোলাবর্ষণ করেছেন। ততোধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, মরহুম মাদানী সাহেবের অনেক শিষ্য শাগরিদ, যাঁরা 'ওলামায়ে দ্বীন' হিসাবে পরিচিত ওস্তাদের অনুসরণ করে মাওলানা মওদুদীর অন্ধ বিরোধিতায় মেতে ওঠেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মাওলানা মাদানী সহ তাঁর শিষ্য শাগরিদগণ পাকিস্তান সৃষ্টিতে চরম বাধাদান করেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে যে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে তা হলো ঃ

* ডঃ ইকবাল কবিতার ভাষায় মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন।

* মাওলানা মাদানী (রহঃ) নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই মরহুম মওদুদীর অন্ধ বিরোধিতায় নিমগ্ন ছিলেন।

* মরহুম মওদুদীর বিরোধিতা শুধুমাত্র মাওলানা মাদানী (রহঃ) ও তাঁর শিষ্য শাগরিদরাই করেছেন—অন্য কেউ না।

* মাওলানা মাদানী (রহঃ) ও তাঁর শিষ্য শাগরিদরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করেছেন।

আসুন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। সূধী পাঠকমণ্ডলী, মরহুম আব্বাস আলী খান তার রাজনৈতিক গুরুর মূল দোষটি ধামাচাপা দেওয়ার লক্ষ্যেই সে বিড়ালের মল ঢাকার মত কল্পিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন একটি কারণকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সবার সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। তা নিম্নের আলোচনা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একথা আব্বাস আলী খান সাহেবের লিখাতেই ফুটে উঠেছে। মাওলানা মাদানী (রহঃ) ভারত উপমহাদেশের একজন সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ইসলামের খাদেম। যিনি দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষক হিসাবে সুনামের সহিত শিক্ষাদান কাজ চালিয়ে এসেছেন। তিনি যে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের জাতীয়তার ব্যাখ্যায় ভুল করবেন বা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কিংবা বিদ্বেষবশতঃ মওদুদীর বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী চালাবেন এটা তাঁরা কখনই মেনে নিতে পারেন না যারা তাঁর জীবন চরিত হায়াতে মদনী (রহঃ) কিতাবখানা পাঠ করেছেন বা তাঁর সহচার্যে কিছুদিন কাটিয়েছেন।

যা হোক আব্বাস আলী খান তাঁর কেতাবে ডঃ ইকবালের লিখা কবিতার মর্মার্থে মাওলানা মাদানী (রহঃ)কে যে কষাঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন তা আংশিক সত্য হলেও পরবর্তীতে বাস্তব বিষয় অবগত হয়ে ডঃ ইকবাল যে দুঃখ প্রকাশ সহ মাওলানা মদনীর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তাও বাস্তব সত্য। কাওম ও মিল্লাত এ দু'টি শব্দের কোন শব্দটি মাওলানা মাদানী (রহঃ) উচ্চারণ করেছেন তা নিয়েই যে এ বিতর্কের অবতারণা হয়েছে তা নিম্নের বর্ণনা হতে পাওয়া যাবে।

১৯৩৮ খৃঃ 'পুল বেনগশের' নিকট রাত্রিবেলায় শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "কেহ আজ কাল আকওয়াম ওয়াতনছে বনতী হেঁ, মাযহাব ছে নেহী বনতী।"

অর্থাৎ, বর্তমানে কাওম দেশ দিয়ে গঠিত হয়। ধর্ম দিয়ে নয়। উক্ত সভায় ভারতীয় পত্রিকা 'আল আমান' এর রিপোর্টারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৌলভী মুজহের উদ্দিন শেরকুটীকে সভার সমস্ত রিপোর্ট শুনান। মুজহের উদ্দিন শেরকুটি মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর গুরুতর বিরোধী ছিলেন, তিনি আল্লামা ইকবালের নিকট যিনি ঐদিন লাহোর থেকে দিল্লী এসেছিলেন বললেন যে, আজ রাতের সভায় মাওলানা মাদানী বলেন যে, 'মিল্লাতী ওয়াতনছে বনতীহেঁ। অর্থাৎ মিল্লাত (ধর্মভিত্তিক জাতি) দেশ দিয়ে গঠিত হয়।

এই থিউরী যেহেতু আল্লামা ইকবালের বিপরীত ছিলো সেহেতু তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মাওলানা মাদানীর উপর ৩টি কবিতার মাধ্যমে মারাত্মক ভাষায় সমালোচনা করেন ঃ

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ ؛ ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بوالعجبی ست
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن ست ؛ چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست
بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست ؛ اگر باو نرسیدی تمام بولہبی ست

অর্থাৎ,
বোঝেনি ঐ আজমবাসী দ্বীনের মর্ম বিরহতা,
দেওবন্দে তাই তো হুসেন আহমদ কন আজব কথা।
ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয় এই কথা ফের গান যে তিনি।
বোঝেন নি হায় নবীর মকাম আল–আরাবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও নিজেকে—এই দ্বীনের দাবী ;
পৌঁছাতে না পারো যদি সবই–ই হবে বু–লাহাবী।

—ফররুখ আহমদ

ইকবালের এ কবিতাগুলো যখন হযরত মাদানীর দৃষ্টিগোচর হয় তখন তিনি পত্র–পত্রিকায় প্রচার করেন যে,

আমি আমার বক্তব্যে কাওম শব্দ ব্যবহার করেছি। মিল্লাত শব্দ নয়। হযরত মাদানী এর বিবৃতি পত্রিকায় আসার পর জনাব ইকবাল আহমদ সোহেল ডঃ ইকবালের উক্ত কবিতাগুলোর জবাবে (যাচাই না করে মন্তব্য করার দরুন) মারাত্মক ভাষায় ষোলটা কবিতার মাধ্যমে ইকবালের কঠোর সমালোচনা করেন। মাওলানা মাদানীর বিবৃতি ও ইকবাল আহমদ সোহেলের কবিতাগুলো যখন আল্লামা ইকবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তখন তিনি 'মদীনা বজনুর পত্রিকায় মার্চ ১৯৩৮ খৃঃ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)এর বিরুদ্ধে লিখিত কবিতাগুলোর ব্যাপারে মাওলানা মাদানীর নিকট ক্ষমার প্রার্থী হন। আল্লামা ইকবাল তার ভাষায় বলেন ঃ

کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے غلط خبر پہونچی تھی جس کی وجہ سے میں نے بر افروختہ ہو کر ان پر سخت تنقید کی اب اصل حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی ہے اس لئے میں مولانا مدنی سے خواستگار معافی ہوں امید کہ مولانا مجھے معاف فرما دیں گے

অর্থাৎ বাস্তবেই আমার থেকে ভুল হয়ে গেছে। আমার নিকট ভুল খবরই পৌছেছে। যদ্দরুন আমি রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর মারাত্মক সমালোচনা করেছি। এখন বাস্তব ঘটনা আমার নিকট পরিস্কার হয়ে গেছে। বিধায় আমি মাওলানা মাদানীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি যে, মাওলানা মাদানী আমাকে ক্ষমা করবেন। –—দিল্লীর মাসিক বোরহান, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৬৪ ইং এর উদ্ধৃতিতে করাচীর মাসিক বাইয়্যিনাত রজব সংখ্যা ১৪০৭ হিঃ মোতাবেক এপ্রিল ১৯৮৭ ইং।

মোটকথা মাওলানা মাদানী (রহঃ) তাঁর ভাষণে বলেছেন বর্তমানে দেশ দিয়ে কাওম হয়। অর্থাৎ দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক কাওম বা জাতি হয়। কোরআন মজিদ এবং হাদীসেও এক দেশীয় এবং বিভিন্ন

ধর্মাবলম্বীদের উপর কাওম শব্দটি বহু স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। মাওলানা মাদানী (রহঃ) ঐ ভাষণে এই কথা বলেননি যে, মিল্লাত দেশ দিয়ে গঠিত হয়। মিল্লাত অর্থ ইসলামী পরিভাষায় ধর্মভিত্তিক জাতিকেই বুঝায়। অর্থাৎ তিনি একথা বলেননি যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় নাগরিক এক মিল্লাত বা (ধর্মভিত্তিক) একজাতি। বরং একথা বলেছেন, এক দেশের সব ধর্মাবলম্বী নাগরিক এক কাওম বা দেশভিত্তিক জাতি যা কোরআন হাদীসেও উল্লেখ আছে।

ডঃ ইকবালকে শুনানো বাক্যে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর উচ্চারিত কাওম শব্দ না শুনিয়ে, মিথ্যা মিথ্যি উহার স্থলে মিল্লাত শব্দ শুনানো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তাই তো ইকবালের কবিতাগুলো এবং তার অনুবাদে মিল্লাত শব্দটিই দেখা যাচ্ছে কাওম শব্দ নয়। আর এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ বসানো হলে অনেক সময় অর্থের মারাত্মক বিকৃতি ঘটে এবং আকাশ পাতালের ব্যবধান হয়ে যায়। ইকবালের এই ক্ষমা প্রার্থনা ৫ই মার্চ ১৯৩৮ইংরেজীতে প্রচার হয়েছে। আর তাঁর ওফাত হয় ২০ এপ্রিল ১৯৩৮ইংরেজীতে। বর্তমান কুল্লিয়াতে ইকবালের 'আর মগানে হেজাজে' ইকবালের উক্ত কবিতাগুলো ছাপানো আছে। তাঁর ছাপানো কুল্লিয়াতে ইকবাল পুস্তিকাটি তার ওফাতের পরই ছাপানো হয়েছে। পরে সমালোচনা প্রত্যাহারের পর তাঁর ঐ কবিতাগলো ছাপানোর অপরাধ নীতিগতভাবে আল্লামা ইকবালের উপর অর্পিত হবে না বরং প্রকাশকের উপরই অর্পিত হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা বুঝা গেল যে, ডঃ ইকবাল কবিতার ভাষায় মাওলানা মাদানী (রহঃ)কে যে কটাক্ষ করেছিলেন, সঠিক তথ্য প্রকাশিত হবার পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। এর পরেও উক্ত কবিতাকে সম্বল করে যারা মাদানী (রহঃ)এর প্রতি কটাক্ষবান নিক্ষেপ করেই চলেছেন, তাদের এটি হয় ইলমী দীনতা নতুবা ইচ্ছাকৃত কুটকৌশল। পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, জামাতের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১লা অক্টোবর/৯১ এ যে সেমিনার হয়ে গেল সেখানেও অনেক বক্তার মুখেই আল্লামা ইকবালের কবিতাটি মাওলানা মাদানী (রহঃ)কে কটাক্ষ করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লামা

ইকবালের শেষের প্রার্থনাটি যদি জেনেও তারা এরূপ বলে থাকেন তবে বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি তাদের অজান্তে ইহা হয়ে থাকে তবে আমাদের আহবান তারা যেন তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে নেন। এবং 'মাওলানা মওদুদী' নামীয় পুস্তিকায় আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশের মাধ্যমে সঠিক ও বাস্তব ঘটনাকে সবার সম্মুখে তুলে ধরেন।

এবারে আসা যাক সেই অপবাদটির প্রতি যেটি খান সাহেব তার 'মাওলানা মওদুদী' নামীয় কিতাবে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর প্রতি আরোপ করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মাওলানা মাদানী (রহঃ) নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিংবা মওদুদী কর্তৃক তাঁর সমালোচনায় লিখিত 'মাছয়ালায়ে কওমিয়াত' কিতাবের কারণে বিদ্বেষী হয়ে ফতোয়ার বান ছুড়বেন এটা সঠিক নয়। বরং মওদুদী ভক্তরা মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার বানে জর্জরিত হয়ে নিজেদের ঘর সামলানোর প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক হীন স্বার্থেই এই অপবাদটির জন্ম দিয়েছেন। যদি কিছুক্ষণের জন্যও এ অপবাদটি সত্য বলে মেনে নেয়া হয় তবে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মাওলানা মাদানী (রহঃ) না হয় জাতীয়তার সংজ্ঞায় তাঁর সাথে মওদুদী সাহেবের বিরোধিতার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তার সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন কিন্তু পাকিস্তান সমর্থনকারী আল্লামা থানভী (রহঃ) এবং তাঁর সিলসিলার ওলামাগণ সহ ফুরফুরা সিলসিলাভুক্ত শর্ষিনার ওলামাগণ কেন তার সমালোচনায় লিপ্ত?

এমনকি জামাতের প্রথম সারির নেতা মাওলানা মনজুর নোমানী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আমীন এহসান এসলাহী, মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আখতার ফারুক, মাওলানা কোরবান আলী, শিবির নেতা প্রফেসার আহমদ আবদুল কাদের প্রমুখ নেতগণের মওদুদী মতবাদ ত্যাগ করার কারণ কি? এছাড়াও আহলে হাদীস সম্প্রদায় এবং রিজভী অনুসারীদের নিকটেও মওদুদী ও তার মতবাদ সমালোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে কেন? এরা কি সবাই মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর অন্ধ অনুসারী? কেনই বা মাদানী (রহঃ) তাঁর জাতীয়তার সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত পোষণকারী হযরত থানভী (রহঃ)ও তাঁর সিলসিলার ওলামাদের সমালোচনায় লিপ্ত হলেন না? কারণ একটিই,

আর তা হলো মওদুদী মতবাদের সাথে মাদানী (রহঃ)এর বিদ্বেষ ও দ্বিমত রাজনৈতিক নয় বরং ধর্মীয় মূলনীতির ভিত্তিতে। ধর্মীয় মূলনীতির ভুল বা অপব্যাখ্যায় শুধু বাধা প্রদানই যথেষ্ট নয় বরং তা কঠোর হস্তে দমন করা আলেম সমাজেরই দায়িত্ব। আর মাওলানা মাদানী (রহঃ) সে দায়িত্বটুকুই পালন করেছেন মাত্র। এ বিষয়ে তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতের জামায়াতে ইসলামীর আমীর আবুল্লেইস সাহেব কর্তৃক কতিপয় বিষয়ে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর সহিত মতবিনিময়ের জন্য একখানা পত্র লেখেন। উক্ত পত্রের উত্তরে মাওলানা মাদানী (রহঃ) যে ১৭টি কারণে মওদুদী ও তার দলের সমালোচনা করেন তার সমুদয়ই ধর্মীয়—রাজনৈতিক নয়।

১. মওদুদী নিজের বুঝে কোরআন ব্যাখ্যার পক্ষপাতি। এমনকি কোরআন বুঝার জন্য একজন প্রফেসারই যথেষ্ট মনে করেন। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত চিরদিনই সলফে সালেহীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং মহাত্মা তাবিয়ীদিগকেই নিজেদের পথিকৃৎ এবং পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করতঃ নিজের মত ও রুচিকে তাঁদের অনুকূলে উৎসর্গ করে আসছেন। নিজের বুঝে তাফসীর করা হলো ‘তাফসীর বিররায়’। এ বিষয়ে হুজুর (সাঃ)এর বাণী হলো, যে কেহ নিজের মতে কোরআনের ব্যাখ্যা করে জাহান্নামে তার ঠাঁই।” নিজের মতে কোরআনের ব্যাখ্যা কুফুর। এমন তাফসীর ঘটনাক্রমে যদি সঠিকও হয় তবুও তা ভুল, নীতি বিরুদ্ধ।

২. জনাব মওদুদী সাহেব নবী করীম (সাঃ)কে মনগড়া এবং আন্দাজ অনুমানের উপর পরিচালনাকারী মনে করেন।

৩. তিনি শিয়া রাফিযীদের মত ভুল বিকৃত এবং অসত্য বর্ণনার ভিত্তিতে সাহাবা কেরামকে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা এবং সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করেছেন। ফলে সাহাবা কেরামদের বর্ণনার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিটিই ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

৪. তিনি সাহাবাদের বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ইহাকে সাহাবাদের অতি ভক্তি প্রণোদিত বলে বর্ণনা করতে চান। যা ইসলামের সমস্ত বিষয় অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নয় প্রমাণে সহায়ক হবে।

৫. তিনি সহীহ হাদীসসমূহের রাভীকে এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামদেরকে দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্যতাহীন বলে বর্ণনা করতঃ তার বিপরীতে যয়ীফ, অথবা অশুদ্ধ বর্ণনার কদর্য, স্বার্থপর এবং প্রবৃত্তির অনুসারী দুশমনদের উক্তি পেশ করেছেন।

৬. তিনি তাকলীদে শখসী বা ইমামদের ব্যক্তিগত তাকলীদকে মারাত্মক ভুল এবং গোমরাহী বলে মন্তব্য করেন। অথচ চতুর্থ শতাব্দীর পর কোরআনের নির্দেশ সূত্রেই তাকলীদ ওয়াজিব বলে ইজমা হয়েছে।

৭. তিনি চার মাযহাবের ইমামদের তাকলীদকে গোমরাহী এবং হারাম বলে বর্ণনা করেন।

৮. তিনি প্রত্যেক প্রফেসার এমনকি সাধারণ লোকদেরকেও নিজ নিজ রুচি এবং মতানুসারে চলবার এবং মুসলমানদেরকে চলবার অবাধ স্বাধীনতা দেন তা যতই সলফে সালেহীনদের রুচি এবং মন্তব্যের বিরোধীই হোক না কেন।

৯. তিনি তাসাওউফ, সুলুক এবং তার ক্রিয়াকর্মকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, ইলহাদ, যন্দকা এবং অনৈসলামিক বিষয় বলে মনে করেন। এমনকি একে বৌদ্ধ ধর্মমতবাদ (বুদ্ধিযম) এবং যোগসাধনা বলে অভিহিত করেন।

১০. তিনি খারিজি ফেরকার মত

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

এবং

ان الحكم الالله

এর শাব্দিক অর্থের দ্বারা মুসলমানদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক এবং হক কথা না হক উদ্দেশ্যে প্রচারিত।

১১. যে পর্যায়েই হোক না কেন, ইসলামের শুরু হতে যে সমস্ত হাদীসসমূহকে দ্বীনের মূলনীতি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, চক্রালোভীদের মত তিনিও সেই হাদীস ভাণ্ডারের তুলনায় ইতিহাসের বর্ণনাকে সমধিক গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দান করেছেন।

—খেলাফত ও রাজতন্ত্র দ্রঃ

১২. কাদিয়ানী ফিরকার মত জামাত তার অধিনায়ক ও আমীরকে এমন সর্বময় ক্ষমতা দান করেছে যে, তিনি তাঁর রুচিমাফিক যেমন ইচ্ছা যে কোন হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করতে এবং যে কোন হাদিসকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারেন।

অথচ সর্বজন স্বীকৃত পুণ্য যুগেও কারও মত এবং ফায়সালার এমন লাগামহীন স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি।

১৩. তিনি সমগ্র ফিকাহ শাস্ত্র এবং ফিকাহ ভাণ্ডারকে ভুল এবং গোমরাহী বলেন এবং ইহার সংস্কার সাধন ও কাটছাট করার নির্দেশ দেন।

১৪. জামাত মু'তাযিলা, রাফেযী প্রভৃতির মত 'প্রকৃত তাওহীদের দফতর' বা জামাতে মুওয়াহিদিনে হাকীকী কামিলীনে ইসলাম ইত্যাদি বাক্য নিজেদের সাইন বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করে। এরূপ মু'তাযিলা সম্প্রদায় নিজেদেরকে 'আসহাবুল আদল, আসহাবুত্তাওহীদ' এবং শিয়ারা নিজেদেরকে 'মুহিব্বীনে আহলে বায়াত' বলতে ও লিখতে দেখা যায়।

১৫. তিনি ও তার জামায়াত আলেম সমাজ, শরীয়তের জ্ঞানের রক্ষকগণকে অভদ্র উক্তি জনসাধারণের সমক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট, চরিত্র হনন এবং অপমান, জনমানসে তাঁদের প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করে চলেছে।

১৬. তিনি ও তার দল সলফে সালেহীন এবং অতীত আওলীয়াদের সম্পর্কে কটুক্তি এবং সম্মানহানীকর ভাষা ব্যবহার করেন। এবং হুজুর (সাঃ)এর বাণী—

لعن اخرهذه الامة اولها

অর্থাৎ, "এই উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের লা'নত করবে।"

তার ও তার দলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

১৭. তিনি বলেন—হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ), শেয়খ আহমদ সরহিন্দী (রহঃ), হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) ও তাঁদের শিষ্য অনুসারী এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ), হযরত শেয়খ আঃ কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত শেয়খ শাহাবুদদীন সুহরাওয়ার্দী (রহঃ) প্রমুখ আওলীয়াগণ মুসলমানদেরকে সুফিবাদের আফিং গোমরাহী এবং

বেদ্বীনির ইনজেকশন দান করে গেছেন। (এছাড়াও তিনি আরো বলেন, বর্তমানে 'মোজাদ্দেদ যে হবে তাঁর জন্য তাছাওফপন্থীদের (সুফীদের) পোশাক–পরিচ্ছদ চাল–চলন এবং পীর–মুরীদি ও তরিকতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন সব কাজ হতে মুসলমানদেরকে এমনভাবে বিরত রাখতে হবে যেমনভাবে বহুমূত্র রোগীকে চিনি হতে বিরত রাখা হয়।

–তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন,১৩৪ পৃঃ;মদনী চরিত মাওঃ মোহাম্মদ তাহের, ভারত।

উল্লেখিত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, মাদানী (রহঃ) ব্যক্তি ও রাজনৈতিক মওদুদী বিদ্বেষী নন বরং মওদুদী সাহেব ইসলামের যে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাজেই খান সাহেবের রচিত 'মাওলানা মওদুদী' জীবন চরিতে বর্ণিত মাওলানা মাদানী (রহঃ) কর্তৃক মওদুদী বিদ্বেষের কল্পিত কারণ কল্পনাতেই শোভা পায় বাস্তবে নয়। এখানে উক্ত পত্রের শুরুতে হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) যে বর্ণনা পেশ করেন তা খান সাহেব কর্তৃক আবিস্কৃত 'মওদুদী বিদ্বেষ'এর জবাবের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এখানে উহাও সন্নিবেশিত করা হলো। মাওলানা মাদানী বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, আবার ইসলামী তাহরিক মুসলমানদের ইলম আমল, দ্বীন–দুনিয়ার কমজোরী, তাদের ছত্রভঙ্গতা নিরসন এবং ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায়ই সীমাবদ্ধ। যদিও সাংগঠনিক বা তানযীম পদ্ধতি সম্বন্ধে ছিল মতভেদ। এই জন্যই আমি এতদিন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে কিংবা কিছু লিখতে যাওয়া সমীচিন মনে করিনি। যদিও অনেক সময় জামাতের সভ্য এবং জামাতের 'কায়িদ' (নেতার) পক্ষ থেকে অশোভনীয় বাক্য, বক্তৃতা এবং লিখা জানতে পারি তবু এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই সমীচিন মনে করি। কিন্তু আজ যখন আমার সম্মুখে হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হতে প্রেরিত মওদুদী গ্রন্থাবলীর ভুরিভুরি উদ্বৃতি স্তূপিকৃত রয়েছে এবং পানি মাথার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে, তখন উত্তমরূপে তা দেখে বিচার করে এ সিদ্ধান্তে (উপরে বর্ণিত ১৭টি কারণের সিদ্ধান্ত) উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি।

সুধী পাঠকমণ্ডলী ! উপরোক্ত চিঠিতে যে ১৭টি বিষয়ে মাদানী (রহঃ) মওদুদীর বিরোধিতা করেছেন সেখানে তাঁর একজাতি তত্বের যে

বিরোধিতা করা হয়েছে সে বিষয় বা প্রসঙ্গ কি উপস্থাপন করা হয়েছে? যদি এটিই মূল কারণ হয়ে থাকে তবে প্রথমেই এ বিষয়েই তিনি প্রশ্ন করে বসতেন যে, মওদুদী সাহেব কেন আমার একজাতি তত্বের বিরোধিতা করলেন। হযরত মদনী (রহঃ)এর মূল কথাটি ঢাকবার অপচেষ্টায় যে অপকৌশল খান সাহেব গ্রহণ করেছেন তাদের এ চরিত্র এখনও অব্যাহত আছে।

সম্প্রতি মওদুদী সাহেবের নামে প্রকাশিত 'ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা' নামীয় কেতাবখানা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। উক্ত কিতাবটি মওদুদীর লিখিত বিভিন্ন কিতাব হতে সাহাবাদের কঠোর সমালোচনাকৃত অংশগুলো বাদ দিয়ে বেছে বেছে ভাল অংশগুলো চয়ন করেছেন জনাব আসেম নুমানী। অথচ নাম দেওয়া হয়েছে স্বয়ং মওদুদীর। উদ্দেশ্য এ কথাই বোঝানো যে, ছাহাবা কেরামগণের সম্পর্কে তাঁর আকীদা কত উন্নত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছাহাবাদের সমালোচনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' পুস্তিকার 'সমালোচনার জবাবে' অধ্যায়টিতে কি লিখেছেন তা লক্ষ্যণীয়।

এখানে আরো দু'টি বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মাওলানা মাদানী (রহঃ) তাঁর লিখিত উপরে বর্ণিত চিঠির ১৪ নং দফায় বহু পূর্বে বর্ণনা করেছেন যে, "আপনারা বলেন, মওদুদী সাহেবের আকীদা, ভাবধারা এবং ব্যক্তিগত মতামতের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই"।

এ কথাটি আমরা এখনও শুনে আসছিলাম। কিন্তু জামাতের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেমিনারে যখন বলা হয় "মওদুদী সাহেব ও জামাত এক ও অভিন্ন তখন সে কথার অসারতাই প্রমাণ হয় এবং সে কথাটি যে জামাত কর্মীদের ও সাধারণ মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য তা প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে। এ ছাড়াও উক্ত সেমিনারেই একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্যেও ইসলামকে আধুনিক করা হয়েছে। এ জন্যেই মাওলানা মওদুদী দাবীদার।

(আজকের কাগজ ১ম বর্ষ—২১২ সংখ্যা, ১লা অক্টোবর/৯১)

এ থেকেও প্রমাণ হয় যে মওদুদী সাহেব 'তাফসীর বিররায়ের' মাধ্যমে ইসলামকে নতুন ও আধুনিকরূপে উপস্থাপন করেছেন বলে ওলামা হুজুরগণ পূর্ব হতেই যে কথা বা অভিযোগ বর্ণনা করে আসছেন তা

সঠিক। অথচ জামাত নেতাগণ পূর্বে তা স্বীকার করতেন না।

একথা যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর সহিত জনাব মওদুদীর বিরোধ রাজনৈতিক বা জাতীয়তার সংজ্ঞার বা ব্যাখ্যার তারতম্যের জন্য নয় বরং ধর্মীয়। কাজেই তাঁর শিষ্য–সাগরেদগণ যাঁরা ওলামায়ে দ্বীন হিসাবে পরিচিত তাঁরা যে ওস্তাদের অনুসরণেই মওদুদীর অন্ধ বিরোধিতা করে আসছেন বলে জনাব খান সাহেব অপবাদ দিয়েছেন তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও মাওলানা মাদানী (রহঃ) পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন কেন?

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যখন 'মুসলমান এক স্বতন্ত্র জাতি' মতবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিল, তখন অধিক সংখ্যক দেওবন্দীগণ শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ 'জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের' নেতৃত্বাধীনে অখণ্ড ভারতের স্বপক্ষে পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করছিলেন কেন? (৪৬এর নির্বাচনে এ দল শতকরা ১৬টি আসন লাভ করে।) এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে—

প্রথমতঃ দেওবন্দীগণের মতে পাকিস্তান দাবী সমগ্র ভারত উপমহাদেশকে মুসলিম দেশে পরিণত করার পরিপন্থী ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ দেওবন্দীগণ সারা অখণ্ড ভারতকে মুসলিম শাসনাধীন আনয়নে সুনিশ্চিত ছিলেন। কেননা, এক আল্লাহর উপর ঈমান বা বিশ্বাসের অভাবে পৌত্তলিক হিন্দুরা প্রভু ভক্তি ও আনুগত্যের বিশ্বাস করে। ফলে তারা মুগল সম্রাটদেরকে যেমন 'দিল্লীশ্বরো, জগদিশ্বরো' বলে সম্বোধন করতে অভ্যস্ত ছিলো, তেমনি ব্রিটিশরাজ ভারত সম্রাটকে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে তাদের ভাগ্যবিধাতারূপে স্বীকার ও গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলো এবং তাদের সে স্বীকৃতি হিন্দু ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ব্রিটিশরাজ' ভারত সম্রাটের গুণকীর্তনবাহী গীত হিন্দু ভারতের জাতীয় সংগীতের সম্মান লাভ করে।

তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কখনও ইসলামী শাসনতন্ত্র হতে পারবে না। কারণ, যারা পাকিস্তানের ধোয়া তুলে ইসলামী রাষ্ট্রের নামে সাধারণ মুসলমানদের মাতিয়ে তুলেছেন, তারা নিজেরাই ইসলামের ধার ধারেন না, এমন কি লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ স্বয়ং জিন্নাহ সাহেবের ভাবধারা পর্যন্ত ইসলাম বিরুদ্ধ। পার্লামেন্টে এবং অন্যত্র তার বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় তারা যে সত্য–সত্যই ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণের জন্য এই পরিকল্পনা পেশ করেছেন, শ্লোগান তুলেছেন, কোন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিই এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। যারা পদে পদে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে চলেছেন, তারা যে ইসলামের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র, উদগ্রীব, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

চতুর্থতঃ পাকিস্তান হিন্দুস্তান হতে আলাদা হওয়ার কারণে হিন্দুস্তানে বসবাসকারী মুসলমানগণ যত অসহায় অবস্থা অনুভব করেছে, অখণ্ড ভারতে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা হতো এর বিপরীতে অনেক শক্তিশালী। ভারতীয় হিন্দুরা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটাধিকার বলে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করবে ভীতিও অনেকটা অহেতুক ছিলো। এ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক লড়াই মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতো। কারণ, হিন্দু মুসলিম জিহাদে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি সতেজ ও শক্তিশালী হওয়ার এবং প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনার কারণে তাদের জয় হতো অবশ্যাম্ভাবী ও সুনিশ্চিত।

পঞ্চমতঃ পৌত্তলিক ভারতীয় হিন্দুদের মক্কায় পৌত্তলিকদের সাথে তুলনা করা যায়। মক্কার যে সমস্ত পৌত্তলিকদের অত্যাচারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছিলেন সেই সমস্ত পৌত্তলিকরা অবশেষে তাদের ধর্মের অসারতা বুঝতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। অপরপক্ষে ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী ঈহুদী ও খৃষ্টানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে চেনার পরও কিছুসংখ্যক ব্যতীত তাঁর উপর ঈমান না আনার নীতি অবলম্বন করে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের চিরশত্রুরূপে নিজেদের চিহ্নিত করে রেখেছে। পৌত্তলিক হিন্দুদের তাওহীদভিত্তিক ঈমান না

থাকায় তারা ঈমানদার মুসলমানদের সামনে নৈতিক এবং শারীরিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল। ফলে খৃষ্টান ইংরেজদের ভারত ত্যাগের পর পৌত্তলিক হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করার প্রত্যাশা অমূলক ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দু সমাজের পক্ষে ইসলামের সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মোকাবেলায় টিকে থাকা অসম্ভব হতো।

ষষ্ঠতঃ ভারতের নেতৃত্ব কখনও হিন্দুদের হাতে ছিলো না। মুসলমানদের ভারত আগমনের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নেতৃত্ব একমাত্র মুসলমানদের হাতেই ছিলো। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনও মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ Divide And Rule Policy (বিভক্ত করে শাসন করার নীতি) অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস দল গঠন করে ভারতীয় হিন্দুদের প্রথমবারের মত হাতে খড়ি দেয়। ইহার পূর্বে হিন্দুরা কখনও নিজেদের পরিচালিত করতে দেখা যায়না। ভারতের মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনামলের আলোচনায় তাদের দেখা যায় ষড়যন্ত্র করতে নতুবা অন্যদের হাতে ষড়যন্ত্রের গুটি হতে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে তারা কখনও দেশ শাসন করতে পারেনি। তাদের প্রাগৈতিহাসিক দেশ শাসনের কথা অবাস্তব এবং অলীক কাহিনী মাত্র। অতএব, অখণ্ড ভারতে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম পীড়নের ভীতি অহেতুক বৈ আর কিছুই ছিল না।

সপ্তমতঃ ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্য ছিলো, যদি শেষ পর্যন্ত তাদের ভারত ত্যাগ করতেই হয় তবে তারা এমন কিছু করে যাবে যাতে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ কোনদিন মুসলিম শাসনাধীনে চলে না যায়। সে উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এমন সব লোকদের দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে দুই রাজনৈতিক দল বহু পূর্বে তৈরি করে রেখেছিলো। যারা লর্ড ম্যাকেলের ভাষায়—রং এবং বংশে ভারতীয় হলেও মনস্তাত্বিকে ছিলো খাঁটি বিলাতী। এদের দিয়ে ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিম ভারতের পথ চিরতরে বন্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়।

অষ্টমতঃ প্রস্তাবিত এলাকাকে পাকিস্তানে পরিণত করার প্রয়োজনই নেই। কেননা, যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব নির্বাচনে স্বভাবতঃই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতঃ রাজ্য শাসন করবেন।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানগণ দারুণভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবেন। প্রস্তাবিত পাকিস্তানে তাদের কোন কল্যাণই করতে পারবে না। অধিকন্তু বিপদ আরও বাড়িয়ে দিবে, যাদের নামে, যাদের নিরাপত্তার নামে এত তড়পানি তাদের কোন সুরাহা হবে না, তারা বলির পাঠায় পরিণত হবে।

নবমতঃ আর যদি লোক বিনিময় হয় তবে তা হবে আরও মারাত্মক, অনুপাতে ক্ষুদ্রায়তন পাকিস্তানে জনসংখ্যার দুর্বহ চাপ পড়বে, অধিকন্তু বিষয় সম্পত্তি এবং অন্যান্য জাতীয় সংস্কৃতির নির্মম সমাধি ঘটবে, যার কল্পনাও প্রাণান্তকর।

দশমতঃ যে বিরোধ এবং ভেদনীতির ভিত্তিতে এ ভাগ বাটোয়ারা, সে ভেদনীতি... বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা আরও তীব্র এবং স্থায়ী হয়ে যাবে, এবং বলা বাহুল্য ইহা ইসলাম ও মুসলমান এমনকি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে মারাত্মক অভিশাপ হয়ে রইবে। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবরের মত অসহযোগিতা এবং রেষারেষি চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

একাদশতমঃ অবশিষ্ট ভারত হতে স্বাধীন পাকিস্তানে হিজরতের প্রাক্কালে লক্ষ মুসলিম নারীর সতীত্ব বিনষ্ট হবে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের রক্ত ঝরবে এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ত হবেই ইত্যাদি। বিগত ৫৩ বৎসরের ইতিহাস নির্মমভাবে অক্ষরে অক্ষরে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর বিচক্ষণতা রাজ্য দূরদর্শীতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য দান করে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তো দূরে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা–কর্মীদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকারও হতে হয়েছে ঐ নেতাদের হাতে। পাকিস্তান পক্ষীয় ওলামায়ে কেরামগণও তাদের ধোকাবাজী সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। আর ইহাও বুঝতে পেরেছেন যে, পাকিস্তান কায়েম আন্দোলনের সময় কোরআনী শাসন কায়েমের ধোয়া তোলাটা ছিলো মুসলমানদের ধর্মীয় ইমেজকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসেল করার একটি উত্তম হাতিয়ার।

'কেরদারে কায়েদে আজম' উর্দূ পত্রিকায় উল্লেখ হয়েছে যে, ভারত থেকে পাকিস্তানে হিজরতের সময় ৫ থেকে ১০ লাখ মুসলমানের রক্ত

বিনষ্ট হয়েছে। নব্বই হাজার মুসলিম নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। ৮০ লাখ মুসলমানকে তাদের সম্পদ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর যারা ভারতে রয়ে গেলেন তাদের উপর তো কেয়ামত কায়েম হয়েই আছে। তখনকার পরিস্থিতিতে খণ্ড ভারত মুসলমানদের জন্য বেশী মঙ্গলজনক হবে, না অখণ্ড ভারত। এ নিয়ে মতভেদ দেখা যাওয়াটা ছিলো স্বাভাবিক। কেননা, ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তাছাড়া এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কোরআন হাদীসের পরিস্কার ও অকাট্য কোন দলিল ছিলো না। উভয় দলের ভিত্তিই ছিলো কিছু ধারণা, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা। ঐ সময় পাকিস্তান হওয়াটাই মুসলমানদের জন্য মঙ্গল হবে মনে করতেন মুজাদ্দেদে জামান হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও তাঁর খলীফাগণ।

আর অন্যদিকে অখণ্ড ভারতই মুসলমানদের জন্য বেশী মঙ্গলজনক মনে করতেন রাজনীতিবিদ আরব আজমের ওস্তাদ অখণ্ড বিশাল ভারতবর্ষের জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যগণ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সমস্ত প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণ। উভয় দিকেই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা ও বুজর্গানে দ্বীন এবং উভয় দিকেরই যুক্তি প্রমাণগুলো ছিলো গ্রহণযোগ্য। এ মতভেদটা ছিলো সম্পূর্ণই নিঃস্বার্থে, মুসলমানদের মঙ্গলার্থে ও এখলাছের ভিত্তিতে। আর এই মতভেদটা ছিলো ইজতেহাদী বা চিন্তা ও গবেষণালব্ধ। কোরআন হাদিসে স্পষ্টত অনুল্লেখ বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেলেও তা আল্লাহর নিকট মাফ, বরং তাতে একগুণ নেকী পাওয়া যায় আর গবেষণা শুদ্ধ হলে দুইগুণ ছওয়াবের কথা ছহি হাদীসে উল্লেখ আছে। (৪র্থ শতাব্দী হতে যে ইজতেহাদের পথ বন্ধের কথা কিতাবে লেখা আছে, সেটা হলো ফেকাহ ও মাছয়ালার ইজতেহাদ, এখানে যে ইজতেহাদের কথা উল্লেখ হয়েছে এটা হলো রাজনৈতিক, যার পথ বন্ধ নয়।)

ফতুয়া মতে কোন পক্ষের ওলামাই অপরাধী নন। সুতরাং এজতেহাদী বিষয়ে কোন এক পক্ষ গ্রহণ করে অপর পক্ষের উপর খারাপ মন্তব্য করা শরীয়ত বর্জিত কাজ হবে। আমাদের এ কথাই বিশ্বাস রাখতে হবে যে,

(ক) 'ইখতিলাহুল ওলামায়ে রাহমাতুন' (হক্কানী ও নিঃস্বার্থ) ওলামাগণের মতভেদ রহমত স্বরূপ। (খ) 'লুহুমুল ওলামায়ে মালযুমাতুন' আলেম সমাজের দুর্নাম ও গীবত করা বিষাক্ত।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে পাকিস্তানের পক্ষে একদল ওলামাগণ থাকার কারণে অবিভক্ত পাকিস্তানে নীতিগতভাবে ইসলামী আন্দোলন করার সুযোগ রয়েছে। যদিও মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতারা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলছে। আর অখণ্ড ভারতের পক্ষে একদল আলেমসমাজ থাকার কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসা সহ সাত শত বছরের মুসলিম শাসিত ভারতের মুসলিম স্মৃতিসমূহ এবং ভারতে থেকে যাওয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম নর–নারীর হেফাজতের নীতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে উগ্র হিন্দুদের একদল মুসলিম নিদর্শনাবলী ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ভারতকে রামরাজ্য করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এভাবেও মন্তব্য করতে দেখা যায় যে, তৎকালীন খণ্ড ও অখণ্ড ভারত নিয়ে ওলামায়ে হক্কানীগণ পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমেই উপরোক্ত বিপরীতমুখী মতামতের সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, আদর্শবিহীন নামধারী মুসলিম নেতাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান হয়েই যাবে। অন্যদিকে ভারত থেকে সমস্ত মুসলমানদের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করাও সম্ভব নয়। তাই কিছু আলেম সমাজ পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়ে পাকিস্তানে ইসলাম ও আলেম সমাজের জন্য রাজনীতি করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। আর অপর দল অখণ্ড ভারতের পক্ষে রায় দিয়ে ভারতে রয়ে যাওয়া কোটি কোটি মুসলিম ও মুসলিম স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো রক্ষার সুব্যবস্থা করেন। অন্যথায় ভারত ও পাকিস্তানে দ্বীন ও জাতির অবস্থা আরো করুণ হতো।

উপরোল্লেখিত আলোচনা হতে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর পাকিস্তান বিরোধিতার মূল কারণ বুঝা গেল। এখানে আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মরহুম মওদুদীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা করবো। এ পর্যালোচনা কোন রাজনৈতিক কুমতলব বা বিদ্বেষবশতঃ নয় বরং ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে।

জনাব খান সাহেব 'মাওলানা মওদুদী' নামীয় পুস্তিকায় স্বীকার করেছেন যে, মরহুম মওদুদী পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন কিন্তু সক্রিয় ছিলেন না। এক পর্যায়ে খান সাহেব লিখেন, "তবে তিনি মুসলীম লীগে যোগদান করেননি, করতে পারেননি।"

এ কথা থেকে অবশ্য এটা বুঝে আসে যে, ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পূর্বে হয়তো মুসলিম লীগে যোগদানের কথা উঠে থাকবে। অতঃপর যখন জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তখন কেন তিনি তার দল নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন না?

এখানে আরোও একটি প্রশ্ন জাগে, তিনি মুসলিম লীগকে পছন্দ করেন না, কংগ্রেসকে সমর্থন করার তো প্রশ্নই ওঠে না আর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ—এটাও তো তাঁর চিরশত্রু (?) মাওলানা মাদানী (রাঃ)এর নেতৃত্বে পরিচালিত। তাহলে তিনি কাকে সমর্থন করবেন? কেউ যদি বলে বসেন সূক্ষ্মভাবে বৃটিশ শাসনকে—তাহলে তাঁরই বা ভুল কোথায়?

অবশ্য খান সাহেব মুসলিম লীগে যোগদান না করার কারণ হিসাবে বলেছেন, "বিভিন্ন চরিত্র ও মতাদর্শের, এমন কি ইসলামের বিপরীত মতাদর্শের লোকের ভীড় জমিয়ে যে দল (মুসলিম লীগ) গঠিত হয়, তা কোন দিনই কোন মহৎ আদর্শের দিকে চলতে পারে না।"

কথাটা অতীব সত্য। তবে বাস্তবে মরহুম মওদুদীর মধ্যেই ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে আমরা বড়ই ব্যথা পাই। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক জামায়াতে ইসলামীর ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গত ৬ই সেপ্টেম্বর/৯১ এ জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রে ছাপানো মরহুম মওদুদীর ছবিগুলো (শশ্রুমণ্ডিত কোর্ট–প্যান্ট–টাই পরিহিত ইহুদী–নাসারাদের সাদৃশ্যে তোলা) দৃষ্টে যা বুঝা যায় তাতে তিনিও যে ইসলামী আদর্শভ্রষ্ট ছিলেন এবং বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার প্রিয় ছিলেন তা সুস্পষ্ট।

পরিশেষে পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ভূমিকা গত ২১–২৭শে অক্টোবর/৯১ তারিখে প্রচারিত 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান'

পত্রিকার ভাষায় উল্লেখ করতে চাই—"তিনিও (মওদুদী) তো পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন বলেই ইতিহাস প্রমাণ দেয়।"

—আবুল বশীর, ঢাকা।

মাওলানা মাদানী (রহঃ) সমসাময়িক মনীষীদের চোখে

বিভাগ-পূর্ব বিশাল ভারত ও বিভাগ-পরবর্তী ভারতের জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি, আরব আজমের উস্তাদ, এক যুগের অধিককাল পর্যন্ত মদীনা শরীফে হাদিসের শিক্ষাদাতা, বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক, আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, বার বার কারা নির্যাতন ভোগকারী, ভারত ও মুসলমানদের জাতীয় নেতা, আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) সম্বন্ধে মুসলিম, অমুসলিম, ধর্মীয় ও জাতীয় নেতাদের যে সমস্ত প্রশংসা বাণীর স্তূপ রয়েছে তা লিখতে গেলে একখানা পুস্তক হয়ে যাবে। এখানে মাত্র কয়েকজনের প্রশংসা বাণীই উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। যুগ প্রসিদ্ধ ওলী, শীর্ষস্থানীয় আলেম, মুজাদ্দেদে জামান, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর সংগে হযরত মাদানী (রহঃ)এর রাজনৈতিক বিরোধ ছিল সর্বজনবিদিত, পূর্ব পশ্চিম সম্পর্ক সদৃশ, কিন্তু এতদসত্বেও হযরত মাদানী সম্পর্কে হযরত থানভীর মন্তব্য এবং প্রশংসা চিরঃ স্মরণীয়। হযরত থানভী বলেন—আমার মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক জগতের দায়িত্বভার কে বহন করবে, এ বিষয়ে আমার দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু হযরত মাদানীকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, এ জগত তাঁর দ্বারাই জীবিত থাকবে।

হযরত মাদানী (রহঃ)এর গ্রেপ্তারের খবর শুনে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন—মাওলানা মাদানীর প্রতি আমার এত মহব্বত রয়েছে বলে আগে বুঝতে পারিনি।"

জনৈক উপস্থিত ব্যক্তি বলেন, তিনি তো নিজেই কারাবরণ করেছেন। হযরত থানভী তদুত্তরে বলেন—আপনি আমাকে এ কথা দ্বারা সান্ত্বনা

দিতে চাচ্ছেন, হযরত হুসাইন (রাঃ) কি নিজেই ইয়াযীদের মুকাবিলা করতে যান নি, কিন্তু এতে মনোকষ্ট পায়নি এমন কেউ আছেন? হযরত থানভী আরো বলেন—"মাওলানা হুসাইন আহমদের বিরুদ্ধাচারীর 'সু য়ে খাতিমা' বা ঈমানহারা অবস্থায় মৃত্যুর আশংকা আছে।"

২। তাবলীগ জামাতের ইমাম, সুপ্রসিদ্ধ ওলী, মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেন—হযরত মাদানীর রাজনীতির সংগে আমার মতের মিল নাই। কেননা, তা আমার বুদ্ধিতে আসে না। আমি যদি তা বুঝতাম তবে তাঁর পায়ের জুতা নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটতাম। কেননা, আল্লাহর নিকট তাঁর যে মর্যাদা রয়েছে তা আমি ভালভাবে জানি ; দোযখের আগুন কিনতে ভয় করি তাই তাঁর বিরোধিতা করতে চাই না, তাঁর বিরোধিতা যে জাহান্নামের আগুন ডেকে আনে।

৩। স্বনামধন্য সুবিখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহঃ) বলেন—আমি হযরত মাদানীর জুতার ফিতার সম মর্যাদাও নই।

৪। বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস এবং বুযুর্গ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, হযরত মাদানীর গুণ মহিমা, জ্ঞান মনীষা অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমার মতে তর্কাতীত তিনি জ্ঞান মনীষা ও আধ্যাত্মিক মহিমার উজ্জ্বল রবি। ইত্যাদি।

পাঠকবৃন্দ! যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গগণের মন্তব্যগুলো হতে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর মকাম ও মর্যাদার উচ্চতা কিছু অনুভব করেছেন।

পাঠকবৃন্দ! এ হল মাওলানা মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা ও বুযুর্গগণের অভিমত। অন্যদিকে মওদুদী সাহেব ও তার অনুসারী জামাত নেতাদের মন্তব্য সম্পূর্ণ এর বিপরীত ; মাওলানা মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে তারা যা ধারণা রাখেন তা কোন ভাল মুসলমানেরই শুনতে রুচি হয় না।

৩০ সেপ্টেম্বর/৯১ আল ফালাহ মিলনায়তনের এক সেমিনারে জামাত নেতা মাওলানা ইউসুফের বক্তব্যে পরিস্কার উচ্চারিত হয় যে,

মাওলানা মাদানী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইসলামকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি।

আর জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মাষ্টার মরহুম আব্বাস আলী খান, মাওলানা মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ আব্বাস আলী খান সাহেব বলেন—মাওলানা মওদুদীর প্রতি মাওলানা মাদানীর অন্ধ আক্রোশের এটাই মূল কারণ। এই আক্রোশকে ভিত্তি করেই মাওলানা মাদানী পরবর্তীকালে মাওলানা মওদুদীর উপরে আমরণ ফতোয়াবাজীর মেশিনগান থেকে অমূলক, ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক অভিযোগ টেনে রোষানল প্রজ্জ্বলিত ফতোয়ার গোলা বর্ষণ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্।

মুজাদ্দেদে জামান আল্লামা থানভী (রহঃ) ও অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামগণ যেখানে মাওলানা মাদানী (রহঃ)এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর ওলী, হক্কানী আলেম ও বুযুর্গ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেখানে মওদুদী সাহেব ও তাঁর দলীয় লিডারদের তাঁকে সঠিক মূল্যায়ন না করতে পারার কারণ কি? পূর্বাপর দলটিতে বা দলটির কেন্দ্রবিন্দুতে আলেম–ওলামা না থাকার কারণে, না কোন বিজাতীয় ষড়যন্ত্রের কালো হাতের ইঙ্গিতে তা লক্ষণীয়।

প্রণিধানযোগ্য যে, (ক) খণ্ড ভারতের স্বপক্ষে মাওলানা মাদানী ও মাওলানা আযাদ প্রমুখের চিন্তাধারার ভিত্তিতে ফুরফুরা সিলসিলাভুক্ত বাংলার গৌরব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখপাত্র হাফেজে হাদীস আল্লামা রূহুল আমীনের মত ব্যক্তিত্ব অখণ্ড ভারতের পক্ষে সংগ্রাম করেন।

(খ) পাকিস্তান কায়েম হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা মাদানী ও আযাদ প্রমুখ পাকিস্তানকে স্বীকার করে নেন।

(গ) পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা রাজনৈতিক বিরোধীদের ব্যাপারে কোন প্রকার সমালোচনা করা হতে বিরত থাকেন।

(ঘ) বর্তমানে পাকভারত উপমহাদেশের যেখানেই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারস চালু আছে। তার প্রায় কেন্দ্রগুলো তাঁর ফয়েজেই চালু আছে, আর যারা হাদীসের অধ্যাপক বা মুহাদ্দিস তারা প্রায়ই তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য, না হয় পরোক্ষ। হাদীসে

কুদসীতে উল্লেখ—আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর মনে কষ্ট দেয় আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর প্রসিদ্ধ আছে যে, লুহুমুল ওলামায়ে মাসমুমাতুন অর্থাৎ, আলেম সমাজের গীবত করা বিষাক্ত।—মদনী রচিত ইত্যাদি।

ধর্ম দেশ ও জাতির কল্যাণে ওলামায়ে দেওবন্দীগণের অবদান

আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়াও দেওবন্দীগণ ধর্ম, দেশ ও জাতির জন্য যে সমস্ত অবদান রাখেন তা অসীম। এখানে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু অবদানের ফিরিস্তি পেশ করা হচ্ছে মাত্র।

১. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন দান ঃ

অতীতে যখন বায়তুল মাকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিন স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিল তখন ইহুদী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ওলামায়ে দেওবন্দের রায়ই প্রকাশ হয়েছিল। এবং দেওবন্দীগণ সমস্ত মুসলমানদেরকে মতভেদের ঊর্ধ্বে থেকে এক প্লাটফর্মে আনতে সক্ষম হন।

২. মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ঃ

এভাবে মুসলমানদের উপর জুলুম এবং তাদের দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে যখনই কোন এখতেলাফী মাসায়েল খাড়া করা হয়েছিল, তখনই ওলামায়ে দেওবন্দ মুসলমানদেরকে এক প্লাটফর্মে আনার জন্য এগিয়ে আসেন। এই ঐক্য প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই কায়েম হয় 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম মজলিশে মুসাওরাত'। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন মাওলানা মুফতি আতিকুর রহমান। যিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা হতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার মজলিশে শুরার একজন সদস্য।

৩. সৌদী আরবের ইসলামী হুকুমতকে সমর্থন দান ঃ

সউদ খান্দানের বাদশাহ আবদুল আজিজ যখন আরবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন তখন সর্বাগ্রে ওলামায়ে দেওবন্দই তাঁর

সহযোগিতা করেছেন এবং দেওবন্দ হতে একটি ওলামা প্রতিনিধি দল তাঁর সমর্থনে হেজাযে মুকাদ্দাস সফর করেন।

৪. তুরস্কের খেলাফতে ওসমানীয়ার প্রতি সমর্থন দান ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন তুর্কি মজলুমদের সাহায্যের জন্য গঠিত 'আঞ্জুমানে হেলালে আহমর'কে শক্তিশালী করার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দ ফতুয়া পোষ্টারিং ও সভা সমিতি দ্বারা অবর্ণনীয় খেদমত করেছেন এবং নিজেরাও মজলুম তুর্কি ভাইদের আর্থিক সাহাযার্থে সরাসরি শরীক হয়েছেন।

৫. আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে যোগদান ঃ

মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ওলামায়ে দেওবন্দ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। যেমন মু'তামারে আলমে ইসলামী মিসর, রাবেয়াতে আলমে ইসলামী মক্কা, মু'তামারুস সীরাত ও সুন্নাহ দাহা ও কাতার, মু'তামারুল জিগরাপী রিয়াদ ইত্যাদি সম্মেলনগুলোতে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ইহাও মাদ্রাসাটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বহন করে বই কি।

৬. আফগান মুজাহিদদের প্রতি সমর্থন দান ঃ

রাশিয়ার পুতুল সরকার বাবরাক কারমাল ও নজীবুল্লাহ গং কর্তৃক মুসলিম ঐতিহ্যবাহী আফগানিস্তানে জোরপূর্বক সমাজতন্ত্র চালিয়ে দিলে সে দেশে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। পুতুল সরকারকে উৎখাত করার জন্য সর্বদলীয় মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়, এতোদ্দেশ্যে 'হরকাতুল জিহাদিল আল ইসলামী' অর্থাৎ বিশ্ব ইসলামী জিহাদ আন্দোলন নামীয় মুজাহিদ বাহিনীর বলিষ্ঠ অঙ্গ দলটি ওলামায়ে দেওবন্দীদের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত। দেওবন্দীদের এ দলটি কাশ্মীর ও বার্মা ইত্যাদি দেশের মজলুম মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্যও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৭. ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে খেদমতে দ্বীন ঃ

তা'লীম তরবিয়ত বা ধর্মীয় শিক্ষা–দীক্ষার মাধ্যমে দেওবন্দী ওলামাগণ হাজার হাজার সুযোগ্য আলেম, হাফেজ, কারী, মুফতী, মুহাদ্দিস,

মুফাচ্ছির, মুনাজির, ওয়ায়েজ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি বা শায়ের ইত্যাদি বের করে তাঁদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

৮. নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষাদান ঃ

নূরানী পদ্ধতি, নাদিয়া ট্রেনিং এ মাত্র পনের ঘন্টায় ও অল্প দিনে একজন উম্মিকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সহজ পদ্ধতিটিও ওলামায়ে দেওবন্দীদের আবিস্কৃত। এই নূরানী শিক্ষার বাংলাদেশস্থ বড় মুরব্বি মাওলানা বেলায়েত সাহেব তিনিও দেওবন্দী। বর্তমানে হাজী আবদুল মালেক (নোয়াখালী চাটখিল) ও অন্যান্য কয়েকজন ধর্মপ্রাণ দানবীরের অবদানে পরিচালিত নূরানী ওয়াকফ ষ্টেটের মাধ্যমে নূরানী পদ্ধতিটি এখন অনেক প্রসার লাভ করেছে। লণ্ডন পর্যন্ত এ নূরানীর কাজ চালু হয়েছে। এ নূরানী পদ্ধতির সুদক্ষ শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব দেওবন্দী অনেক কৃতিত্বের অধিকারী। আর নাদিয়া পদ্ধতির মুরুব্বী হলেন মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেব তিনিও দেওবন্দী। এই দুই পদ্ধতি দ্বারা লক্ষ লক্ষ মুসলমান অতি অল্প সময়ে ছহিশুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে সক্ষম হচ্ছেন।

৯. পীর মুরিদী দ্বারা খেদমত ঃ

ইলমে বাতেন বা সুফিবাদের চারো তরিকায় তথা চিস্তিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, কাদেরিয়া, নক্সেবন্দীয়া তরীকায় ছহিভাবে পীর মুরীদির মাধ্যমে উম্মতে মুসলেমার আত্মশুদ্ধির কাজেও ওলামায়ে দেওবন্দীদের ভূমিকা অনন্য। বড় বড় দেওবন্দী ওলামাগণ প্রায়ই হক্কানী পীর। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলায় তাঁদের অনেক খানকা আছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের হাতে মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ ও আত্মশুদ্ধি করে থাকেন। মুজাদ্দেদে জামান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ), মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) প্রমুখ এবং বাংলার কারী ইবরাহীম সাহেব উজানী (রহঃ), মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহঃ) পটিয়া, মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব

(রহঃ) মেখল, মাওলানা এছহাক সাহেব চরমোনাই (রহঃ), মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) নোয়াখালী (বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতা), মাওলানা হাজী ইউনুছ সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুম চট্টগ্রাম, হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুল হালীম সাহেব ওলামা বাজার ফেনী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা কলিমুল্লাহ সাহেব কুমিল্লা, মাওলানা সুলতান সাহেব জীদামাজুদহুম নানুপুরী, মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (রহঃ), মাওলানা ফজলুল করিম পীরজাদা শরফুহুম (প্রধান ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন) প্রমুখ প্রখ্যাত ওলামাগণ সবাই হক্কানী ওলী ও পীর যাদের হাজার হাজার মুরীদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।

১০. বক্তব্যের মাধ্যমে দ্বীনি খেদমত ঃ

মাঠে ময়দানে সভা সমিতিতে সঠিক বক্তব্যে এবং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ দ্বীনের অফুরন্ত খেদমত করে যাচ্ছেন। বর্তমানের প্রখ্যাত ওয়ায়েজ শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ঢাকা, আল্লামা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ সাহেব নোয়াখালী, মাওলানা মোস্তফা আলহোছাইনী নোয়াখালী। মাওলানা মাজহারুল ইসলাম চট্টগ্রাম, মাওলানা জমীরুদ্দীন চট্টগ্রাম, মাওলানা আবদুল হক আব্বাসী ফরিদপুরী, মাওলানা ছফিরুদ্দিন মোমেনশাহী, মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ঢাকা, মাওলানা নুরুদ্দীন সিলেট, উত্তরবঙ্গের জামিল মাদ্রাসা বগুড়ার মুহাদ্দেস মাওলানা আবদুস সবুর সাহেব প্রমুখ সবাই দেওবন্দী ওলামা। অখণ্ড ভারতে মাওলানা আতাউল্লাহ বোখারী (রহঃ), পাকিস্তানে মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (রহঃ), মাওলানা জিয়া উদ্দিন ফারুকী, মাওলানা দ্বীনপুরী, মাওলানা আবদুল মজিদ নদীম মুদ্দাজিল্লুহ, মাওলানা হাকিম আখতার সাহেব প্রমুখ ওলামাগণ দেওবন্দী চিন্তাধারারই অদ্বিতীয় ওলামা।

১১. লেখার মাধ্যমে দ্বীনি খেদমত ঃ

বিভিন্ন ভাষায় ওলামায়ে দেওবন্দীগণ অসংখ্য কিতাবাদি লিখে দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত আছেন। কোরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফতুয়া,

ফারায়েজ, মাছায়েল ইত্যাদির উপর মাওলানা কারী তৈয়ব (রহঃ)এর অনুসন্ধান মতে দেওবন্দীদের লেখা কিতাবের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজারের উর্ধ্বে। শুধু মাওলানা থানভী (রহঃ)এর লিখুনির সংখ্যাই প্রায় হাজার। ছোট বড় হাজার হাজার কিতাব তাঁরা লিখেছেন। তাফসীরে আশরাফী, তাফসীরে মায়ারিফুল কোরআন, ফাওয়ায়েদে ওসমানী, তাফসীরে হক্কানী, বাংলা বোখারী শরীফ, বেহেস্তী জেওর ইত্যাদি ওলামায়ে দেওবন্দীগণেরই লিখিত। দেওবন্দী ওলামাদের ধর্মীয় সংবাদপত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। রিয়াদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার শেখ আবু গুদ্দা সামী, ১৩৮১ হিজরীতে দেওবন্দ পরিদর্শন করার পর দেওবন্দী ওলামাগণের লিখিত কিতাবাদির গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেন, এই কিতাবগুলো আরবীতে অনুবাদ হলে আরববাসীরাও উপকৃত হতো।

১২. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে খেদমত ঃ

দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের সার্বজনীন শান্তির আদর্শ প্রচারে ওলামায়ে দেওবন্দীদের নজীর নেই। তাবলীগ জামাত নামে যে দলটি সারা বিশ্ব ময়দানে দাওয়াতী কাজে সক্রিয় তাও ওলামায়ে দেওবন্দীগণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এই জামাতের যিনি প্রথম মুরুব্বী মাওলানা শায়খ ইলিয়াস (রহঃ) তিনি দেওবন্দেরই শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় মুরুব্বী মাওলানা গাংগুহী (রহঃ)এরই খলিফা এবং দেওবন্দী চিন্তাধারারই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর ও তাঁর জামায়াতের অপরিসীম প্রচেষ্টায় আজ দ্বীন ইসলামের চিরন্তন আওয়াজ সারা বিশ্বে গুঞ্জরিত। তাঁর তাবলীগ জামায়াতের উছিলায় আজ মস্কো বিমান বন্দরে, ওয়াশিংটনের হাওয়ায়ী আড্ডাতে, চীন ইত্যাদি রাজ্যে ও দেশে সুললিত কন্ঠে আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, নামাজ হচ্ছে। মানুষ বিভ্রান্তিকর মতবাদগুলোর জুলমাত (অন্ধকার) থেকে ইসলামের নূরের দিকে দীক্ষা পাচ্ছে। আল্লাহ পাক এই জামায়াতকে এত কবুল করেছেন যে, বিভিন্ন মহলের হাজার অপপ্রচার ও কঠোর বিরোধিতার প্রাচীর ঠেলেও তা সামনের দিকে শুধু অগ্রসরই হচ্ছে। এ জামায়াতটিরই উদ্যোগে প্রতি বৎসর টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে

এক বিশাল মুসলিম বিশ্ব এস্তেমার আয়োজন করা হয়। আরাফাত ময়দানের নজীরবিহীন বিশাল ধর্মীয় সমাবেশের পর টঙ্গির এস্তেমাটিই হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী সমাবেশ।

১৩. বাহাস ও মুনাজারার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত ঃ

বাহাস, মুনাজারা বা বিতর্ক সভা, সেমিনারের মাধ্যমেও ওলামায়ে দেওবন্দীগণ সত্যের স্বপক্ষে ও বাতিলের মুকাবিলায় ইসলামের নজীরবিহীন খেদমত আনজাম দিয়ে আসছেন। ভারতের মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা সৈয়দ মর্তাজা হাছান, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা কারী তৈয়াব (রহঃ), মাওলানা ছালেম, মাওলানা তকী ওসমানী পাকিস্তানী, মাওলানা কোরবান আলী (রহঃ) বরুড়া, শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ খতীবে আ'যম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহঃ) চট্টগ্রাম, মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহঃ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাওলানা নূরুল্লাহ (রহঃ) (নোয়াখালী), মাওলানা আহমদ শফী সাহেব হাটহাজারী, মাওলানা মুফতি এজহার চট্টগ্রাম, মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী, মুফতি ইউসুফ (রহঃ) চট্টগ্রাম, শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ শাইখুল হাদিস ওয়াল আদব মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেব ওলামাবাজার ফেনী, মাওলানা নূরুল হুদা সাহেব চৌমুহনী প্রমুখ ওলামায়ে দেওবন্দীগণ বিতর্ক জ্ঞানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪. একামাতে দ্বীনি এদারাত ঃ

দ্বীনি মাদ্রাসা, হেফজখানা, মক্তব, মসজিদ, খানকা, পাঠাগার ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর মাধ্যমে ওলামায়ে দেওবন্দের খেদমত অবিস্মরণীয়। এ দেওবন্দ মাদ্রাসারই উসিলাতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মাদ্রাসা। যা গণনা করা দুস্কর। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের এক রিপোর্টে ৯১৫টি দ্বীনি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ আছে। তার মধ্যে ৪৫৮টিই দেওবন্দীদের। বাকি ৪৫৭টি আহ্‌লী হাদীস, বেরেলভী ও শীয়াদের, বর্তমানে মাদ্রাসা সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। আর বাংলাদেশেরও অগণিত দেওবন্দী মাদ্রাসা, মক্তব, হেফজখানা, মসজিদ

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। হাটহাজারী, পটিয়া, মেখল, লালবাগ, ফরিদাবাদ, মোহাম্মদপুর, মালীবাগ, ওলামাবাজার, আমানতপুর, কালিকাপুর।

কলাকোপা, শর্শদী, বাবুনগর, নানুপুর, জীরি ইত্যাদি স্থানের মাদ্রাসাগুলো এবং বগুড়া জামিল মাদ্রাসা, রায়গঞ্জের বেতুয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জের মাছুমপুর মাদ্রাসা, সৈয়দপুরের দারুল উলুম মাদ্রাসা, পোরশার দারুল হেদায়াত মাদ্রাসা, গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা, যশোহরের দারুল উলুম মাদ্রাসা, হিলি মাদ্রাসা, নরসিংদীর ইসলামপুর মাদ্রাসা ইত্যাদি দেওবন্দ মাদ্রাসারই অনুসারী কাওমী বেসরকারী মাদ্রাসা। মক্কা, মদিনা, আফ্রিকা, লন্ডন, বার্মা ইত্যাদি অনেক রাষ্ট্রেই দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুকরণে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। মক্কার ছউলতীয়া মাদ্রাসা, মাদ্রাসায়ে মাওলানা এসহাক (রহঃ) ইত্যাদি দেওবন্দী চিন্তাধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

১৫. নেচারী (প্রাকৃতিক মতবাদ) ফেৎনা প্রতিরোধ ঃ

সার সৈয়দ আহমদ, চেরাগ আলী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ কর্তৃক ইসলামকে আধুনিকীকরণ এবং নেচারীজমের মাপকাঠিতে কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যার যে ধৃষ্টতা তারা দেখিয়েছেন ওলামায়ে দেওবন্দ কঠোর হস্তে সে ফিৎনার প্রতিরোধ করেছেন।

আল্লামা থানভী (রহঃ)এর এমদাদুল ফতুয়া, মাওলানা হেফজুর রহমান সাহেবের কাসাসুল কোরআন, মাওলানা হক্কানীর তাফসীরে হক্কানী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর 'তাফসীরের নামে সত্যের অপলাপ' ইত্যাদি কিতাবে নেচারী মতবাদী তাফসীরের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে নেচারী মতবাদের বড় প্রচারক ছিলেন মাওলানা আকরাম খান। তিনি জন্মগত আহ্লে হাদিস গোত্রীয় হলেও দর্শনগত নেচারী।

১৬. ফিৎনায়ে ইনকারে হাদিস বা হাদিস অবিশ্বাসবাদের মোকাবিলা ঃ

ইংরেজদের ইঙ্গিতে আব্দুল্লাহ চকরালভী, মোল্লা আসলাম জীরাজপুরী, চৌধুরী গোলাম মোঃ পারভেজ, নেয়াজ ফাতেহপুরী প্রমুখ

দ্বারা পরিচালিত ইনকারে হাদিস ফিৎনার কঠোর মুকাবেলায় অসংখ্য লিখনী ও বক্তব্য দিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ তাঁদের জেহাদ অব্যাহত রেখেছেন।

১৭. কাদিয়ানী ফিৎনার মুকবিলা ঃ

খতমে নবুওয়াতের মুনকির, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার পাঞ্জাবের বৃটিশ সৃষ্ট নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রতিষ্ঠিত কাদিয়ানী, মির্জায়ী, আহমদী, ফেরকার জোরদার মোকাবিলাও ওলামায়ে দেওবন্দ করেছেন ও করে যাচ্ছেন। পাকিস্তানের মুফতি শফী (রহঃ)এর 'খতমে নবুওয়াত' কিতাব সহ অসংখ্য কিতাব কাদিয়ানী ফিৎনার বিরুদ্ধে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ লিখেছেন। ইহা ছাড়াও সভা-সমিতি, খতমে নবুওয়াত কমিটি, ফতুয়া, বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ফিৎনার মোকাবিলা অব্যাহত রেখেছেন। মাওলানা আতাউল্লাহ বোখারী দেওবন্দী (রহঃ)এর খেদমত এ ব্যাপারে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কাদিয়ানীদের বিরোধিতার কারণে পাকিস্তানে একবার তাঁর ফাঁসির হুকুমও হয়েছিলো। বিশ্বের সমস্ত ইসলামিক দল ও মুফতিয়ানে কেরাম কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সামছুদ্দীন কাসেমী (রহঃ)এর ইদানিং লিখিত 'কাদিয়ানী ধর্মমত' পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয়।

১৮. ভ্রান্ত সাবায়ী ও শিয়া ফিতনার মুকাবিলা ঃ

শিয়াইজম ফিতনার প্রতিরোধে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ সর্বদাই তৎপর রয়েছেন। ইদানিং মাওলানা মনজুর নো'মানী দেওবন্দীর লেখা 'ইরানী ইনকিলাব এবং খোমিনি' কিতাবটি শিয়াদের বিরুদ্ধে এক নির্ভরযোগ্য ও অপূর্ব কিতাব।

১৯. বাহায়ী ফিরকার মুকাবিলা ঃ

ইরানী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বাবী ফেরকা প্রধান আলী বিন মির্জা রেজা ১২৩৫ হিঃ এর খলিফা বাহাউদ্দিনের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি যারা বিশ্বাসী

তাদেরকেই বাহায়ী বলা হয়। এই বাহাউদ্দীন খোদায়ী দাবী সহ ইসলামের অসংখ্য অপব্যাখ্যার নায়ক ছিলো। ফতুয়া মতে বাহায়ী সম্প্রদায় অমুসলিম। ওলামায়ে দেওবন্দীগণ লিখনি ও বক্তব্য ইত্যাদি দ্বারা এই ফিতনাকে নিস্প্রাণ করে দেন। ইদানিং ঢাকা, রাজশাহী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এরা খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। এখনই তাদের খতম করে দেয়া উচিত।

২০. বেদয়াতী ফেরকার মোকাবিলা ঃ

কুখ্যাত আহমদ রেজাখান বেরেলভী ও তার দলের আবিস্কৃত মাজার, দরগা, পীর ইত্যাদি গাইরুল্লাহর পূজা এবং সর্বপ্রকারের শিরক, বেদয়াত, কুসংস্কার ও বদরুছুম ইত্যাদি ফিতনার মোকাবেলায় ওলামায়ে দেওবন্দীগণ অসংখ্য কিতাব লিখেন ও বক্তব্য পেশ করেন। তন্মধ্যে আল্লামা থানভী দেওবন্দীর এছলাহুর রসূম ও বেহেস্তী জেওর ইত্যাদি এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২১. খৃষ্টানী ফিতনার মোকাবিলা ঃ

বৃটিশ আমল হতে সারা ভারতবর্ষকে খৃষ্টান বানানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজরা ইউরোপ হতে অসংখ্য পাদ্রি ভারত উপমহাদেশে আমদানি করে। এবং তাদের মাধ্যমে অগণিত মিশন স্কুল, মিশন হাসপাতাল, বাইবেল সোসাইটি ও গীর্জা খোলে এবং বিনা মূল্যে ও স্বল্প মূল্যে তাদের বহু বিভ্রান্তকর বই–পুস্তক দেশে প্রচার করতে থাকে। ওলামায়ে দেওবন্দীগণ কিতাব, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, ফতুয়া, ওয়াজ, বাহাছ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তাদের এ ফিতনা থেকে সজাগ থাকার সতর্কবাণী অব্যাহত রাখেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানুবী (রহঃ), মাওলানা আবুল মনজুর ও ডঃ উজির খান প্রমুখ ব্যক্তিগণ খৃষ্টানদের সাথে জবরদস্ত মোকাবিলা করেন। তাঁরা দিল্লী, আগ্রা, শাহজাহান পুর ইত্যাদি স্থানে খৃষ্টান পার্দ্রিদের সাথে বাহাস করেন। পাদ্রিরা তাতে চরমভাবে পরাজিত হয়। বাংলাদেশে তাদের মোকাবিলায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী

দেওবন্দী ওরফে সদর সাহেবের খেদমত অবর্ণনীয়। মাওলানা কিরানবী (রহঃ) খৃষ্টানিজমের ভ্রান্তি সম্বন্ধে 'এজহারে হক' নামে যে কিতাবখানা লিখেন তার উত্তর দেয়া খৃষ্টানদের পক্ষে আজো সম্ভবপর হয়নি।

২২. ইহুদীবাদের মোকাবিলা ঃ

আন্তর্জাতিক ইহুদী সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায়ও ওলামায়ে দেওবন্দীগণ জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন।

২৩. হিন্দু ব্রাহ্মণ বা আরিয়া সমাজের সুদ্ধী আন্দোলন ফেতনা দমন ঃ

বৃটিশ বিরোধী হিন্দু, মুসলিম ঐক্য জোটে ফাটল সৃষ্টিকারী স্বামী শরধানন্দ কর্তৃক সুদ্ধী সংগঠনের মাধ্যমে সারা ভারতে যে বিশৃংখলার অগ্নিশীখা জ্বলে উঠেছিল এবং নব মুসলিমদের মুর্তাদ বা হিন্দু বানানোর যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল, ওলামায়ে দেওবন্দ তা কঠোর হস্তে দমন করেন। ১৩৪১ হিঃ ১৯২৩ ইংরেজীতে আগ্রায় প্রায় চার লক্ষ নবমুসলিম মালকানা রাজপুতদেরকে সুদ্ধী আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু বানাবার খবর ছাড়িয়ে পড়লে দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে পঞ্চাশ জন মুবাল্লিগ সেথায় উপস্থিত হয়ে তাবলিগী অফিস খোলেন এবং বিশটি মক্তব প্রতিষ্ঠিত করেন। সাথে সাথে রাজপুতদেরও ইসলামী আকায়েদের শিক্ষা দেন। যার ফলে এরতেদাদী (ধর্মচ্যুত) সয়লাব বন্দ হয়ে যায়।

২৪. কমিউনিজম ও নাস্তিকতার মোকাবিলা ঃ

মানব স্বাধীনতা ও ইসলাম বিরোধী এই মতবাদের বিরুদ্ধে ওলামায়ে দেওবন্দ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মুফতিয়ে আজম মাওলানা শফি আহমদ দেওবন্দী (রহঃ) সহ অনেকের এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ লিখনি আছে। ইহা ছাড়াও বক্তব্যের মাধ্যমে দেওবন্দীগণ এই ইজমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে জনসাধারণকে অভিহিত করে থাকেন। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দী (রহঃ) সাবেক কমুনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ষ্ট্যালিনকে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি উপদেশ দেন।

২৫. ইকামতে দ্বীনের নামে তাহরীফে দ্বীন ফিতনার মোকাবিলা ঃ

উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাবের জনৈক রাজনীতিবিদ একামাতে দ্বীনের অজুহাতে ইসলামী জগতে একটি নতুন ফেরকার জন্ম দেন এবং তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামের এক অদ্ভুত নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যা শীয়া মতবাদের সাথে বেশী মিল রাখে।

তার ঐ ব্যাখ্যার মানদণ্ডে তিনি সর্বস্তরের বুজুর্গানে দ্বীনের উপর লোমহর্ষক কটাক্ষ করেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভূতপূর্ব নেতৃস্থানীয় লিডার বর্তমান খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতা প্রফেসার মাওলানা আখতার ফারুক সাহেব, চট্টগ্রামের শাইখুল হাদীস মাওলানা মোহাঃ ইসহাক (গাজী) সাহেবের লেখা 'মওদুদী ও ইসলাম' পুস্তকটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন—

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী নিঃসন্দেহে এক প্রতিভাধর ব্যক্তি। তিনি পুঁথিগত মাওলানা নহেন। খ্যাতিগত মাওলানা। দ্বীনি এলমে তিনি সুশিক্ষিত নহেন। স্বশিক্ষিত। অবশ্য তাহার ক্ষুরধার লিখুনী আধুনিক যুক্তি বুদ্ধির লাগামহীন পথ ধরিয়া এইরূপ বেপরোয়াভাবে পরিচালিত হইয়াছে যাহার ফলে ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের অসংখ্য মনীষী সৃষ্ট ভিতটি ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিয়াছে। কোয়াক ডাক্তারের বেপরোয়া অপারেশনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর যে গুরুদশা দেখা দেয়, তাহার হাতে ইসলামের ঠিক সেই অবস্থাই দেখা দিয়াছে। ইসলামের এই নাদান দোস্ত ইসলামের সংস্কারের নামে যে সর্বনাশ সাধন করিয়াছে কোন কোন বুজুর্গের মতে কাদিয়ানীর কর্মকাণ্ডের চাইতেও উহা মারাত্মক।

পাশ্চাত্য প্রভাবিত পঞ্চ ইসলাম হইল স্যার সাইয়েদের আলীগড়ী ইসলাম, আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরেকীর খাকসারী ইসলাম, মীর্জা গোলাম আহমদের কাদিয়ানী ইসলাম, গোলাম মোহাম্মদ পারভেজের পারভেজী ইসলাম ও সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর আধুনিক ইসলাম। পাশ্চাত্য বস্তুবাদের ব্যাপক হামলা হইতে ইসলামকে হেফাজতের মহান ব্রতে অবতীর্ণ হইয়া এই নাদান দোস্তরা ইসলামকে পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে কাটিয়া ছাটিয়া এরূপ পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে যাহা পাশ্চাত্য

প্রভাবিত বস্তুবাদীদের অংশবিশেষের কাছে প্রশংসনীয় হইলেও বৃহত্তর মুসলিম মিল্লাতের কাছে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই উহা দলমত নির্বিশেষে ওলামা মাশায়েখদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং উহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শর্ষিনার মাওলানা আজিজুর রহমান, 'মওদুদী মতবাদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শর্ষীনা হইতে মাওলানা আহমদুল্লাহ ছাহেব দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচনা করেন। মরহুম মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী) (রহঃ)এর ভুল সংশোধন এই ব্যাপারে সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাবলীগ জামায়তের মুরুব্বী শাইখুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব মরহুমের 'মওদুদী ফেৎনা' বাংলায় অনুদিত হইয়া সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। পটিয়া মাদ্রাসার শাইখুল হাদীছ মাওলানা মোঃ ইছহাক (গাজী) ছাহেব এর 'মওদুদী ও ইসলাম' গ্রন্থটি এক্ষেত্রে শুধু একটি নতুন সংযোজন নহে পরন্তু একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। (আখতার) হককানি ওলামা দ্বারা পরিচালিত বলিষ্ঠ কোন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা না দেখে অনেক ইসলামপ্রিয় সরলমনা মুসলমান উক্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির দলে তাকে ভাল মনে করে সৎ উদ্দেশ্যেই যোগ দেন। তার ভ্রষ্টতার উপর অবগত হয়ে উচ্চস্তরের নেতা ও কর্মীর দলত্যাগ করার ধারাবাহিকতা অতীত থেকে এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ওলামায়ে দেওবন্দ ও ফুরফুরা প্রমুখ ঐ ব্যক্তির ভ্রান্ত আকীদা থেকে জনগণকে সতর্ক করার লক্ষে বই, পত্র–পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, বাহাস ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের দ্বীনি দায়িত্ব পালনে কোনপ্রকার ত্রুটি করেননি।

শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব বোখারী শরীফের সপ্তম খণ্ডের শেষে এই ফিতনা সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখেছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, অজ্ঞতা হেতু ঐ দলের কিছু নেতা ও কর্মীরা তাদের হীতকামনার্থী হক্কানী ওলামাগণের সাথে হিংসা বিদ্বেষের আচরণ করে যাচ্ছেন। এটা তাঁদের ঈমান ও আখেরাতের ব্যাপারে মারাত্মক পরিণতি টেনে আনতে পারে। (নাউযুবিলাহ)

২৬. মাযহাব বিরোধী মতবাদের মোকাবিলা ঃ

একটি ছোট দল 'ছহি হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানি না' মতবাদের অন্তরালে কোরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত এজমায়ে ছকুতী (নিরব ঐক্যমত) ও কেয়াছ দ্বারা সাব্যস্ত আল্লাহর মাকবুল মাযহাব বা তকলীদে শখছীকে যা যুগ যুগ থেকে হক্কানী ওলামা, পীর, আউলীয়া, গাউছ, কুতুব, রাজা, বাদশা, ধনী, দরিদ্র, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ তথা সর্বস্তরের মুসলমানগণ মেনে আসছেন, তাকে শিরক ফতুয়া দিয়ে বিশ্বে বিরাট এক ফিৎনা সৃষ্টি করে রেখেছে।

ওলামায়ে দেওবন্দীগণ তাদের উক্ত উক্তি খণ্ডন করতঃ বলিষ্ঠ প্রমাণ দিয়ে চার মাযহাবের যে কোন এক মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামের উপর থাকা ওয়াজিব (বিলগায়ের) সাব্যস্ত করেছেন। মাযহাব মানা ওয়াজিবের উপর হযরত শায়খুল হিন্দের 'ইজাহুল আদিল্লাহ', আল্লামা থানভীর (রহঃ) 'আল ইকতিছাদ', মাওলানা সারফরাজ খানের 'আল কালামুল মুফিদ', আল্লামা ইদ্রিস কান্দুলবী (রহঃ), মাওলানা কারী তৈয়ব (রহঃ), মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান (রহঃ) সাহেবের 'তাকলীদ আওর ইজতিহাদ' মাওলানা তকী ওসমানীর 'তকলীদে শখছী' বেশী প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়াও অসংখ্য কিতাব লেখা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় মাওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী দেওবন্দীর 'ছাইফুল মাজহাব' উল্লেখযোগ্য। লিখকেরও একটি কিতাব 'মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন' নামে রয়েছে। লিখনি ছাড়াও সভা, সমিতি, কমিটি, বাহাছ–মুনাজারা দ্বারা মাযহাব বিরোধীদের সাথে দেওবন্দীদের মোকাবেলা অব্যাহত রয়েছে। চার মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাবটিই হচ্ছে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের পছন্দনীয়। দলিল প্রমাণেও এই হানাফী মাযহাবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত। এই মাযহাবের ইমাম আবু হানিফাও (রহঃ) সকল ইমামগণ হতে বয়স ও মর্যাদায় বড় ও সর্বশ্রেষ্ঠ। হানাফী মাযহাবের সমস্ত মাছয়ালা যে কোরআন, হাদিস ভিত্তিক সে সম্বন্ধে আল্লামা থানভী (রহঃ)এর তত্বাবধানে লিখা মাওলানা জাফর আহমদ ওছমানী দেওবন্দী (রহঃ)এর 'এ'লাউছ ছুনান' নামীয় কিতাবটি অবিস্মরণীয়।

তাকলীদ সম্বন্ধে মাওলানা রুহুল আমিন (বশিরহাট) সাহেবের 'বোরহানুল মুকাল্লিদীন', ঢাকা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আনোয়ারুত তাকলীদ' ইত্যাদি দেখার মত। তবে গায়রে মুকাল্লেদদের মধ্যে অনেক মধ্যপন্থী লোকও আছে যাঁরা মাযহাব মানাকে শিরক মনে করে না এবং পীর, আওলিয়াদের শানেও বেয়াদবানা মন্তব্য করে না কিন্তু বেদআত শিরক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার, তাঁরা অবশ্যই অনেকের মতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

২৭. বাতিল ফকির ও ভণ্ড পীরদের মোকাবেলা ঃ

ফকিরী ও সুফিবাদের সাইনবোর্ডে একদল লোক সরলমনা ও ধর্মাজ্ঞ মুসলমানদের ঈমান ও আমল নষ্ট করে চলেছে। যুক্ত ভারতে এদের সংখ্যা অনেক বেশী। এদের অনেকে বিজাতীদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। কেউ যাদুটোনা, মেসমারিজম, (ভেলকিবাজী) জ্বীন ইত্যাদির মাধ্যমেও মুরিদানের সংখ্যা বাড়িয়ে বিনা পরিশ্রমে ভালো ব্যবসার সুযোগ করে নিয়েছে। আবার অনেকে বেপর্দায় হাতে হাতে না–মহরম মহিলাদের মুরিদ করে নানা কাল্পনিক সুসংবাদ দিয়ে তাদেরকে অবাধে উপভোগ করার সুযোগ করে নিয়েছে। এ সমস্ত ভণ্ডপীর ও ফকিরেরা কেউ কেউ মারেফাতের নামে শরীয়তের উপর আমল করা যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির প্রয়োজন মনে করে না। এদের প্রায় দরবার শরীফকে পতিতালয় ও শরাবখানা বললেও ভুল হবে না। এদের কেউ কেউ মাথায় জট রাখে। অথচ এতে ফরজ গোসল আদায় হয় না। আবার অনেকে লম্বা গোঁফ, লম্বা নখ, অসীম বিশ্রী দাড়ি, দাড়িছাটা, অবাঞ্ছিত লোম না কাটা, ময়লাযুক্ত থাকা, ছালাপরা, কাউকে কাঁথাপরা, শিকলপরা, এবং উলঙ্গও দেখা যায়।

কারো কারো দরবারে পীরকে সেজদা করা, নারী পুরুষ একসাথে নাচানাচি করে যিকির করা, বাদ্যযন্ত্র দিয়ে যিকির ও কাওয়ালী গাইতেও দেখা যায়। বেশীরভাগ এ ভণ্ডদের আড্ডা বড় বড় প্রসিদ্ধ মাজার ও দরগাহ সংলগ্নই হয়ে থাকে। এ ভণ্ডপীরদের অসামাজিক কার্যকলাপকে বাহানা করে ইসলামের শত্রুরা হক্কানী পীর মাশায়েখ ও ইসলামকে হেয়

প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালাতে অনেক সুযোগ পায়। ওলামায়ে দেওবন্দীগণ লেখনী, বক্তব্য, বাহাছ, মুনাজারা ইত্যাদির মাধ্যমে এদের ফিতনাকে নির্মূল করার সংগ্রাম চালু রেখেছেন। সুফীবাদে প্রবেশকৃত ভুলসমূহের সংশোধনে আল্লামা থানভী (রহঃ)এর লেখনী ও বক্তব্য অবিস্মরণীয়।

২৮. ফেক্‌হে ইসলামীতে রদবদল ফিতনার মোকাবিলা ঃ

বৃটিশ আমলে এ ফেতনা উঁকি মারলে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার পঞ্চম মুহতামিম (অধ্যক্ষ) মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ আহমাদ সাহেব (রহঃ) পাঁচশত ওলামার দস্তখত নিয়ে বৃটিশ সরকারের সম্মুখে 'কাজায়ে শরয়ী' কায়েমের দাবী উত্থাপন করলে ঐ বাতেল আন্দোলনটি মিটে যায়।

নিকট অতীতে আবার ঐ বাতেল আন্দোলনটি পারিবারিক আইন এবং ফেক্‌হাতে রদবদলের আওয়াজ উঠালে দেওবন্দ মাদ্রাসারই প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে সমস্ত মুসলিম দলের কমুনিশন (কাউন্সেল সভা) ডাকা হয় এবং 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড কায়েম করা হয়। যার সভাপতির দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম ফ্রন্টের দাবিতে ভারত সরকার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, মুসলিম পারসোনাল ল' তে সরকার কোন প্রকার রদবদল করবে না। পাকিস্তানেও আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইনে রদবদলের উদ্যোগ নেওয়ায় তখন ওলামায়ে দেওবন্দীগণ তার কঠোর প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেন।

২৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের সম্মানের উপর হামলাকারীদের কঠোর প্রতিবাদ ঃ

বৃটিশ আমলে লাহোরে রাজপাল নামীয় এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত খাদিজা (রাঃ)এর সম্মানের উপর আঘাত করে 'রঙ্গিলা রসুল' (নাউজুবিল্লাহ) নামে একটি অশ্লিল বই ছাপায়। তখন দেওবন্দীগণ প্রতিবাদ করলে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়। মুফতি

কেফায়াতুল্লাহ্ ও মাওলানা আহ্মদ সাঈদ (রহঃ)এর সভাপতিত্বে তার এক প্রতিবাদ সভায় বর্ষিয়ান বক্তা মাওলানা আতাউল্লাহ্ বোখারী (রহঃ)এর জোরালো বক্তৃতায় প্রভাবান্বিত হয়ে আলামুদ্দীন নামে এক সাধারণ মুসলমান রাজপালকে হত্যা করে হাসিমুখে ফাঁসির কাষ্ঠে উঠেন।

৩০. বার্থ কন্ট্রোল বা জন্মনিয়ন্ত্রণ ফিতনার মোকাবিলা ঃ

বিজাতীয় ভাবধারার ভিত্তিতে এবং অর্থনীতিক বিপর্যয় রোধের নামে একদল ইসলামী জ্ঞানে অপরিপক্ক মুসলমানের ধারণা যে, জনবিস্ফোরণও অভাবের একটি মূল বা বড় কারণ। অর্থাৎ মানুষের সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে আগামীতে এ দেশ তার ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এবং দেশে চরম অভাব বিরাজ করবে। তাই মানুষের সংখ্যা কমানোর জন্য তারা স্থায়ী অস্থায়ী অনেক কৃত্রিম পন্থা আবিস্কার করেছে এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য জাতীয়ভাবে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ আন্দোলন ও পরিকল্পনাটি একে তো ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ এ পরিকল্পনার কৃত্রিম পদ্ধতিগুলো চালুর মাধ্যমে দেশে জেনা ব্যভিচারের সয়লাব নেমেছে। ফলে জাতি আজ নানা যৌন রোগ ও জটিল জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং আসন্ন প্রায় সর্বনাশা এইডস রোগ সম্পর্কে শংকিত। ওলামায়ে দেওবন্দীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ মতবাদকে ইসলাম বিরোধী ফতোয়া দিয়ে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

'জবতে বেলাদত' প্রণেতা মুফতি শফী আহ্মদ (রহঃ), 'জবতে তাওলীদ' প্রকাশক হাটহাজারী মাদ্রাসা 'বার্থ কন্ট্রোল' প্রণেতা মুফতি ইদ্রিস সাহেব নোয়াখালী দেওবন্দী এবং মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)এর একটি বাংলা কিতাব ইত্যাদি, প্রচলিত নাজায়েজ জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেই লিখা। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ফিতনার ব্যাপারে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর খেদমত অবিস্মরণীয়।

৩১. খাকছারী মাশরেকী ফিতনার মোকাবেলা ঃ

আল্লামা এনায়েতুল্লাহ খান মাশরেকী নামে এক ব্যক্তি ইসলামের অপব্যাখ্যার ময়দানে অবতীর্ণ হয়। কোরআন হাদীসে উল্লেখিত ধর্মীয়

এল্‌ম বা জ্ঞানের যে সমস্ত ফজীলত বর্ণিত আছে, এনায়েতুল্লাহ্‌ খান সেগুলোকে ইউরোপীয় সাইন্স বিজ্ঞানের জন্যেই বর্ণিত মনে করে এবং কোরআনে বর্ণিত বেহেস্তী গেলমানকে সে ইউরোপের ছেলে বলে মনে করে। আর কোরআনে বর্ণিত বেহেস্তী হুর এর ব্যাখ্যা তার নিকটে ইউরোপীয় নারী ইত্যাদি। (নাউজুবিল্লাহ) তার এহেন ধৃষ্টতা ও অপব্যাখ্যার প্রতিবাদে ওলামায়ে দেওবন্দীগণ লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সিংহের মত গর্জে উঠেন এবং ঐ ফিতনাকে নির্মুল করে দেন। মাওলানা মঞ্জুর নো'মানী দেওবন্দীর 'আল–ফোরকান' পত্রিকা ইত্যাদিতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৩২. বিধবা বিবাহ আন্দোলন ঃ

হিন্দুধর্মের ছোঁয়ায় এক সময় ভারতবর্ষে বিধবা মুসলিম নারীর বিবাহ বহু দোষণীয় ছিল। দেওবন্দী ওলামা এবং তাঁদের মুরুব্বীগণের আপ্রাণ চেষ্টায় এই কুপ্রথাটি নির্মূল হয়ে যায়। মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) স্বীয় বুড়ী বোনকে বিবাহ দিয়ে ঐ কু–রুসুমটিকে উচ্ছেদ করেন। ইত্যাদি।

—তারীখে দারুল উলুম দেওবন্দ, খতবায়ে এসতেকবালিয়া, কারী তৈয়ব (রহঃ), ইত্যাদি অসংখ্য কিতাব হতে সংগ্রহিত।

বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামাদের অবদান

উপমহাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা, উপনিবেশিক শক্তি ও পরাধীনতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনসমূহে বাঙালী দেওবন্দী ওলামাগণ অগ্রবর্তী সেনানী ছিলেন। ভারত আজাদীর পর পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান হওয়ার পর তাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম আন্দোলনে সক্রিয় জড়িত ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক মুসলিম লীগ সরকারের ইসলামী শাসনতন্ত্র আইন পাশে গড়ি মসির বিরুদ্ধে এবং আইউব সরকারের ইসলাম বিরোধী 'মুসলিম পারিবারিক আইন' প্রত্যাহারের জন্য কড়া প্রতিবাদ, গণ আন্দোলন সৃষ্টি, আইউব কর্তৃক ঈদের চাঁদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করার বিরোধিতাসহ দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম হাদিস অমান্য মতবাদ,

কাদিয়ানী মতবাদ, খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা, কমিউনিজম মতবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ, ডঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক ইসলামকে আধুনিকীকরণ মতবাদ, মহররমের তাজিয়া মিছিল, কবর পূজা, পীর পুজা ও যাবতীয় শিরক বিদ্য়াত, হিন্দুয়ানী ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতি ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামাগণ বাংলাভাষাকেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। স্বাধীন–পূর্ব উভয় পাকিস্তানে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' দলটিই বৃহত্তম ইসলামী দল ছিল। যার সভাপতি ছিলেন মাওলানা শাব্বির আহ্মদ ওসমানী দেওবন্দী (রহঃ)। এ জমিয়তের পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি ছিলেন মাওলানা নেছার উদ্দীন (রহঃ) পীর সাহেব শর্শিনা। তাঁর বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তখনও ঐ দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন মাওলানা আতহার আলী (রহঃ)। যিনি ছিলেন মাওলানা থানভী (রহঃ)এর খলীফা এবং দেওবন্দ মাদ্রাসারই ফারেগ। পরবর্তীতে মাওলানা আতহার আলী (রহঃ) 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান' শাখার সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই দল পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র চালু করার লক্ষ্যে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নির্বাচন পরিচালনার জন্যে একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করেন। মাওলানা আতহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে নিজেদের দাবী ও শ্লোগানের ভিত্তিতেই তার নাম রাখা হয় 'নেজামে ইসলাম পার্টি।' সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলানা ভাষানীর 'মুসলিম আওয়ামী লীগ', মাওলানা আতহার আলী সাহেবের 'নেজামে ইসলাম পার্টি'ই ছিল বিরোধী দলীয় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। বিরোধী দলসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্ন দেখা দিলে মাওলানা আতহার আলী সাহেব, এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার শর্তে তাতে যোগ দেন। খেলাফতে রব্বানী পার্টিও ঐ ফ্রন্টের অঙ্গ দল ছিল।

২১ দফার ফিত্তিতে ইসলামী শাসন কায়েমের ওয়াদায় গঠিত 'আতহার হক ভাসানীর যুক্ত ফ্রন্টের' হাতে মুসলিম লীগ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে।' ৫৪ এর নির্বাচনে মাওলানা আতহার আলী সাহেব কিশোরগঞ্জ থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টে নেজামে ইসলামের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে তা ছিল ৪ জন। তা সত্ত্বেও নেজামে ইসলাম পার্টি কেন্দ্রে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা এবং প্রাদেশিক পরিষদে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের নামকরণ করা হয় 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় নেজামে ইসলাম পার্টির কুমিল্লার মৌলভী আশরাফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী দেওবন্দী শিক্ষামন্ত্রী, এডভোকেট নাসীরুদ্দীন আইনমন্ত্রী এবং নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন মৌলভী এডভোকেট ফরীদ আহমদ। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ খতীবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব (রহঃ) মাওলানা আতহার আলীর দক্ষিণ হস্ত ও অন্যতম নেতা হিসেবে পার্টির দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা আতহার আলীর বার্ধক্যজনিত কারণে নেতৃত্ব ত্যাগ করার পর খতীবে আজম (রহঃ) তাঁর সহকর্মী মাওলানা সাইয়েদ মোসলেহুদ্দীন সাহেবকে নিয়ে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম সংগঠনটির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ (রহঃ) নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে নিজ এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী দেওবন্দী (রহঃ) মুসলিম লীগ ত্যাগ করে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের পার্লামেন্টারী দল গঠন ও নেজামে ইসলাম পার্টির যুক্তফ্রন্টে শরিক হবার প্রশ্নে নেজাম নেতাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা যুক্তফ্রন্ট অপেক্ষা মুসলিম লীগকে তুলনামূলকভাবে শ্রেয় মনে করতেন। সে নির্বাচনে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী তুলনামূলকভাবে শ্রেয় মনে করতেন। সে নির্বাচনে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) মুসলিম লীগ

পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদানকারী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তার দ্বারাই পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হয়। শাসনতন্ত্রে দেশে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন চালু করার সংবিধানিক প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। ঐ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে শরীক ছিল যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন সরকার। তখন জাতীয় পরিষদে ইসলামপন্থী সদস্যদের নেতৃত্ব দিতেন মাওলানা আতহার আলী দেওবন্দী (রহঃ)।

২৪শে জানুয়ারী ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গোটা পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে সকল মত ও পথের ৩১ জন ওলামা প্রতিনিধি ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতির খসড়া প্রণয়ন করেন। সে সভাটি মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী দেওবন্দী (রহঃ)এর উদ্যোগে এবং সাইয়েদ মাওলানা সুলাইমান নদভীর সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হয়। যিনি হলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দীরই বিশিষ্ট খলীফা। বাঙালী আলেম মাওলানা ফরিদপুরী দেওবন্দীও উক্ত মূলনীতি প্রণয়নকারীদের অন্যতম।

সার্বজনীন ভোটাধিকার তথা হৃত গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওলানা আতহার (রহঃ) ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিকদের ভোটে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আইউব খানের বিরোধিতা করায় আইউব খান কর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন। ঐতিহাসিক সিমলা কনফারেন্সেও মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আতহার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মাওলানা ফরিদপুরীর ভাষণে জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি করতে আগ্রহী হন। তবে তিনি তাঁর স্থলে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর জন্য উক্ত প্রস্তাবকে অসম্মতি জানান।

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মশিক্ষাকে উপহাসকারী শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদেও বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) সর্বত্র এর বিরুদ্ধে জনসভা করেছেন।

আইউবের মার্শাল ল' ভঙ্গ ও তার সামনে নির্ভিকতা, তাঁর দশ লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান ও সেনাবাহিনীর বেষ্টনীতে তার সাথে বাকযুদ্ধ ইত্যাদি দুঃসাহসিকতার অনেক ঘটনা মাওলানা ফরিদপুরী দেওবন্দীর জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর দেওবন্দী অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং স্বাধীনোত্তর কয়েক বৎসর বাংলাদেশে ইসলাম ও ওলামাদের চরম দুর্দিন বিরাজ করছিল। হাজার হাজার ওলামা শাহাদত বরণ করেন এবং অসংখ্য ধর্মীয় মাদ্রাসা, মক্তব তালাবদ্ধ করা হয়। ধর্মীয় সমস্ত রাজনৈতিক দল সরকারীভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বেশুমার ওলামা কারারুদ্ধ হন। অবশেষে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ধীরে ধীরে সব সংকট দূর হয়ে যায়।

১৯৭২ এর ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানে আওয়ামী মুজিব সরকার ধর্মের নামে যাবতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ বিল পাশ করলে ওলামায়ে কেরাম মাদ্রাসা, মক্তব, পীর মুরীদী, ওয়াজ-নসিহত, তফসীর ও সিরাত মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু অরাজনৈতিকভাবেই দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আর নিষিদ্ধ ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদির অন্তরালে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' রাজনীতি শুরু করেন।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদলের হাতে স্বপরিবারে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করলে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং খন্দকার মুস্তাক আহমদ ক্ষমতায় বসেন। খন্দকার মুস্তাক আহমদ অনেক ধর্মীয় রাজবন্দীদের মুক্তি দেন।

১৯৭৫ সালের সামরিক বিপ্লবের পর স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উঠিয়ে দেন এবং মুজিব সরকারের 'ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ' আইন বাতিল করে দেন। মরহুম জিয়ার উক্ত আইনের

বলে ১৯৭৬ সালে নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী প্রভৃতি ৫টি সংগঠনের নেতাদের উদ্যোগে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই.ডি.এল) নামে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ঐ দলের সভাপতি নিযুক্ত হন খতীবে আজম মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ চাটগামী দেওবন্দী (রহঃ)। আর সাবেক জামাত প্রধান মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব নিযুক্ত হন এর সহ–সভাপতি। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে আই.ডি.এল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাওলানা আবদুর রহীম গ্রুপ, মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ গ্রুপ। অতঃপর আই.ডি.এল. বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৮৩তে মাওলানা আবদুর রহীম তার দলের নাম রাখেন 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' অন্যদিকে মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ সাহেব তাঁর প্রিয় পুরাতন দল নেজামে ইসলামের আমরণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

জামাত নেতা প্রফেসার গোলাম আযম বাংলাদেশে আসার পর প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীমের সাথে তার নানা কারণে তুমুল মতভেদ দেখা দিলে জামাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে আই. ডি. এল নামে, অপর ভাগ প্রফেসার গোলাম আজমের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ মওদুদী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ও মনোনীত 'জামাতে ইসলামী' নামেই কাজ করতে থাকে।

বাংলাদেশে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে যে প্রসিদ্ধ ইসলামী দলটি বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছে সে দলটিও দেওবন্দী ওলামাদের দ্বারা গঠিত। এ দলের প্রবক্তা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহাসাধক হযরত মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজী হুজুর (রহঃ)। তিনি নোয়াখালীর বাসিন্দা, দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এরই সুযোগ্য খলীফা। যিনি প্রথমত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা আন্দোলন, মাদ্রাসায় অধ্যাপনা, পীর–মুরীদি, ওয়াজ–নছিহত ইত্যাদির মাধ্যমে অরাজনৈতিকভাবে ইসলামের অসীম খেদমত করেছেন।

১৯৭৮ সালের মে মাসে দশ সদস্যের একটি ওলামা প্রতিনিধি নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে প্রায় তিন ঘন্টা

ব্যাপী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রাণের দাবী 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৮১ সালের ১৯শে আগষ্টে ঢাকায় শীর্ষস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবি সম্মেলনের সিদ্ধান্তে তিনি ৮১ এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁকে বি. এন. পি সরকারের তরফ থেকে নির্বাচন হতে সরে দাঁড়ানোর জন্য অনেক অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন, "আমি জেহাদের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। আর মুসলমানদের জন্য জেহাদের ময়দান থেকে পিছপা হওয়া হারাম।"

নির্বাচনোত্তর ওলামা, মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবিদের তিন দিন ব্যাপী এক আলোচনা সভায় একটা ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অতঃপর ৮১ এর ২৯ নভেম্বর লালবাগ শায়েস্তা খান হলে প্রায় দশ সহস্রাধিক লোকের সম্মেলনে হযরত হাফেজী হুজুর 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন' এর নাম ঘোষণা করেন।

এই মহাসাধক ব্যক্তিত্বের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। নির্বাচন শেষ হবার পর সৌদী আরব, লিবিয়া, ইরান, ইরাক সহ ইসলামী বিশ্বের অনেক দেশে বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূতগণ হাফেজ্জী হুজুরের সাথে এসে সাক্ষাত করেন। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণও হাফেজ্জীর আন্দোলন সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে দেখার ও জানার আগ্রহ প্রকাশ ও দাওয়াত আসে।

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের চক্রান্তে সৃষ্ট ইরান, ইরাকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষে ১৯৮২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে এক 'শান্তি মিশন' উপসাগরীয় দেশ দুটিতেও সফর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তাতে তিনি সফল হননি। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৫ সালের ২৯ জুলাই ১০ জন তাঁর

ছফরসঙ্গীগণ সহ লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। শতাধিক দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সে সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সংহতি এবং ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হাফেজ্জী হুজুর সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে ৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ হলো ঃ

১. কোরআনের আয়াত 'ই'তেসাম বিহাব লিল্লাহর' (আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়ভাবে ধরার ভিত্তিতে) সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং জিহাদ অব্যাহত রাখা। ধর্মপ্রাণ ওলামা, বুদ্ধিজীবি সমন্বয়ে 'আহলুল হাল্লে ওয়ালা আক্বদ' দ্বারা খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করা এবং একটি মজলিসে শুরার পরামর্শে খলীফা বা আমীর মুসলিম উম্মাহ্কে পরিচালনা করবেন।

২. খেলাফতের প্রধান কেন্দ্রস্থল হবে মক্কা অথবা মদীনায়।

৩. একটি ওলামা বোর্ড উপসাগরীয় যুদ্ধসহ সকল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিস্পত্তি করবে। কোনো পক্ষ বোর্ডের রায় অমান্য করলে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সে পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হলেও রায় মানতে বাধ্য করবে।

৪. মুসলিম দুনিয়ার যোগাযোগের ভাষা হবে আরবী এবং খেলাফতের রাষ্ট্রিয় ভাষা হবে আরবী। আর খেলাফতে ইসলামীয়ার একটি বেতার কেন্দ্র থাকবে।

৫. বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষাকল্পে একটি বিশেষ সমন্বয় কমিটি গঠন করা। ইসলামী আন্দোলন সংস্থাগুলোকে সহায়তা এবং ইহুদীদের কবল থেকে ফিলিস্তিন ও প্রথম কেবলা 'মাসজিদুল আকছাকে' মুক্ত করার পক্ষে একটি বায়তুল মাল গঠন করা।

হাফেজ্জী হুজুরের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের ঘোষণা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে শত্রু–মিত্র সকলের মধ্যে বিরাট অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়। তওবার আহবান জানায়ে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে এসেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ চরিত্রের মুজাহিদদের দ্বারা সমাজ বিপ্লব ঘটাতে। সে সমাজ

বিপ্লব সমাজ জীবনের সকল স্তরের জালিম, শোষক ও প্রতারক নেতৃত্বের জন্যে সকল যুগেই আতঙ্কগ্রস্ত হয় বৈকি।

হাফেজ্জী হুজুর জেনারেল এরশাদকেও বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করার জন্য অনুরোধ জানান। হযরত হাফেজ্জী হুজূর এরশাদের সামরিক শাসনামলে বার বার সামরিক আইন ভঙ্গ করে বীরের মত রাজনৈতিক সভা, সমিতি করেছেন এবং তাঁর দলের অনেক নেতা–কর্মী পুলিশী ও কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন।

১৯৮৩ সালের ২৩ জুলাই হাফেজ্জী হুজুর কামরাঙ্গিচর মাদ্রাসার ঐতিহাসিক গোলটেবিল সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মুখে তিনটি বৈপ্লবিক দাবী উপস্থাপন করেন—

(১) দেশকে অবিলম্বে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

(২) ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞদের দ্বারা একটি ইসলামী সংবিধান রচনা ও তার উপর গণভোট গ্রহণ।

(৩) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে তার তত্বাবধানে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই তিনটি, দাবীর প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে দশ দল মিলে একবার খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান জামাত নেতা মাওলানা আবদুর রহীম এবং সাবেক বর্ষিয়ান জামাত নেতা মাওলানা ব্যারিষ্টার কোরবান আলী ও তাদের দল ইসলামী ঐক্য আন্দোলন এবং সাবেক জাসদ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মেজর আবদুল জলিলের 'মুক্তি আন্দোলন' দলটি খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা কোরবান আলী ও মেজর আবদুল জলিল প্রমুখ জাতীয় নেতাগণ হাফেজ্জী হুজুরকে আমীরে শরীয়ত মেনে নিয়ে তাঁর সাথে ইসলামী আন্দোলনে যুগপৎ শরীক ছিলেন।

সাবেক জামাত নেতা দৈনিক সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, প্রফেসার মাওলানা আখতার ফারুক, জামাতের আদর্শ ত্যাগ করে হাফেজ্জী হুজুরের হাতে মুরিদ হন এবং তাঁর খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। অনুরূপভাবে জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র

শিবির নেতা প্রফেসর আহমদ আব্দুল কাদেরও খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন।

জামাত নেতা প্রফেসর গোলাম আজম ও প্রখ্যাত বক্তা জনাব মৌলভী সাঈদী সাহেবও হাফেজ্জী হুজুরের সাথে ঐক্যের ব্যাপারে সাক্ষাত করেন। কিন্তু মওদুদী সাহেবের বিতর্কিত ও আপত্তিকর মতামতগুলো বর্জন প্রসঙ্গ উত্থাপন হওয়াতে শেষ পর্যন্ত জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে হাফেজ্জী হুজুরের ঐক্যমতে আসা কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে জামাত, এরশাদ বিরোধী ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ২২ দলের প্রোগামের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে সাবেক জামাতের প্রধান আমীর মরহুম মাওলানা আবদুর রহিম, সাবেক জামাত নেতা মাওলানা ব্যারিষ্টার কোরবান আলী এবং জামাতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক শীর্ষস্থানীয় জামাত নেতা মাওলানা আখতার ফারুক প্রমুখগণ প্রচলিত গণতন্ত্রকে ইসলাম বিরোধী বলে ফতুয়া দেন এবং বলেন, প্রচলিত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ আর 'ইসলামে' সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।

অন্য কথায় 'গণতন্ত্রে' নেতা নীতি উভয়টা পরিবর্তনের অধিকার জনগণের রয়েছে। আর 'ইসলামে' নেতা পরিবর্তনের অধিকার জনগণের রয়েছে কিন্তু নীতি পরিবর্তনের অধিকার নেই। উহা আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের এ মৌলিক পার্থক্যের কারণেই তাঁরা প্রচলিত গণতন্ত্রকে নাজায়েজ বলে বিভিন্ন সভা-সমিতি, বই-পত্রিকাতে বিবৃতি দেন। (ইসলামী দলগুলোর মধ্যে কোন দলের যদি কোন মৌলিক ভুল-ভ্রান্তি থাকে তা ওলামা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংশোধন করে নেওয়া এবং ভুল সংশোধনের পর প্রত্যেক ইসলামপন্থীদের ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তা না হলে ইসলামী আন্দোলন কামিয়াব হবার আশা করা যায় না এবং ইসলামীদের অভ্যন্তরীন কোন্দল ও কাদা ছোড়াছুড়িকে কেন্দ্র করে বাতিলপন্থীরাই তাদের রাজনৈতিক হীনস্বার্থ হাসিল করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে। এ ব্যাপারে ইসলামী দলের কর্মীরা নেতাদেরকে চাপ সৃষ্টি করলে আশাব্যাঞ্জক ফল পাওয়া যেতে পারে।)

হযরত হাফেজ্জী হুজুর বাংলাদেশে দুইটি বৃহত্তম দলের মহিলা নেতৃদ্বয়কেও রাজনীতি হতে সরে দাঁড়াবার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মুরুব্বী হিসাবে রাজনীতি করছি। রাজনৈতিক অঙ্গনে তোমাদের প্রয়োজন নেই। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। হাফেজ্জী হুজুরের ডাকে খুব অল্প সময়েই ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হওয়াতে সর্বপ্রকার বাতিল মতবাদীদের টনক নড়ে যায়, স্বৈরাচারের সিংহাসন কেঁপে উঠে। ফলে তাঁর দলটি হয়ে যায় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। ফলশ্রুতিতে তার ওফাতের পর তাঁরই ভক্তদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'খেলাফত মজলিস' নামে নতুন আরেকটি সংগঠনের জন্ম দেন। এর নেতৃত্বে রয়েছেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব দেওবন্দী, মাওলানা আবদুল গাফফার প্রমুখ।

১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটি ইসলামী ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করে। সে ফ্রন্টটিও ওলামায়ে দেওবন্দীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। মাওলানা আজিজুল হক সাহেব ও চরমোনাই এর পীর মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব পরপর দলটির প্রধান মুখপাত্র হন। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুর রহীম এ ফ্রন্টটির সাথেও জড়িত ছিলেন। বর্তমানে ব্যারিষ্টার কোরবান আলী সাহেবও দলটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। দলটির প্রকাশকালে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব সহ অনেক নেতা ও কর্মী এরশাদের পুলিশী ও কারা নির্যাতনের শিকার হন। ইহা ছাড়াও পূর্বের 'নেজামে ইসলাম পার্টি' শায়েখে কৌড়িয়া মাওলানা আবদুল করিম দেওবন্দী ও মাওলানা শামছুদ্দীন কাছেমী দেওবন্দীর নেতৃত্বাধীন 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ', বর্তমান ফারাজী আন্দোলন ইত্যাদি দেওবন্দী ওলামাগণ দ্বারাই পরিচালিত।

১৯৯১ এর নির্বাচনে যে ইসলামী ঐক্য জোট গঠিত হয় সে জোটের অধিকাংশ দলই ছিল দেওবন্দীদের। জোট প্রধান মাওলানা আজিজুল হক সাহেব তিনিও দেওবন্দী। বর্তমানে ওলামায়ে দেওবন্দী হক্কানীদের একজন গণপ্রতিনিধি সংসদ সদস্য মাওলানা ওবাইদুল হক সাহেব।

মোটকথা, বৃটিশ খেদানো আন্দোলন হতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশী

ওলামায়ে দেওবন্দীগণ রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও জাতীয় কাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো যদি কোন দিন এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রচলিত নিয়মে রাজনৈতিক অঙ্গনে তৎপর হয়ে উঠে তাহলে ধর্মনিরপক্ষ শক্তি, কমিউনিজম শক্তি, কৃত্রিম ধর্মব্যবসায়ী শক্তি ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সব খান খান হয়ে যাবে।

বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামাদের কয়েকটি ছাত্র সংগঠনও আছে। যেমন—ইসলামী ছাত্র সমাজ, ইসলামী ছাত্র ফৌজ, ইসলামী ছাত্রদল, ছাত্র মজলিস, খেলাফত ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি এবং অনেক কয়টি পত্রিকাও তাদের চালু আছে। যেমন— মাসিক আততাওহীদ, মাসিক জাগো মুজাহিদ, মাসিক মঈনুল ইসলাম, মাসিক দাওয়াত, দ্বীনে হানিফ, মাসিক পাথেয়, জাগো প্রহরী, সাপ্তাহিক খেলাফত, কাওনাইন, এত্তেসাল মাইমান এবং সাপ্তাহিক বিক্রম ও মাসিক মদিনা পত্রিকা দুটিতেও দেওবন্দীদের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক অনেক খবরা-খবর প্রকাশ করে তাকে।

উল্লেখিত রাজনৈতিক সংস্থাগুলো ছাড়াও দেওবন্দীদের দ্বীনি প্রসার কল্পে অসংখ্য অরাজনৈতিক সংস্থাও আছে যেমন ঃ মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর খাদেমুল ইসলাম জামায়াত, চরমোনাইর পীর সাহেবের মুজাহিদ কমিটি, জামিল মাদ্রাসার পরিচালিত তাহরীকে দাওয়াতুল হক এবং মজলিসে দাওয়াতুল কোরআন সংস্থা। মাওলানা আজিজুর রহমান পরিচালিত 'ইসলাম প্রচার সংস্থা' এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে হক্কানী ওলামাদের লেখা বই-পুস্তক সমাজে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয় এবং নিরক্ষর লোকদেরকে স্বল্প সময়ে ছহীভাবে কোরআন শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া হয়। দাওয়াতুল কোরআন সংস্থার সম্পাদক মাওলানা হাফেজ ইয়াকুব সাহেব বলেন, গত ৯০ সনেই সর্বস্তরের বিশ হাজার মুসলমান উক্ত দাওয়াতুল কোরআন সংস্থার মাধ্যমে কোরআন পড়তে, নামায, দোয়া দ্বীনি মাসলা-মাসায়েল শিখতে সক্ষম হয়।

হাফেজ্জী হুজুরের 'দাওয়াতুল হক' সংস্থা বিশিষ্ট আলেম ও দেওবন্দীদের মুখপাত্র মাওলানা হাবিবুল্লাহ মেসবাহ সাহেবের 'মজলিছুত তাহকীকাতিল ইসলামীয়া', ফরিদাবাদের 'এদারাতুল মায়ারেফ' এ সংস্থার

মাধ্যমে ধর্মীয় বই–পুস্তক ছাপানো হতো।

বাংলা ভাষায় বই–পুস্তক প্রকাশ করে মুসলমানদের উপকার করার পরেও ওলামাদের উপকার করার ব্যাপারে ওলামাগণের মধ্যে মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)এর জুড়ি নেই। সর্বজন পরিচিত বেহেস্তি জেওর বাংলা (অনুবাদ), হক্কানী তাফসীর ইত্যাদি ফরিদপুরী সাহেবেরই লেখা। বাংলা অনুবাদ বোখারী শরিফ তাঁর ফয়েজ ও বরকতেই মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের লেখা।

মাওলানা আতহার, মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ, মাওলানা ফরিদপুরী, মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর প্রমুখ উল্লেখিত দেওবন্দী রাজনৈতিক ওলামাগণ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকার মাওলানা আব্দুল মজিদ খান, ফেনীর ওলিয়ে কামেল মাওলানা আবদুল হালিম ছাহেব (রহঃ), হেকিম আব্দুল হক, মাওলানা ইব্রাহিম, নোয়াখালীর মাওলানা কাসেম, মাওলানা নজীর আহমদ শহীদ শর্শদী, মাওলানা নজিবুল্লাহ, মাওলানা আহমদুল্লাহ আশ্রাফ, মাওলানা নুরুল হুদা, মাওলানা আব্দুল গণি, মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেছবাহ, মাওলানা মোস্তফা হোছাইনী, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা ইদ্রিস (বোখারী সাহেব) মুদ্দাজিল্লুহ, (লিখকের পিতা) মাওলানা মহিববুল্লাহ ছাহেব, চট্টগ্রামের মুফতি ইউসুফ, হাজী ইউনুছ ছাহেব, মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব মাদ্দাজিলুহুম, মাওলানা আব্দুল মালেক, মাওলানা আমজাদ, মাওলানা মজাহারুল ইসলাম, সিলেটের মাওলানা মুশাহেদ আলী, মাওলানা নুরউদ্দিন, মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া, মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাওলানা তাজাম্মুল আলী, মাওলানা ওবায়দুল হক খতীব বায়তুল মুকাররম, যশোহরের মাওলানা মুফতী ওক্কাস (সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী), মাওলানা আবুল হাছান যশোহরী।

সৈয়দপুরের মাওলানা ছালাহ উদ্দিন, মাওলানা হেকীম সাহেব, কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাউর রহমান খান, নারায়নগঞ্জের মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী, এঁরা ছাড়াও মাওলানা মু'তাসেম বিল্লাহ, মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাছউদ প্রমুখ ওলামায়ে দেওবন্দীগণ স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতিকালে বহু বাংলাদেশী ওলামায়ে দেওবন্দী ও তলাবা

ছাত্রবৃন্দ আফগান কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর মাধ্যমে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন। যশোহরের কমাণ্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী দেওবন্দী, মাওলানা নুরুল করিম, হযরত হাফেজ্জী হুজুরের দোহিত্র হাফেজ রহমাতুল্লাহ সহ এ পর্যন্ত ২২ জন বাংলাদেশী দেওবন্দী ওলামা ও ছাত্রবৃন্দ আফগান জেহাদে শাহাদতবরণ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ ঢাকা বায়তুল মুকাররম এর পেশ ইমাম মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী, তিনিও দেওবন্দী এবং চট্টগ্রাম 'আন্দরকিল্লা' জাতীয় মসজিদের ইমাম আওলাদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলানা আবদুল আহাদ মাদানী তিনিও দেওবন্দী। বাংলাদেশের বিখ্যাত আদর্শ আলিয়া মাদ্রাসা শর্ষিনার দীর্ঘকালের সাবেক হেড মোহাদ্দেস মাওলানা খাত্তানী (রহঃ) এবং ঐ মাদ্রাসারই পীরজাদা মাওলানা আবু ছালেহ মরহুম তিনিও দেওবন্দী।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র ডবল টাইটেল মাদ্রাসা মুস্তাফাবীয়া বগুড়ার দীর্ঘকালের সাবেক প্রিন্সিপাল ও রেক্টর মাওলানা নজীবুল্লাহ ছাহেব তিনিও দেওবন্দী আকীদায় বিশ্বাসী। তিনি ব্যতীত মুস্তাফাবিয়ার বিখ্যাত আরো অনেক মুফাচ্ছের মুহাদ্দেসগণ দেওবন্দী সেলসেলা ভক্ত ছিলেন। বর্তমান মুস্তফাবীয়ার শিক্ষক ষ্টাফ প্রায় দেওবন্দী ওলামাগণেরই শিষ্য। ইহা ছাড়া বর্তমান এবং অতীতে দেশের সরকারী বেসরকারী সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদসমূহ প্রায় ওলামায়ে দেওবন্দীগণ দ্বারাই অলংকৃত।

সিরাজগঞ্জের আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা দলীলুর রহমান (রহঃ) ও মুহাদ্দেস মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, উভয়ই দেওবন্দী। ওলামা বাজার ও নোয়াখালী কারামাতিয়া ইত্যাদি মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষক এবং মহিমাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দেস মাওলানা ইদ্রিস সাহেব বোখারী (লিখকের পিতা) তিনিও দেওবন্দী।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ধর্মবিভাগের প্রধান ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দেস ছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী। যিনি মাওলানা থানভী (রহঃ)এর ভাগ্নে। বর্তমান ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক দেওবন্দী তিনিও এক সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন।

এছাড়াও অন্যান্য অসংখ্য অবদান কলমের আঁচড়ে ও মুখের ভাষায় ব্যক্ত করা দুস্কর ব্যাপার। (বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক হতে সংগ্রহীত)

আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ

অনেকেই বিশেষ করে বৃটিশ সরকার ও তাদের সেবাদাস বেদআতী রেজবী গ্রুপের লোকেরা ওলামায়ে দেওবন্দ সম্বন্ধে এই অপপ্রচার করে থাকে যে, এরা কাফের ও ওয়াহাবী। হানাফী, সুন্নী নয়। তাই এখানে ওলামায়ে দেওবন্দীদের আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস কি—তাদের গ্রন্থরাজী হতে বিশ্বস্ততার সহিত উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁদের আকায়েদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ'—সৈয়দ মাহবুব রেজভী, 'আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ'—মাওলানা কারী তৈয়ব (রহঃ), 'আল মুহান্নেদ আলাল মুফান্নেদ'—মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী ও মুহাজেরে মদনী (রহঃ), 'আর রশীদ' দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী, 'আশ শেহাবুছছাকিব', 'নকশে হায়াত'–মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ), ইত্যাদি কিতাবে।

এখানে খুব সংক্ষিপ্তাকারে দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামগণের আকায়েদ পেশ করা হচ্ছে। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)এর সুযোগ্য নাতি এবং অত্র মাদ্রাসার প্রায় ৬০ বছরের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব হাফেজ কারী মাওলানা তৈয়ব সাহেব (রহঃ) বলেন, 'দারুল উলূম দেওবন্দ' (বা দেওবন্দীদের) আকীদা হলো এই—

১. ধর্ম হিসাবে তাঁরা মুসলমান।

২. ফেরকা হিসাবে আহলুছছুন্নত ওয়াল জামাত বা সুন্নী।

৩. মাযহাব হিসাবে হানাফী।

৪. মসরর (মেজাজ) হিসাবে ছুফী।

৫. কালাম (আকীদাগত) হিসাবে মাতুরীদি। অর্থাৎ ইমামে আহলে ছুন্নাত আবুল মনছুর মাতুরীদি (রহঃ)এর ব্যাখ্যার অনুসারী।

৬. ছুলুক (তরীকত) হিসাবে চিস্তী এবং সমস্ত ছিলছিলা ও তরীকার সমর্থক।

৭. ফিকির বা চিন্তাধারা হিসাবে ওয়ালীউল্লাহী। অর্থাৎ ভারত মুরুব্বী শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলবী (রহঃ)এর চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮. উছুল (অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রমাণে দাবী পেশা করা) হিসাবে কাসেমী।

৯. ফরু ও তাফাক্কুহ (শরীয়তের মাসায়েল বুঝা) হিসাবে রশীদী।

১০. এজতেমায়ীয়াত হিসাবে মাহমুদী। (দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ও প্রথম ওস্তাদের নাম ছিল মাহমুদ)।

১১. নেছবত (কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক) হিসাবে দেওবন্দী—(আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ ও তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ)।

এ দেওবন্দী চিন্তাধারা ৭টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—

১. ইলমে শরীয়ত।

২. ফায়বরীয়ে তরীকত।

৩. এত্তেবায়ে সুন্নাত।

৪. ফেকহিয়ে হানাফিয়ত।

৫. কালামিয়ে মাতুরীদিয়াত।

৬. দেফায়ে জাইগ ও জালালত।

৭. যওকে কাসেমিয়াত ও রশীদিয়ত। অর্থাৎ

(ক) ঈমান, ইসলাম বা শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা যা হক্কানী ওলামাগণের মাধ্যমে সংগ্রহীত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে জ্ঞানের সূত্র রয়েছে।

(খ) ইসলামী মূলনীতির অধীনে বিজ্ঞ ছুফীগণের ছিলছিলা ও তরীকার মাধ্যমে (যেমন চিশতীয়া, নকশে বন্দিয়া, কাদেরিয়া, মুজাদ্দিদিয়া) আত্মশুদ্ধি করা যাকে ইসলামের পরিভাষায় ইহছান বলা হয় ; যদ্দারা ঈমান ও ইসলাম পরিপক্ক ও সুন্দর হয়।

(গ) জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ করা যা ছাড়া বেদয়াত কুপ্রথা ইত্যাদি বর্জন করা সম্ভব নয়।

(ঘ) ফতুয়া মাছয়ালা ইত্যাদি ফরয়ী ও এজতেহাদী ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করা। ইহা ইসলামের সাথে সংযুক্ত।

(ঙ) আকীদা ও দর্শনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আসায়েরাহ ও মাতুরীদিয়ার আকীদা গ্রহণ করা। ইহা ঈমানের সাথে জড়িত। ইসলামের বিরুদ্ধে ও হকের খেলাফ মাথাচাড়া দিয়ে উঠা বিভিন্ন বক্র ও পথভ্রষ্ট দলের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত যুগোপযোগী মুকাবিলা করা লিখিত অথবা মৌখিক মুনাজারার মাধ্যমে। ইহা এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, এজহারে দ্বীন এবং পুরা ধর্মের সাথেই জড়িত।

(ছ) উল্লিখিত সমস্ত কিছু যেহেতু সমষ্টিগতভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের দুই বড় মুরুব্বী মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)এর অন্তর দিয়ে অতিবাহিত হয়েই প্রকাশ পেয়েছে সেহেতু এ চিন্তাধারাটি একটি বিশেষ যাওক ও রঙের রূপ ধারণ করেছে ; যাকে 'মসরব' শব্দ দিয়ে ও আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা ছিফাতে এহছানের সাথে জড়িত। দেওবন্দী মছলকে এ'তেদালের বা মধ্যপন্থার এ ৭টি মূলভিত্তি। এ সাতটি অংশকে যদি শরীয়তের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে যে, এ সাতটি হল ঈমান, ইসলাম, এহছান, ইজহারে দ্বীন যা হাদীসে জিব্রাইলের সারাংশ। আর হাদিসে জিব্রাইল হল পুরা দ্বীনের সারাংশ।

সুতরাং যদি বলে দেয়া হয় যে, দেওবন্দী মতবাদ হল হাদীসে জিব্রাইল, তাহলে মোটেও ভুল হবে না।–তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ ১ম খণ্ড

দেওবন্দী ওলামাগণের উপর ওয়াহ্হাবী, লা–মাযহাবী অপবাদ ইংরেজদের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার

পূর্বে আলোচিত বর্ণনা দ্বারা এ কথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ওলামায়ে দেওবন্দীগণ খাঁটি হানাফী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতহিদীন, মুতাকাদ্দিমীন, মুতায়াক্খিরীন তথা সর্বযুগের হক্কানী পীর আওলিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যে আকীদা দেওবন্দী ওলামাগণেরও

সে আকীদা কোরআন, হাদিস, এজমা, কেয়াস দ্বারা সাব্যস্তকৃত ও জামায়াতে আহলে সুন্নাতের সর্বজন স্বীকৃত কোন আকীদায় পরিপন্থী কোন স্বতন্ত্র আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস দেওবন্দী ওলামাগণের নেই।

নজদী ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আপত্তিকর আকায়েদগুলোর সাথে দেওবন্দী ওলামাগণের আকায়েদের কোন মিল নাই। ফুরফুরা, জৈনপুরা সিলসিলার মত দেওবন্দী সিলসিলার ওলামাগণও নজদী ওয়াহাবীদের বর্জনীয় ও নিন্দনীয় আকীদাগুলোর প্রতিবাদ করে আসছেন। আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ, আলমুফান্নেদ, আশসিহাবুছ ছাকিব, নকশে হায়াত, ফয়জুল বারী, আল বায়ানুল ফাসিল ইত্যাদি কিতাবে দেওবন্দী ওলামাগণ নজদী ওয়াহাবীদের জঘন্যতম আকীদাগুলোর কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)এর সিলসিলাভুক্ত ওলামাগণ মাওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এবং মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ), মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) প্রমুখ দেওবন্দী ওলামাগণ যেহেতু নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন সেহেতু এ সমস্ত আলেম সমাজকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করে আযাদী আন্দোলনকে নস্যাত করার হীন লক্ষ্যে ধূর্ত ইংরেজরাই কখনো কখনো নিজেদের ভাষায় আবার কোন সময় ঘরের ইঁদুর দ্বারা ঘর বিনষ্ট করার নীতি অবলম্বন করে আলেম সুরতধারী ইসলাম ধর্মের কলঙ্ক আহমদ রেজা খান বেরেলভী প্রমুখ তল্পিবাহকদের মাধ্যমে সর্বজন ধিকৃত ও ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গালি 'ওয়াহাবী, লা–মাযহাবী' অপবাদের তীরটি নিক্ষেপ করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় বৃটিশ সরকার উৎখাত হয়ে গেলেও তাদের রেখে যাওয়া দোসরদের ফিতনা থেকে জাতি আজও নিস্কৃতি পায়নি।

ফুরফুরা মেদেনীপুর জৌনপুরা ও দেওবন্দী একই সিলসিলাভুক্ত

অবিভক্ত ভারতে ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রচারক ও প্রসারক এবং আযাদী আন্দোলনের মূল প্রবর্তক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেওলভী

(রহঃ) ও তাঁর সিলসিলাই ফুরফুরা, জৈনপুরা, মেদেনীপুর ও দেওবন্দী সিলসিলার মূল। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), তাঁর উস্তাদ মাওলানা আবদুল গনী (রহঃ)। তাঁর উস্তাদ মাওলানা এসহাক দেহলভী (রহঃ)। তাঁর উস্তাদ শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ)। আর তাঁর উস্তাদ হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)।

ফুরফুরা শরীফের মূল হাদিয়ে বাঙাল ও আসাম মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকী (রহঃ) ; তাঁর পীর হলেন মাওলানা ছুফী ফাতেহ আলী (রহঃ)। আর তাঁর পীর মাওলানা ছুফী নূর মুহাম্মদ নেজামপুরী (রহঃ) গাজীয়ে বালাকোট। আর তাঁর পীর মাওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)। আর তাঁর পীর শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)। আর তাঁর পীর হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদ্দেস দেহলভী (রহঃ)।

অন্যদিকে মাওলানা আহমদুল্লাহ মেদেনীপুর (রহঃ) তো ফুরফুরা শরীফেরই সিলসিলাভুক্ত।

আর জৈনপুরা সিলসিলার গোড়া, হাদিয়ে বাংলা মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) তাঁর পীর হলেন মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) শহীদে বালাকোট।

ওয়ালী উল্লাহী সিলসিলার এ তিন শাখা দ্বারাই অখণ্ড ভারতে আযাদী আন্দোলনসহ ইলমে দ্বীন শিক্ষা, দ্বীনের তাবলীগ, অন্যান্য দ্বীন ইসলামের বহুমূখী খেদমত বেশী আঞ্জাম পেয়েছে।

আযাদী আন্দোলনের লক্ষ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দেরই শাখা 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসাম' সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকী ছাহেব (রহঃ)। তিনি বলতেন 'রাজনীতির ক্ষেত্র হতে আলেমদের সরে পড়ার কারণে আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বে–শরা কাজ হচ্ছে।

ফুরফুরা সিলসিলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা রুহুল আমীন ছাহেব, তিনিও প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামার সভাপতি ছিলেন। কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার পরেই অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম সরকারী মাদ্রাসা 'নেছারিয়া আলিয়া' শর্ষিনার প্রতিষ্ঠাতা, ফুরফুরা

সিলসিলাভুক্ত মাওলানা নেছারুদ্দিন (রহঃ) তিনিও জমিয়তে ওলামা–এ বাংলার সভাপতি এবং পাকিস্তান আন্দোলনের জোরদার সমর্থক ছিলেন। ফুরফুরার মাওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবও রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিলেন। মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ ১৮০০–১৮৭৩ খৃঃ) ওয়াজ নসিহত, পীর–মুরীদি, বাহাস মুনাজারা ও লিখনী শক্তি দিয়ে ইসলামের সৌরভ সারা বাংলায় পৌছায়ে দেন। রংপুর, কুমিল্লা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় বিশেষভাবে নোয়াখালীতে তাঁর ভক্ত অনুরক্তের আধিক্য রয়েছে।

'ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলন' শাখার অন্যতম দেওবন্দী সিলসিলার রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা পূর্বেও বহু আলোচনা করা হয়েছে।

ওয়ালীউল্লাহী সিলসিলার উক্ত তিন শাখার মধ্যে ফুরফুরা ও জৈনপুরা শাখাগুলো বিভিন্ন দিকে দ্বীনের খেদমতে লিপ্ত থাকলেও বর্তমানে রাজনৈতিক মঞ্চে তারা এখন নিষ্ক্রিয় প্রায় ; ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মের নামেও বহু দলের অপতৎপরতা দেখা দিয়েছে। তবে ওয়ালীউল্লাহী সিলসিলার দেওবন্দী শাখাটি দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে জন্মলগ্ন থেকেই সক্রিয়। পূর্বের মত এই তিনো শাখাগুলো যদি এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন চালুর আন্দোলনে জাগ্রত হয় তাহলে বাতিলের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ সহ তাঁর সিলসিলার সমস্ত শাখাই সুন্নী হানাফী।

রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক দ্বীনি কাজসমূহে দেওবন্দী ও ফুরফুরা সিলসিলার ওলামা ও অনুসারীগণ পরস্পর সহযোগিতামূলক আচরণই করে আসছেন এবং আগামীতেও করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

একবার মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের নিকট ফতুয়া চাওয়া হয় এ মর্মে—

প্রশ্ন ঃ দেওবন্দ মাদ্রাসা ওয়াহাবীদের নাকি? মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেবগণ ওয়াহাবী, কিম্বা সুন্নী?

উত্তর ঃ দেওবন্দ মাদ্রাসা ওয়াহাবীদিগের মাদ্রাসা নহে। যাহারা

মাজহাব অমান্য করিয়া থাকে, ইমামগণের মাজহাব মান্য করা শিরক বলে, তাহারা ওয়াহাবী। উল্লেখিত আলেমগণ কেহই এই শ্রেণীভুক্ত নহেন। —সুন্নত অল-জামায়াত ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৬/৫২৯ পৃঃ, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি।

দেওবন্দ বনাম আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সামনে যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিলো, তা ছিলো বৃটিশ সরকারের সহিত তাদের ভাবী সম্পর্কটা কিরূপ হবে, অসহযোগিতামূলক, না তোষণমূলক? এই প্রশ্নে ভারতের মুসলিম চিন্তানায়কগণ দু'টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে যান।

১. আযাদ হিন্দুস্তানী 'হিন্দু মুসলিম' ব্লক। এই ব্লকের কেন্দ্র ছিলো ১৮৬৭ সালের ৩০শে মে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম দেওবন্দ' মাদ্রাসা এবং এই ব্লকের প্রধান নেতা ছিলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)। এই ব্লকের উদ্দেশ্য ছিলো অসহযোগিতামূলক। দেওবন্দ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে এই ব্লক গড়ে তোলে বৃটিশ বিরোধী চক্র।

২. ইংলো মোহামেডান ব্লক। (ইংরেজী ইসলামী ঐক্য) এই ব্লকের কেন্দ্র ছিলো আলীগড়। আর এই ব্লকের কমাণ্ডার ছিলেন স্যার সৈয়দ মরহুম। এই ব্লকের উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় হিন্দুদের মুকাবিলায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সরকারী চাকুরীর স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে বৃটিশ তোষণ নীতির পথ বেছে নেয়া।

মাওলানা নানুতবী (রহঃ) এবং স্যার সৈয়দ উভয়ই ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা ছিলেন এবং ওয়ালীউল্লাহি আন্দোলনের তৃতীয় ইমাম শাহ মুহাম্মাদ এসহাক (রহঃ)এর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ) হতে উভয়েই ইসলামী বিপ্লবের সবক নিয়েছিলেন। তবে এ বিপ্লবী লিডার দ্বয়ের মাঝে আন্দোলনের কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য ছিলো। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নানুতবী

(রহঃ) ছিলেন নিখুঁত ইসলামী সংস্কৃতির পতাকাবাহী এবং তিনি ইংরেজদের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতার পক্ষপাতি ছিলেন না। আর স্যার সৈয়দ ছিলেন তার বিপরীত আধুনিকতা প্রিয় এবং ইংরেজ তোষামদি ও নেচারীজমের নেতা।

'প্রফেসার গব' এর ভাষায় স্যার সৈয়দ ইসলাম ধর্মে প্রথম আধুনিকতাপ্রিয় সংগঠন (Modern is Moranizatin) এর প্রবর্তক ছিলেন ১৮৭৭ সালের ৮ই জানুয়ারীতে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর উপরই তিনি অবশিষ্ট সারাজীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২০ সালে উহা ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়। তিনি ইউরোপীয় ষ্টাইলের শিক্ষার জবরদস্ত সমর্থক ছিলেন। তার সংস্কৃতিকে 'মেহদী এপাদী' ইংলো মোহামেডান কালচার নাম দিয়েছেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে এত মৌলিক বিস্তর পার্থক্যের পরেও বলা হয় যে, দুইজনেরই লক্ষ্য এক ছিলো। এবং দুইজনই মুসলমানদের উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

মোটকথা স্যার সৈয়দ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ইংরেজদের তোষণনীতির পথ বেছে নেন। আর তিনি বিজাতীয় কর্তৃক ইসলাম ধর্মের উপর আরোপিত বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই তাদেরকে উক্ত প্রশ্নাবলীর বিজ্ঞানসম্মত জবাব দিতে গিয়ে অনেক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লামা 'হালীর' অনুসন্ধান মতে তার আপত্তিকর ইসলামী ব্যাখ্যার সংখ্যা ৫২। তার মধ্যে ৪১টি ব্যাখ্যায় তার সাথে অন্যান্য কিছু লোকও শরীক আছেন। কিন্তু ১১টি ব্যাখ্যায় তাঁর সমমতের কারো খোঁজ পাওয়া যায় না। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁর ইংরেজ তোষামদ নীতি এবং ইসলামের উপকারের লক্ষ্যে আপত্তিকর অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিশ্চয় ভুল ছিলো।

ওলামায়ে দেওবন্দীগণ তাঁর উক্ত দুই নীতির কঠোরভাবে নিন্দাও করেছেন এবং ইসলামী সভ্যতার পরিবর্তে ইংরেজী খৃষ্টানী সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক স্যার সৈয়দের আলীগড় কলেজকে হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) 'ফালেজ পেরালাইসিস' বলেও মন্তব্য করেছেন। তারপরও যেহেতু উক্ত দুই নীতিতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমান ও ইসলামের উপকার করা সেহেতু পাকভারত উপমহাদেশের

খ্যাতনামা ওলামা, মাশায়েখগণ হযরত মুহাজেরে মক্কী, হযরত থানভী, হযরত গাঙ্গুহী, হযরত নানুতবী, হযরত গাঞ্জেমুরাদাবাদী (রহঃ) প্রমুখ তাঁকে কাফের ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

বৃটিশ সরকারকে ভারতীয়দের দাবী দাওয়া জানানোর উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে গঠিত 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলটি হিন্দুঘেঁষা নীতি অবলম্বন করার কারণে মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৯৮ সালে তাঁর এন্তেকাল হওয়ার আট বৎসর পর ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে ঢাকার শাহবাগে স্থাপিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। এই দল এবং কংগ্রেস পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের দাবী দাওয়া পেশ করতে থাকে।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে ইংলো মোহামেডান ব্লকের মুসলিম লীগ দলটি আজাদী বলকের থানভী (রহঃ) ভক্তদের সক্রিয় সহযোগিতায় পৃথক একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করে। আর দেওবন্দের আযাদ ব্লক অবশিষ্ট বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু যদি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ অথবা ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শায়খুল হিন্দ সাহেবের প্রচেষ্টায় এই উপমহাদেশ স্বাধীন হতো তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। উপমহাদেশ এমন সব নেতৃবৃন্দের হাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে যারা লর্ড ম্যাকলের ভাষায় রং ও বংশে ভারতীয় হলেও মন ও মস্তিস্কে ছিলো খাঁটি বিলাতী। ফলে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশ আজ পর্যন্ত অভিশপ্ত ও জনধিকৃত বৃটিশ প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি হতে ত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

বর্তমানে অনেক হক্কানী আলেম সমাজ সক্রিয় রাজনীতি করেন না কেন?

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান প্রচলিত নোংরা রাজনীতির ময়দানে ইসলামী রাজনীতির পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত। ফলে অনেক হক্কানী পীর

মাশায়েখ প্রচলিত নিয়মের রাজনীতি পরিহার করে অরাজনৈতিকভাবে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন যা পরোক্ষভাবে রাজনীতি এবং সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে ইসলামী আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনোরাজ্য দখলের চেষ্টায় তাঁরা নিবেদিত রয়েছেন। তারা বলেন, যখন মানুষ ঈমানদার ও সৎ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ পাকই তাদেরকে খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার ওয়াদা করেছেন। প্রচলিত তাবলীগ জামাতেরও এ দৃষ্টিভঙ্গি।

সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির পূর্বে কতিপয় কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হলেও তা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্যও নহে। ইসলামের কিছু কিছু বিধান রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েমের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের গৌণ উদ্দেশ্যে বিবেচিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন নবীগণ ব্যতীত প্রায় নবীগণই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না এবং তাঁরা তাঁদের দ্বীনি কাজগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিলের জন্য ট্রেনিং কোর্স হিসাবেই করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়াও দ্বীনের সব দিকে একজন মুসলমানের বা বিশেষ কোন দলের পক্ষে কাজ করা অসম্ভবও বটে। দ্বীনের সর্বদিকে খেদমত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া নবী, রসূলগণেরই বৈশিষ্ট্য। তবে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ইসলামী দলগুলোর পরস্পর সহযোগিতা দ্বীনের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। কেউ রাজনীতির মাধ্যমে দ্বীনের সক্রিয় কাজ করলে তার উচিত সে যেন অরাজনৈতিকভাবে দ্বীনের খেদমতকারী ব্যক্তি বা দলকে সমর্থন করে, আর যে অরাজনৈতিকভাবে দ্বীনের কাজ করে তারও উচিত সে যেন রাজনৈতিকভাবে সঠিক দ্বীনের খাদেম ব্যক্তি বা দলকে সমর্থন জানায়। এক লাইনের লোকদের জন্য অন্য লাইনের লোকদের প্রতি (যদি কোরআন সুন্নাহ মতে কোন বাধা না থাকে) অসহযোগিতামূলক আচরণ যে দ্বীনের উন্নতির পথে চরম বাধা, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে তথাকথিত কোন কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের মঞ্চ থেকে এ কথা বলা হচ্ছে যে, 'তাবলীগ দিয়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হবে না,

একমাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে।' এ কথা যেমন মারাত্মক ভুল, তেমনিভাবে তাবলীগী লাইনের কিছু কিছু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এ ধারণা হওয়াও চরম ভুল যে, প্রচলিত রাজনীতির লাইনে কাজ করলে ইসলামের কোন উপকারই হবে না। বরং রাজনীতি অরাজনীতি দু'পক্ষের খেদমতেই দ্বীনের উপকার হয়। যদি তা ইসলামী তরীকায় হয়।

কুষ্টিয়ার মীরপুরে একবার জামাতে ইসলামী ও তাবলীগ জামাতের মাঝে একটা বাহাছ হওয়ার কথা ছিল। ঐ সভাতে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম। নির্ধারিত তারিখে ঐ সভা অনুষ্ঠিত হলেও উক্ত সভায় জামাত নেতৃবৃন্দের কেউ মঞ্চে উপস্থিত হননি। শুধু তাবলীগিগণই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে উক্ত সভার জনগণ উভয় দলের মাঝে মিমাংসামূলক বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে আমি সেদিন বলেছিলাম যে, ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয়ে একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য দেশে বহু ইসলামী দল মৌজুদ আছে। যেমন 'খেলাফত আন্দোলন' 'নেজামে ইসলামী' ইত্যাদি।

জামাতে ইসলামীও একটি ইসলামী দলের দাবীদার। সংগঠন হিসাবে দলটি সব ইসলামী দল হতে শক্তিশালীও বটে। কিন্তু দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও লিডার মৌদুদী সাহেব কর্তৃক ইসলামের অনেক আধুনিক মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে দেশ-বিদেশের হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণ দলটিকে সমর্থন দেন না। তবে হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণ বলেন যে, এই দলটি যদি মৌদুদী সাহেবের আপত্তিকর উক্তিগুলোর ভুল স্বীকার করতঃ উহা পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, তাহলে দলটির সাথে অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর কোন মৌলিক বিরোধ থাকবে না।

আর তাবলীগ জামাত সম্বন্ধে আমি বলি যে, এ দলটি অরাজনৈতিকভাবে ইসলামের বিরাট মৌলিক খেদমত করে যাচ্ছে। তবে শুধু এই লাইনের খেদমতই ইসলামের পুরা খেদমত তা নয়। তাবলীগী জামাতেরও এ দাবী করা ঠিক হবে না যে, দ্বীনের অন্যান্য সব খেদমত বাদ দিয়ে সবাই তাবলিগে ঢুকে পড়ুক। আমি আরো বলেছিলাম যে, হে

রাজনৈতিক ভাইয়েরা! তাবলীগের দ্বারা যে লোকগুলো তৈরী হবে তারা শেষ পর্যন্ত ইসলামী দলগুলোর স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করার কারণে আপনারা তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন না।

আমি আরো বলি যে, তাবলীগ আমাদের একটি অরাজনৈতিক সঠিক মাঠ বা সংগঠন। যার বিশেষ প্রয়োজন আছে। খোদা না করুক, যদি কোন সময় সরকারীভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয় তখন তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনি আন্দোলন করে যাওয়াও সহজ হবে। স্বাধীনতাত্তর ৭১ সালের পর থেকে যখন ইসলামের নামে রাজনীতি পরিবেশ বা সুযোগ ছিলো না তখন অগ্রেফতারকৃত নেতৃস্থানীয় ইসলামিক রাজনীতিবিদরা তাবলীগের আশ্রয়েও ধর্মীয় রাজনীতির জন্য সংগঠিত হয়েছিলেন। আজ তাদেরকে তাবলীগ জামাতের ঐ অবদানটি ভুলে গেলে নিমকহারামী হবে।

অনুরূপভাবে মাদ্রাসা ও খানকা ভিত্তিক দ্বীনি খেদমতটিও দৃশ্যতঃ অরাজনৈতিক থাকা আপত্তিকর নয়। বরং অরাজনৈতিকভাবে থাকলেই সর্বাধিক খেদমত সব সময় করা সম্ভব। যেমন 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা' ইংরেজ শাসিত ভারতে যখন প্রকাশ্যে আন্দোলন করার সুযোগ ছিল না তখন দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাটি অরাজনীতির আবরণে থাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি প্রকাশ্যে আন্দোলনের কেন্দ্র ঘোষণার মাধ্যমে মাদ্রাসাটি স্থাপিত হতো, তাহলে তখনই মাদ্রাসাটি চুরমার করে দেয়া হতো। অরাজনীতির লেবেলে ঢাকা থাকার কারণেই মাদ্রাসাটি বিশ্বব্যাপী দ্বীনের খেদমত করতে সক্ষম হয়েছে এবং ঐ মাদ্রাসার তৈরী সৈনিকদের উছিলায়ই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে।

যারা সমস্ত মাদ্রাসা ও খানকাগুলোকে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দেন এবং অরাজনৈতিক আবরণে থাকার কৌশলকে নিন্দা করেন, আমি বলব তারা অপরিণামদর্শী, পক্ষান্তরে তারা দ্বীনের প্রকৃত হিতাকাংখীও নন। প্রকাশ্য ও স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার সুযোগ থাকাতে কলেজ, ভার্সিটি ও সরকারি মাদ্রাসাগুলো যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিনত হয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ হারিয়েছে তা লক্ষণীয়।

মুদ্দাকথা সমস্ত হক্কানী ওলামা, মাশায়েখগণই ইসলামী রাজনীতি করেন। তবে কেউ প্রত্যক্ষভাবে আর কেউ পরোক্ষভাবে। মঞ্চে, শ্লোগানে, মিছিলে, বক্তৃতায় রাজনীতি সীমিত নয়। ইসলামী রাজনীতির প্রবর্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের আদর্শে আদর্শবান বুজুর্গানে দ্বীন, ওলামায়ে কেরামগণ সমর্থ সাপেক্ষে দ্বীনের চতুর্মুখী খেদমতই করেছেন এবং তাঁদের আদর্শই অনুসরণীয়।

ইংরেজী শিক্ষা কি হারাম?

ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ইংরেজ বা খৃষ্টান জাতি একমাত্র মুসলিম জাতিকেই তাদের প্রধান শত্রু মনে করে আসছে এবং সুদুর অতীত থেকেই মুসলমানদের সাথেই তাদের ক্রুসেডের ছদ্মাবরণে রাজনৈতিক রক্তঝরা যুদ্ধ–বিগ্রহ বেশী হয়েছে। নিজেদের শ্রেস্ঠত্ব, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করার এবং মুসলিম জাতিকে সর্বদা দাবীয়ে রাখার লক্ষে সর্বক্ষণের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম শাসকদের নৈতিক অবক্ষয় ও আভ্যন্তরীন কোন্দলকে পুঁজি করে তারা ছলে, বলে, কৌশলে মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করে নিতে সক্ষম হয়।

মরক্কো হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এই একই অবস্থা। রাজ্যগুলো দখল করার পর তারা শুধু দিল্লীতেই ২৭ হাজার কোরআন হাদীসের অভিজ্ঞ আলেমকে ফাঁসি দেয় এবং দিল্লীর ১০ হাজার মাদ্রাসা, বাংলার ৮০ হাজার মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় এবং আলেমদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাতে থাকে যাতে তাদের উপর জনবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তারা একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, কোরআন হাদিসের শিক্ষার মধ্যেই মুসলমান জাতির সমস্ত শক্তি নিহিত।

ধূর্ত ইংরেজ জাতি মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় কৌশল এটাকেই স্থির করে যে, মুসলমানদেরকে সরাসরি ধর্মচ্যুত করা সহজ হবে না। বরং তাদের জন্য এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে তারা যেন হয়ে যায় ধর্মহীন বা খৃষ্টান ও বিলাতী। যদিও রং রূপে এবং নামে পরিচিত হয় মুসলমান। একথা

ইংরেজ 'লর্ড ম্যাকেল' পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্তও করেছেন এবং 'হান্টার' তার বিখ্যাত ইতিহাসে লেখেন (২০২ পৃঃ) আমাদের ইংরেজী স্কুল হতে এমন কোন যুবক পড়ে বের হয় না যে পৈতৃক ধর্মকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করতে না জানে। তাদের এ সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে সারা দেশে চালু করে দু'ধরণের শিক্ষাধারা।

(ক) ইংরেজী শিক্ষা ঃ এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম বা ইসলামী শিক্ষার নাম নিশানাও রাখেনি। উদ্দেশ্য, লোকেরা যাতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নৈতিক চরিত্র এবং ধর্মীয় চেতনা হারিয়ে ফেলে।

যেহেতু ধর্মহীন শিক্ষার শেষ পরিণতি ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা। ইহা ছাড়া ধর্মহীন, নীতিহীন লোকেরা কখনো স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম নয়। আর স্বাধীনতা লাভ করলেও সে স্বাধীনতার মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারে না। এজন্য তারা একদিকে চালু করেছিল ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজীর মাধ্যমে।

(খ) অপরদিকে ধর্ম শিক্ষার নামে, মাদ্রাসার নামে, আরবী শিক্ষার নামে আরেক প্রকার শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করে। শুধু ধোকা দেয়ার জন্য, যাতে মুসলমান গণবিদ্রোহী হয়ে না যায়। নতুবা মুসলমানের চিরশত্রু যারা তাদের কি কখনো ইসলামের শিক্ষা জারী করা এবং ইসলামের খেদমত করা মুসলমানদের ভালো করা উদ্দেশ্য ছিল। কস্মীনকালেও নয়। এজন্যই ইংরেজ প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধ্যায়গুলো আমরা মোটেও আলোচনা করতে অনুসন্ধান করতে বা উন্নতি করতে দেখতে পাই না।

দু'টি শিক্ষাধারা জারী করে মুসলমান সমাজের দুটি বাহুকেই অকর্মা বানিয়ে তাদের মাঝে আত্মকলহ ও আত্মবিরোধ সৃষ্টি করার জন্য। এবং হয়েছেও তাই ; আরবী শিক্ষিত লোক ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে এবং ইংরেজী শিক্ষিতরা আরবী শিক্ষিত লোকদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। ফলে মোল্লা, মিষ্টারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় সর্বক্ষণের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজদের এ গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত সমাজই রয়েছে বেখবর। প্রকৃত ঘটনা এই ছিলো যে—

মোল্লা আর মিষ্টারের ঝগড়ার পূর্বে সমস্ত মুসলমানই মোল্লা ছিল।

সমস্ত মুসলমান মিলে একতাবদ্ধ হয়ে এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আত্মসচেতনতা ও জাতীয় গৌরব রক্ষা করার জন্য এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ঐ আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ ছিলো। অবশ্য পরে ইংরেজরা হিন্দুদের এবং হিন্দুঘেঁষা কতিপয় মুসলমানদেরকে হাত করে মুসলমানদের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করে দিতে পেরেছিল। আর সে ভয়েই ইংরেজরা খাঁটি মুসলমানদের উন্নতি হতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে নিজেরাই কিছু ক্রীড়নক নামধারী মুফ্‌তীর মাধ্যমে এই ফতোয়া জারী করে যে—ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা হারাম এবং এ বিভ্রান্তিকর ফতোয়াটি হক্কানী আলেমদের নামে প্রচার করে।

শুধু ফতোয়াজারীই নয়, আরো অনেক কিছু করেছিলো। যেমন ঃ যারা ছিল বাড়ীর চাকর তাদের বানানো হয়েছিল ওস্তাদ, নিম্ন লোকদেরকে মুসলমানদের জাতীয় চিহ্ন যেমন টুপি, দাড়ী, পাগড়ী, ইত্যাদি দিয়ে তারা ঐগুলোকে তুচ্ছ করার অপপ্রয়াস পেয়েছিল, বাম দিক থেকে লেখা শুরু করা যেমন বেদ ভাষায় হরফ লেখা হয়, এই লেখাকে যেহেতু মুসলমানগণ ঘৃণা করতো তাই তাদেরকে সেরূপ লেখা লিখতে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। রাস্তা ঘাটে বামে চলার আইন প্রবর্তন্ করা হয়েছিল যা ইসলামবিরুদ্ধ।

কেউ লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হলেও গোপনে উপযুক্ত চাকুরীগুলো হিন্দুদেরই দেয়া হতো। এসব কারণে মুসলমানগণ একেতো রাষ্ট্র হারিয়ে হতবুদ্ধি, আবার এসব অপমানজনক আচার ব্যবহার দেখে একেবারেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তারা হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাতে রয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব যে ধর্মীয় অনুভূতি শক্তি ও শিক্ষা ছিলো তাও তারা হারিয়ে বসে। এত কিছুর পরেও কিন্তু ইংরেজ ও তাদের তল্পিবাহকরা আলেমদের ঘাড়ে মিথ্যা দোষারোপ চাপানো হতে বিরত রইল না।

তারা বলে দিল যে, আলেমগণই ইংরেজী ভাষা শিখতে না দিয়ে মুসলমান সমাজকে উন্নতি করতে বাধা দিয়ে এত অবনতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠকবৃন্দ ! উপরোল্লেখিত বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝেছেন যে, কোন আলেমে হক্কানীই নিঃশর্তভাবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে হারাম বলেননি, বরং এ ফতোয়াটি হক্কানী আলেমদেরকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন লক্ষে আলেমদের নাম দিয়ে ইংরেজরাই তাদের দোসরদের মাধ্যমে প্রচার করেছে। ওলামাগণ কখনো ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে হারাম বলেননি।

ভাষা হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা শিক্ষাই জায়েজ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তব্যও বটে। হাঁ, ওলামায়ে কেরাম ইংরেজ হওয়া বা ইংরেজী কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করা কেউ হারাম বলেছেন যা অতিবাস্তব ও কোরআন–হাদীসসম্মত কথা। তবে কেউ যদি অনৈসলামী ও কু–পরিবেশে কোন ভাষা শিখতে গিয়ে ঈমান, আমল নষ্ট করে ফেলে এবং খৃষ্টানী চালচলন গ্রহণ করে তাহলে উক্ত ক্ষেত্রে তার জন্য ঐ ভাষা শিক্ষাও অবশ্যই হারাম ও বর্জনীয় হবে। কেননা 'আল মুফজি ইলাল হারামে হারামুন।' অর্থাৎ কোন জিনিষ সরাসরি হারাম নয় তবে যদি তা হারামের উসিলা ও সহায়ক হয় তাহলে ঐ ক্ষেত্রে হালাল জিনিষটিও হারাম হয়ে যায় এবং এ কুপরিবেশ যতক্ষণ পর্যন্ত সু–পরিবেশে পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ হারাম ফতোয়াটি বলবত থাকবে। ইহা ধর্মীয় মুফতিদের সর্বজন স্বীকৃত মত।

ঈমান আমল নষ্ট হয় এমন পরিবেশে যে ভাষা শিক্ষা করাও হারাম সে সম্বন্ধে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)এর একটি ফতোয়া মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) বাংলা অনুবাদ করে প্রচার করেছেন। নাম দিয়েছেন, 'ইংরেজী পড়িব না কেন?'

পরিশেষে মাওলানা ফরিদপুরী (রঃ) বলেন, "আমি মোসলমান সমাজকে সতর্ক করিয়া দিতেছি এই যে কুপরিবেশে আপনারা চিন্তাহীনভাবে ছেলেমেয়েদেরকে ছাড়িয়া দিতেছেন এখনও সতর্ক হউন, নতুবা এর ভীষণ পরিনাম ফল ভোগ করিতে হইবে। ধর্মহীন, ধর্মদ্রোহী, পাঠাগারে কচি, বে–গোনাহ, শিশুদেরে পাঠাইয়া তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধ্বংস করার মহাপাপে আপনারা প্রবৃত্ত হইবেন না। নিজের কলিজার টুকরাকে নিজে হাতে ধরিয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন

না।—ইংরাজী পড়িব না কেন? ইত্যাদি।

ইসলামী কবি জজ আকবর ইলাহবাদী বলেন—

تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو ؛ جائز ہے غباروں میں چڑھو چرخ پہ جھولو
لیکن اک سخن بندۂ اکبر کا رہے یاد ؛ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

অর্থাৎ—তোমরা ইচ্ছা হলে কলেজে পড়ো, পার্কে বেড়াও জায়েজ আছে, তোমরা ধুলাবালুর সাথে আকাশে উড়ো এবং আকাশের সাথে ঝুলো।

তবে বান্দা আকবরের (কবি) একটি কথা স্মরণ রাখবে—

আল্লাহ এবং নিজ অস্তিত্বকে ভুলবে না।

এ কবিতা দুটির মর্মার্থ এই—

তোমরা ইংরেজী শিক্ষা করে দুনিয়াবী সর্বপ্রকারের উন্নতি লাভ করতে পার কোন বাধা নাই, তবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

মুদ্দাকথা, আল্লাহর নিকট ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব বেশী। কারণ, ঈমান ও নেক আমলের ফল চিরস্থায়ী। যারা ঈমান ও নেক আমলকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার অস্থায়ী উন্নতির পিছনে পড়ে আল্লাহ পাক তাদের ঠাঁই জাহান্নামে রেখেছেন। তাই কোরআন, হাদীসের সূত্রে সমস্ত ধর্মীয় আলেম সমাজ ফতোয়া প্রদান করেন যে, দ্বীন, ইসলামকে বজায় রেখে দুনিয়াবী সর্বপ্রকারের উন্নতিই জায়েজ। কিন্তু দ্বীন ইসলামকে নষ্ট করে দুনিয়াবী কোন প্রকারের উন্নতিই জায়েজ নাই।

প্রিয় মুসলিম পাঠকবৃন্দ! আমাদের দেশে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ কু না সু? যদি কু হয় তাহলে ঈমানদারের জন্য কি করণীয়? বৃটিশ প্রবর্তিত সহশিক্ষা, পর্দাবিহীন অবস্থার শিক্ষা, খৃষ্টানী কায়েদায় শিক্ষার কুপরিবেশকে সুপরিবেশে পরিণত করার জন্য জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা ঈমানী দায়িত্ব নয় কি?

প্রচলিত পাঠ্য ইতিহাসে রাজনৈতিক ওলামাগণের নাম অনুল্লেখ একটি ষড়যন্ত্র

পূর্বের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, ভারত আযাদী আন্দোলনের মূল প্রবর্তক ছিলেন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এবং আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামগণের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বের। বিশেষভাবে দেওবন্দী ওলামাগণের। কিন্তু স্কুল কলেজের ইতিহাসের পাঠ্য বই–পুস্তকে আযাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ওলামাগণের নাম ও অবদানের বর্ণনা উল্লেখ নাই। মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ), ওলিয়ে কামেল ফতেহ আলী সুলতান টিপু (রহঃ) মাওলানা সাইয়্যেদ নেসার আলী তিতুমীর শহীদ (রহঃ) প্রমুখদের কথা উল্লেখ হলেও তা নামে মাত্র এবং খুব সংক্ষিপ্ত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) কৃত আযাদী আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন ও আন্দোলনের বীজবপন এবং শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ)এর ইংরেজ শাসিত ভারতকে শত্রু দেশ ফতোয়া যদি জারী না হতো এবং ঐ ফতোয়ার ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি বালাকোটের মুজাহিদ যুদ্ধ, সিপাহী আন্দোলন, রেশমী চিঠির আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে আযাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী না হতো তাহলে কি শেষের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মত পরাশক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ নেতাদের পক্ষে আযাদী আন্দোলন গড়ে তোলা বা ঐ আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজ তাড়ানো এতো সহজ ছিল কি? মোটেও না। এবং পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বটিও মনের অন্ধকার কোঠায় কল্পিতও হতো না।

অতি দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ঐতিহাসিক বন্ধুগণও ওলামাগণের সত্য প্রমাণিত রাজনৈতিক অবদানগুলোর স্বীকৃতি দিতে নারাজ। ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু ইহুদী, নাসারা ও নাস্তিকদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইসলামী সভ্যতার পরিবর্তে বিজাতীয় সভ্যতা ও অপসংস্কৃতি এদেশে চালু করার রহস্যটিই যে এর মূল কারণ তা সচেতন মহলের অজানা নয়।

উপসংহার

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃটিশ বেনিয়ারা ভারত দখল করার পর মুসলমান জাতি ও তাদের স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত ঐতিহ্যকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফন্দি এঁটেছিল। তাদের এ সুদূর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষে নির্মমভাবে ওলামা নিধন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মাদ্রাসা মকতব ভেঙ্গে দিয়ে অসংখ্য গির্জা স্থাপন, নতুন ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, ইউরোপ হতে অসংখ্য পাদ্রির আমদানী, প্রচুর টাকা ও বড় বড় সরকারী পদ ইত্যাদি দিয়ে এদেশীয় বহু প্রকার দোসর সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে, ভারতের মুসলিম জাতি হতাশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি না। মুসলিম জাতির এহেন দুর্দিনে আল্লাহ পাক ভারত মুরুব্বী শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)এর খান্দান ও তাঁর সিলসিলাভুক্ত দেওবন্দী ওলামাগণ প্রমুখের মাধ্যমে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করেন। এ ব্যাপারে দেওবন্দী ওলামাগণের ভূমিকা সবার চেয়ে বেশী। একদিকে তাঁরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অন্যদিকে বহু কষ্টের মধ্য দিয়েও নিখুঁত দ্বীনি শিক্ষার কাজ জারী রাখেন। ইতিহাস সাক্ষী, যদি ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রর্তিষ্ঠত না হতো তাহলে ভারতের অবস্থা আজ হুবহু স্পেনের মতই হতো।

মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা রশীদ রেজা, রিয়াদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আল্লামা শেখ আবু গুদ্দা শামী, ইতিহাসবিদ শেখ একরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার প্রমুখ দেশবরেণ্য ইসলামী মহামনীষীগণও ইতিহাস বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর তাদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ দেওবন্দ মাদ্রাসা ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ সিলসিলার ওলামাদের উসিলায়ই ভারতবাসী ইংরেজ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীর নিকট ইংরেজরা দেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে ধূর্ত ইংরেজ যাওয়ার সময় তাদের বিশ্বস্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অসংখ্য সেবাদাস

সৃষ্টি করে রেখে যায়, যাদের মাধ্যমে তাদের কৃষ্টি কালচার ও যাবতীয় অপসংস্কৃতি তারা এদেশে চালু রাখতে সক্ষম হয়।

ফলশ্রুতিতে ভারতবাসী ভৌগলিক ও রাজনৈতিকভাবে যদিও স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু কৃষ্টি কালচার ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে আজো স্বাধীনতা লাভ করতে পারছে না। মুদ্দাকথা সাত শত বৎসর কাল এদেশ মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। এরপর নানা কৌশলে প্রায় দুইশত বছর কাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশ জবর দখল করে রাখে। অতঃপর ওলামাদের নেতৃত্বে বিশেষভাবে দেওবন্দীদের অবিরত জেহাদ ও দুর্বার গণআন্দোলনের মুখে তারা ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু হাজার হাজার মুজাহেদীনের রক্তের সাথে বেঈমানী করে যারা স্বাধীনোত্তর এদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম না করে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার ও ইউরোপীয় সভ্যতা—বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি চালু করে স্বাধীনতার সুফল থেকে জাতিকে বঞ্চিত করে চলছে তারা মীর জাফর, মীর ছাদেক ও বিজাতির সেবাদাস হিসাবেই ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। বৃষ্টিশবিরোধী স্বাধীন অখণ্ড ভারতে নীতিগতভাবেই বৃটিশের দোসরদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষিত হয় না।

পরিশেষে পূত-পবিত্র মনের অধিকারী পাঠকবৃন্দকে আমার বিনয় আবেদন, আসুন! শাহ ওয়ালীউল্লাহর (রহঃ) সিলসিলাভুক্ত মুজাহেদীন ও দেওবন্দী ওলামাগণের অতীতের গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাসের চেতনায় আমরা দেশ থেকে বিজাতীয় ও ইউরোপীয় সমস্ত অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ বাস্তবায়নের জেহাদে শরীক হই। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সমাপ্ত